কৃষ্ণস্তু ভগবান

ডঃ দীপক চন্দ্র

রত্নাবলী/ ৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ১৯৬৪

প্রকাশক

এস. চট্টোপাধ্যায়

বস্থাবলী

৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক

স্টার এন্টারপ্রাইজ

৫৯ এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০ ০০৯

অর্ঘ্য

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

পরম আদরের
মলি ও গোরা'কে
—বাবা

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম
যদি রাধা না হত
দ্রৌপদী চিরন্তনী
গান্ধারী, কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী
কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন
এবং অশ্বত্থামা
উর্বশী জননী
কাশ্যপেয়
মহাবিশ্বে মধুকৈটভ
রাবণ বহে নিজনাম
জননী কৈকেয়ী
রামের অজ্ঞাতবাস
আমি তোমাদেরই সীতা
সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

সম্পাদনা

হরিবংশ
মনোজ বসুর রচনাবলী (১ম—৪র্থ)
মনোজ বসুর কবিতা

সমালোচনা গ্রন্থ

বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা
মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য

॥ দৃষ্টিকোণ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম"-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকা কৃষ্ণের উপর আরোপিত ঈশ্বরত্ব নিয়ে অনেককাল ধরে চিঠিপত্রে নানা প্রশ্ন ও অনুরোধ করে আসছেন। তাঁদের সেই আকাঙ্খা পূরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশিত হল: "কৃষ্ণস্তু ভগবান"।

ভগবান আছে কি নেই, তা নিয়ে নানান সংশয়। কারণ, ভগবানকে চোখে দেখা যায় না। তিনি প্রত্যক্ষ নন। তিনি শূন্য, নিরাকার। তবু অনাদি, অনন্তকাল ধরে মানুষের মনের মধ্যে, তার সমস্ত বিশ্বাসের মধ্যে তিনি ভীষণভাবে আছেন। আজও আছেন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের তিনি পরম আশ্রয়।

মানুষের চোখে ভগবান পরম করুণাময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়। তিনি কোন বিভেদ জানেন না। সকলকেই তিনি কোল দেন। দুঃখী, দুর্গত, অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও সহানুভূতির অন্ত নেই। ক্ষমতায়, প্রীতিতে, মহত্ত্বে, ত্যাগে তিনি সুন্দর। ভগবান হল ভালবাসার আর এক নাম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "দেবতারে যাহা দিতে পারি তাই দিই প্রিয়জনে প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি, তাই দিই দেবতারে দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।" অর্থাৎ কিনা, ভগবানের কাছ থেকে মানুষ যা প্রত্যাশা করে তা যখন মর্তের কোন মানুষের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায় তখন মানুষের চোখে সে সাক্ষাৎ ভগবান হয়ে ওঠে। ভগবান অলৌকিক, কিন্তু মানুষরূপী ভগবান প্রত্যক্ষ এবং লৌকিক।

কোন কোন মানুষ নিজের অসাধারণ বিশেষ গুণ, কর্ম এবং আদর্শের জন্য শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অঞ্জলি দিয়ে ভগবানে উন্নীত করে তাঁকে ভগবানের মত পূজা না করলে আমরা স্বস্তি পাই না। এইভাবেই যুগ-মানসের বরণীয় মহান মানুষ স্মরণীয় হয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে পূজিত হল রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ

সারদা, প্রমুখ মানব মানবী তিরোধানের অব্যবহিত পরেই ভগবানরূপে বন্দিত হলেন। একালে সুভাষ বসু, গান্ধীজি, লেলিন প্রমুখমনীষীরা গুণ ও কর্মের জোরে পূজার পাত্র হয়ে উঠলেন।

এই গ্রন্থেও আমি বোঝাতে চেয়েছি, ভগবান হয় না, মানুষই ভগবানের গুণগুলি নিয়ে ভগবান হয়ে যায়। একদিন মহাভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ একইভাবে ভগবানের গুণ ও কর্মগুলি নিয়ে মানুষের ভগবান হয়ে গেলেন। একদিনে কৃষ্ণ ভগবান হয়ে যাননি। বহু শতাব্দী ধরে ভগবান হওয়ার জন্যে তাঁকে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। এবং একটু একটু করে তাঁর উপর ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয়েছে।

মহাভারতের প্রথম অবস্থায় কৃষ্ণ দেবতা নন। তিনি একজন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান রাজনৈতিক নেতা। এক আশ্চর্য সুন্দর মানুষ। পরহিতার্থে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত। নিজের জন্যে কিছুই আকাংঙ্খা নেই তাঁর। তিনি নির্লোভী। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও ভোগে নিস্পৃহ। পরিবর্তে অপরের দুঃখ দুর্দশাকে আপন ভেবে প্রতিকারে যত্নবান হয়েছেন। তাঁর পরহিতৈষণা, মহত্ত্ব, ত্যাগ, শত্রুকেও অবাক করেছে। প্রেমে এবং মহত্ত্বে তাদের বশ করেছেন। তাঁর অসাধারণ পৌরুষ, চরিত্র মাধুর্য, নম্র স্বভাব, স্নিগ্ধ আচরণ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র মানুষের অন্তরকে বিকশিত করল। শ্রদ্ধার স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে ভক্তির শতদলে পূজা করল শত্রুমিত্র নির্বিশেষে। মানুষের হৃদয়ের পূজা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান, মানুষের প্রাণের ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব মানুষের সৃষ্টি। ভক্ত ও প্রেমিক মানুষের পূজাঞ্জলি। এই পূজা পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন মানুষের প্রাণের ঠাকুর।

ভক্তির এই অর্ঘ্য নিবেদিত হল মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে। তৃতীয় ও তার পরবর্তী স্তরে সেই ভক্তি ও পূজা এক পারমার্থিক দার্শনিক স্তরে পৌঁছল। ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। মহাভারতের কর্মমার্গের উপর ভক্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত হল। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

অমানুষী লীলা ও তাঁর দিব্যকর্ম বর্ণিত হল, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে, ও শ্রীমদ্ভাগবতে, আর শ্রীমতী রাধিকার তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হল ব্রহ্মবৈবর্তে পুরাণে।

"শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম"-এ যেসব কাহিনী অলৌকিক বলে বর্জিত হয়েছিল, আলোচ্য উপন্যাসে সেই অলৌকিক কাহিনীগুলি ক্যানভাসে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব নিরূপণ করেছি। কারণ যে চরিত্রগুণে ও ব্যক্তিত্বের জোরে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে মানবসন্তান থেকে এক অলৌকিক শক্তিধর লীলাময় ভগবানে উত্তীর্ণ হলেন তার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়েছে এই কাহিনীগুলিতে। তাই এগুলি এড়িয়ে যায়নি। বরং, কীভাবে, কেমন করে জীবনের ঘটনা অলৌকিক হয়ে উঠল তার একটা পরিবেশ অংকন করেছি। অধুনিক ধর্মপ্রাণ মানুষের শিক্ষা, চিন্তা, রুচি ও মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলির সঙ্গে কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবল, মনোরঞ্জনীক্ষমতা, পরহিতৈষণা, করুণা, মমতার এক আশ্চর্য সমীকরণ হয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিকে।

এই কঠিন কাজটি করতে গিয়ে মনে হয়েছে স্বর্গের ধরাচূড়া পড়ে ভগবান মর্তে নেমে আসে না। মানবী মাতার গর্ভে আর পাঁচটা শিশুর মত তাঁকেও জন্মগ্রহণ করতে হয়। তবু তিনি স্বতন্ত্র। বিশ্ব-সৃষ্টির আদি-অনন্তস্বরূপ হয়ে তিনি জন্মমাত্র নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু কোন চরিত্রগুণে এবং ব্যক্তিত্বের জোরে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে মানব-সন্তান থেকে এক অলৌকিক শক্তিধর লীলাময় ভগবানে উত্তীর্ণ হলেন তার এক শ্রদ্ধাদীপ্ত সংঘাতময় উপন্যাস "কৃষ্ণস্তু ভগবান।"

ডঃ দীপক চন্দ্র

॥ এক ॥

বিধাতা বড় রসিক। এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত জমা খরচের হিসেব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না আর। তেমনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে যুধিষ্ঠির কী পেল আর পেল না তার হিসেব করতে গিয়ে বুকটা হাহাকার করে উঠল। অন্তরের কোন অজ্ঞাত কোণে তার এক। বিষাদ জমে ছিল সেজন্য খুব কষ্ট হয়। কষ্টটা পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণের জন্যে।

তার কথা মনে হলে ভারাক্রান্ত হয় যুধিষ্ঠিরের মন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহাশ্মশানে মানবপ্রেমিক জনদরদী শ্রীকৃষ্ণের দুই গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ধারার সেই দৃশ্যটি এক যুগ পরেও যুধিষ্ঠির ভুলতে পারেনি। কৃষ্ণের হৃদয়বিদারী সেই আর্ত হাহাকার প্রতিক্ষণ তার কানের ভেতর বাজে। ধর্মরাজ, এ আমি কোন্ অধর্ম করলাম? আমি'ত মানুষের ভাল চেয়েছিলাম। সুখ, স্বার্থ, আরাম, বিলাস বিসর্জন দিয়ে আমি মানুষের কি হিত করতে পেরেছি? মানুষের শুভ কামনা করেছিলাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে চেয়েছিলাম মানুষ সুখী হোক, মানুষের মঙ্গল হোক। কিন্তু তাদের এ কোন্ অমঙ্গল আমি করলাম? এই অনিষ্ট'ত আমি চাইনি। মানুষের সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা, নিশ্চিত করতে ভণ্ডামি, ছলনা, অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণাকে নির্মূল করতে এক বিরাট যুদ্ধ চেয়েছিলাম। অসুন্দরকে, অসত্যকে, অধর্মকে হত্যা করে ভালবাসার রক্তকমল ফোটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারলাম কৈ? বিধাতা বড় নিষ্ঠুর। ভেঙে গড়তে গিয়ে এ কোন্ ধ্বংস ডেকে আনলাম? স্বজন হারানোর মহাশ্মশানে, অশ্রুসাগরে ভালবাসার কোন শতদল ফোটানো যায়? না, যেতে পারে? ভারতবর্ষের মানুষের চোখে আজ আমি অপরাধী। আমি পাপী। আমি আসামী। মানুষের আদালতে আমার বিচার কর ধর্মরাজ।

কথাগুলো সত্যি এভাবে কৃষ্ণ বলেছিল কিনা যুধিষ্ঠিরের মনে নেই। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্যে একটা অপরাধবোধের কাঁটা তার বুকে বিঁধে ছিল। এক যুগ পরেও কৃষ্ণের অপযশ আশংকা দূর করার কোন উদ্যম দেখায়নি যুধিষ্ঠির। ইচ্ছে হলেও সময় করে উঠতে পারেনি। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের স্বজন হারানোর শোক কাটিয়ে প্রকৃতিস্থ হতে অনেকগুলি ঋতু চলে গেল। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি সামলে দেশের অর্থ-নৈতিক স্বনির্ভরতা ফিরিয়ে আনতে কী প্রাণান্তকর পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছিল। এখন স্থিতি এসেছে। কৃষ্ণের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ল।

এর ভেতর মানুষের আদালতে কালের কষ্টিপাথরে কৃষ্ণের এক অভিনব বিচার হয়ে গেল। কৃষ্ণ মানুষ, না নররূপী ঈশ্বর এই নিয়ে নতুন তর্ক জমে উঠল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণামটা মানুষের কাছে গৌণ হয়ে গেলে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মানুষ নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল। কেন এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ? কার জন্যে যুদ্ধ? এ যুদ্ধ কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে হলেও সত্যি কি ভাইয়ে-ভাইয়ের যুদ্ধ ছিল?

অদ্ভুত মানুষের মন আর অদ্ভুত সেই মনের গতি। একদিন কৃষ্ণ নিন্দায় যারা মুখর ছিল, সব দেখেশুনে তারাই ভাবতে সুরু করল সব মানুষ যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কৃষ্ণ তখন মানুষের ভাল করতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল, অপশাসনের অবসান চাইল। মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হল। আরো আশ্চর্যের কথা হল, কৃষ্ণ নিজের জন্যে কোন কিছু কামনা করেনি। নির্লোভী, নিঃস্বার্থপর চরিত্রের এক মহান মানুষ। মহাভারত যুদ্ধের চালক হয়েও সে অস্ত্র ধরল না, কিংবা অন্যের সাম্রাজ্য জয় করেও গ্রাস করল না, স্বাধীনতা হরণ করল না, নিজেও সিংহাসনে বসল না। রাজমুকুটে তার লোভ ছিল না। এক অদ্ভুত মানুষ সে। তাকে নিয়ে কৌতূহলের অন্ত ছিল না তাই।

তবু কৃষ্ণ বড় একা। পৃথিবীতে কৃষ্ণের মত মানুষদের হয়ত কেউ

থাকে না। বড় নিঃসঙ্গ আর একা হয়ে তারা জন্মায়। কেউ যদি তাদের থাকে তা-হলে মানুষের মুক্তি আসবে কী করে? কী করে পৃথিবীর ইতিহাস এগিয়ে চলবে? তাই বিধাতা তাদের মত মানুষকে একা করে সৃষ্টি করেন।

দ্বৈপায়নের কুটীরে যেতে যেতে যুধিষ্ঠির রথে বসে ভাবছিল। আর মনে হচ্ছিল এই অবিশ্বাসের যুগেও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ আছে। সে মানুষ অবক্ষয়, পতনের মধ্যেও সততা ও সত্যবাদিতাকে শ্রদ্ধা করে। বিশ্বাস করে ধর্মকে। বিশ্বাস করে ভালোবাসাকে।

সাঁ সাঁ করে রথ ছুটছিল। চারদিক থেকে বাতাস ছুটে এল। এলোমেলো করে দিল চুল। মুখে-চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল যুধিষ্ঠিরের। কৃষ্ণের প্রতি তার সমস্ত সত্তার একমুখী ভালবাসা, শ্রদ্ধাকে দুরন্ত এক গতিতে নিয়ে চলল দ্বৈপায়নের কুটীরে। খুব দ্রুত।

একটা বিকট ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করে রথ থামল।

যুধিষ্ঠিরকে রথ থেকে অবতরণ করতে দেখে দ্বৈপায়নের বিপুল বিস্ময় ও কৌতূহল হল। একই সঙ্গে বুকের ভেতর চিনচিনে আনন্দ ও ভয় হচ্ছিল। মনটা কোথায় যেন আচমকা নাড়া খেল। হাসতে হাসতেই তার দিকে এগিয়ে গেল। বলল: বৎস যুধিষ্ঠির, এতকাল পরে তোমার সময় হল?

পদধূলি গ্রহণ করে যুধিষ্ঠির বলল: পিতামহ, আপনিই তো বলেন জীবনের সবকিছুর একটা নির্ধারিত সময় থাকে। সময়ের ঘণ্টা বাজলে আর বসে থাকার উপায় থাকে না। তাকে বেরিয়ে পড়তেই হয়। নির্দিষ্ট সময় এলে তবে গাছে কুঁড়ি ধরে, ফুল ফোটে। পাতা ঝরার দিনে কুসুম ফোটাতে চাইলেই কি তা ফোটে? সময়ের ডাক না পড়লে কেমন করে আসি?

মুখ টিপে হাসল দ্বৈপায়ন। মুগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল যুধিষ্ঠিরের চোখের উপর। বলল: সময়ের কোন্ ডাক এসে পৌঁছল তোমার কাছে?

পিতামহ, বন-নদী, আকাশ-পাহাড়, সাগর যেমন পৃথিবীর মহিমা ঘোষণা করছে অনন্তকাল ধরে তেমনি পাণ্ডবদের চারপাশে যে সব সুহৃদ, হিতৈষী, অনুরাগী, সহযোগিরা ছিল তাদের সকলকে নিয়ে ধ্রুবতারার মত পাণ্ডবেরা সখা শ্রীকৃষ্ণের পাশে অম্লান হয়ে জ্বলুক। এই প্রেমহীন পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের সাধনার বাণী প্রচার হলে এ পৃথিবীটা বদলে যেতে পারে। কয়েকদিন ধরে এই অদ্ভুত উপলব্ধিটা আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমার খুব ইচ্ছে, পাণ্ডবদের সাফল্য, বিরাট জয়, শ্রীকৃষ্ণের সখ্য নিয়ে 'জয়কাব্য' রচনা করুন।

কথা শুনে চমকে উঠল দ্বৈপায়ন। মুহূর্তমধ্যে ভাবনার রাজ্যে কোথায় যেন চলে গেল। অপলক যুধিষ্ঠিরের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল। বলল: এ-কাব্য রচনা করা আমার উচিত নয়।

কেন নয়?

আমিও একজন এ কাব্যের অন্যতম পার্শ্বচরিত্র। নিরপেক্ষ হয়ে কাব্য রচনা করা তাই সম্ভব নয়।

কিন্তু আপনি ছাড়া অন্যকে দিয়ে এ কাব হবে না। আমি ভাল করে জানি। সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি সব জানেন। তাই এ হবে জীবন থেকে নেয়া এক মহাকাব্য।

যুধিষ্ঠির, তুমি বুঝতে পারছ না কেন—এটাই আমার একমাত্র অসুবিধা। স্রষ্টাকে নির্লিপ্ত হয়ে কাব্য রচনা করতে হয়। যেখানে ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেই যুক্ত সেখানে নিজের প্রসঙ্গে স্তুতি করা যেমন মানায় না, তেমনি সমালোচনা কিংবা নিন্দে করাও কঠিন হয়ে পড়ে। স্রষ্টার স্বাধীনতা এবং সততা দুই ক্ষুন্ন হয়।

যুধিষ্ঠির বলল: আপনি সাধক। একমাত্র সাধকের পক্ষে সম্ভব নিরাসক্তভাবে, নির্লোভ মন নিয়ে নিরাবেগ চিত্তে জীবনের মাঝখানে বসে জীবনকে ধ্যান করা। ঋষিই পারে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে ভরা পৃথিবীকে বাঙ্ময় করতে। আদি কবি বাল্মীকিও রামায়ণ কাহিনীতে এমন সুন্দরভাবে গা-ঢাকা দিয়েছেন, সত্য-মিথ্যেকে এমন চমৎকার রেশমী

বুননের মধ্যে সযত্নে মুড়ে রেখেছেন যে তাতে রামচন্দ্রের কীর্তিগুলি কিংবা বাল্মীকির ভূমিকা ঢাকা পড়েনি। বরং আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

কথাগুলো দ্বৈপায়নের হৃদয়কে স্পর্শ করল। বুকের ভেতর নাড়া খেল। প্রবল আবেগ জাগল। যা এর আগে কখনও অনুভব করেনি। বেশ কিছুক্ষণ কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কাটল। একটু একটু করে দ্বৈপায়নের চোখের তারা থেকে অন্ধকারের পর্দা সরে গেল। বুকের মধ্যে যেন মহাকালের নূপুরধ্বনি শুনতে পেল। যুগান্তরের ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল।

কালের মুখোমুখি হয়ে দ্বৈপায়ন যেন তার অতীতকে দেখতে পাচ্ছিল। এতকাল ধরে জানা ছিল সময় প্রবাহে সব ভেসে যায়। অনন্ত কালগর্ভে হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি সভ্যতা—কত কি। কিন্তু সত্যি কি তাই? তা-হলে একশ বছর আগের সব স্মৃতি এমন করে মনে পড়ে কেন? কাল বোধ হয় পুরনোকে নতুন করে তোলে। সময়ের ব্যবধানে তার রূপ, রঙ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ একটু অন্যরকম হয় কেবল। কিন্তু মন? যে মন একশ বছর ধরে স্মৃতি বহন করছে, সেই কৌতূহলী উৎসুক মন কিন্তু নতুন। এও কালের সৃষ্টি বলে মনে করে দ্বৈপায়ন।

পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্বৈপায়ন। তার যে একটা অতীত ছিল তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। যেন কোন অন্ধকারের ভেতর থেকে বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে মনে বলল: চল না, চল না, তার অতীতকে গোপন রাখা। কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যত নেপথ্য কাহিনী শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ রাখার পণ করেছিল, কিন্তু সত্যাশ্রয়ী যুধিষ্ঠির তা হতে দিল না। লেখনী হাতে নিয়ে সে এক বর্ণ মিথ্যে বলতে পারবে না। ঋষি মিথ্যা বলে না। ঋষিবাক্য মিথ্যাও হয় না। আবার সত্যমাত্র অপ্রিয়। সব সত্য না হলেও কিছু কিছু সত্য অসহনীয়। পাণ্ডবদের জয় কাহিনীতে কিছু কিছু কার্যকলাপ আছে যা গৌরবের নয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল: আমি প্রতিশ্রুত। কেমন

করে সত্যভঙ্গ করি ?

যুধিষ্ঠির হঠাৎ প্রশ্ন করল : সে সত্য কি ?

যুধিষ্ঠিরের আচমকা জিজ্ঞাসায় দ্বৈপায়ন বিপন্ন বোধ করল। ধরা পড়ার ভয়ে নিজেকে লুকনোর জন্যে বলল : জানি না।

কিন্তু যুধিষ্ঠির দ্বৈপায়নের চোখের উপর চোখ রাখল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে যেন দ্বৈপায়নের ভেতরটা চিরে চিরে দেখতে লাগল। সেই অসহনীয় দৃষ্টির সামনে দ্বৈপায়ন কেমন কুঁকড়ে গেল। মনের সব শক্তি সঞ্চয় করে দ্বৈপায়ন তার ভেতরের প্রতিরোধকে দৃঢ় করল। মনে মনে মন্ত্রের মত আওড়ে নিল : না, কিছুতে সত্যভঙ্গ হতে দেব না। ঋষি দ্বৈপায়নের মধ্যে মানুষ দ্বৈপায়ন পাছে বেরিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে মহর্ষি বেশ অস্থির এবং বিচলিত বোধ করল। তার ভেতরটাও কয়েক বার কেঁপে গেল।

মহর্ষির অদ্ভুত নীরবতায় অবাক হয়ে যুধিষ্ঠির মুচকি হাসল। বলল : মহর্ষি, আপনার দ্বিধা, সংকোচ আমি বুঝি। কিন্তু সত্যের সঙ্গে জীবনের কোন বিরোধ নেই। জীবন অনেক বড়। কী বিপুল ব্যাপ্তি তার। সবকিছুর মধ্যে দিয়ে না গেলে—কত বাধা যে তার ভেতরে লুকনো আছে, কতরকম মুক্তি যে আছে তা যদি জানা না হল, তা-হলে কিসের মানুষ জন্ম ! নিজের পাপ, অপরাধের গ্লানি নিজের মুখে স্বীকারের মধ্যে আমি লজ্জা দেখতে পাই না। কত স্বার্থবুদ্ধি, কত অন্যায়, কত লোভ, লালসা, পাপ আর কত অন্যায় অসত্যের জঞ্জালে-ভরা আমার জীবন। তবু লোকের চোখে আমি কত সার্থক পুরুষ। সে শুধু নির্দ্বিধায় সত্যি বলতে পারার জন্যে। তাই আমার সমস্ত পাপ, অন্যায়, দুর্বলতা, স্খলন এবং সার্থকতা নিয়ে আমি মহাকালের পদতলে মাথা রাখতে চাই।

আশ্চর্য বিস্ময়ে দ্বৈপায়নের মন ভরে গেল। চোখ দুটিতে এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব ফুটে উঠল। চমকানো বিস্ময়ে ডাকল : ধর্মরাজ !

যুধিষ্ঠির একটু থমকে তাকাল। চোখে স্নিগ্ধ গভীর এক দৃষ্টি। কণ্ঠে আবেগের ঘোর। বলল : মহর্ষি আমি হারিয়ে যেতে চাই না।

আবার, ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যেও আমি নই। অনন্ত সম্ভাবনা আর প্রত্যাশা নিয়ে সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে আমি যুগে যুগে নতুন হয়ে উঠতে চাই। আগামীকালের মানুষের মনের গভীরে আমি তার বীজ বপন করে যেতে চাই। কারণ, আমি বিশ্বাস করি জীবনের গায়ে কোন পাপ লাগে না, কলংক ধরে না। পাপ হয় মনে। মনে ভাবলেই পাপ। একবার বিকৃতি ঘটলে মনের সুস্থতা নষ্ট হয়। মন হল প্রাণের দর্পণ এবং সুস্থ প্রকাশ। প্রকাশ উদ্বেল জীবনীশক্তির। অনন্ত উৎসারে বয়ে যাওয়া নদীর মত কলংকশূন্য।

দ্বৈপায়ন অভিভূত। মনের বন্ধ জানলাটা যুধিষ্ঠির খুলে দিল দৃষ্টি উন্মোচিত হল। মনটা অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল। যুধিষ্ঠিরের কথাই সত্য। অপ্রিয় হলেও সত্য সব সময় খারাপ নয়। তবু মনের সংশয় গেল না। কারণ, প্রত্যেকের জীবনে কিছু কিছু ঘটনা থাকে যা তার একান্ত নিজের। একা একাই তাকে বয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন। অন্যের কাছে প্রকাশ করা তা বিড়ম্বনামাত্র। তাই একটু আমতা আমতা করে বলল: তবু এমন কিছু আছে —

যুধিষ্ঠির বলল: বাঁচবার জন্যে সত্যকে মিথ্যার পাত্রে ডুবিয়ে তোলা অসত্য নয়। নগ্ন সত্যের আত্মরক্ষা হয় তাতে। প্রকৃত সত্য তখন মিথ্যার পিছনে দৌড়োয়। একটা বিভ্রান্তি দিয়ে আর একটা বিভ্রান্তি তৈরী হয় শুধু। বিভ্রান্তির পিছনে এরকম হাজার মিথ্যে যখন দৌড়োয়, সত্য তখন নাগালে থাকে না আর। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে তার এক জ্যোতিবিকীর্ণ মহোৎসব চলে মানুষের অন্তরে। রামায়ণ কথা ও সুর তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কত কাহিনী সেখানে, তবু রামচন্দ্রের চরিত্রে কোন দৈন্য নেই, অভাব নেই। মানুষের প্রতি তার অনির্বাণ শ্রদ্ধার জ্যোতি নিভল না একটুও। তা-হলে, আপনি অকারণ সত্য-মিথ্যার প্রশ্নে জড়িয়ে নিজেকে বিব্রত করছেন শুধু। এর কোন মানে নেই।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে দ্বৈপায়নের মন কানায় কানায় ভরে গেল। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। কেমন যেন একটু নিশ্চিন্ত বোধ করল।

বুক কাঁপিয়ে স্বস্তির শ্বাস পড়ল। মৃদু ঘাড় নাড়ল দ্বৈপায়ন। হাসি হাসি মুখ করে বলল : ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম। ন মধ্যস্থ কচিৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি। সবাইকে কাল কেবল আকর্ষণ করে। তোমাকেও করছে। আমাকে করছে আস্তে, জোরে নয়। কালের আকর্ষণেই আমাকে পাণ্ডব-জয় কাব্য লিখতে হবে।

তার পরেই দ্বৈপায়নের দুই চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ ও গভীর হল। চোখ দুটি বুজে গেল প্রগাঢ় আবেগে। মুখে সৌম্যভাব ফুটল। থমথমে গম্ভীর গলায় বলল : কালপ্রবাহ নিঃশব্দে বয়ে যায়। বৃক্ষ জানতে পারে না কখন তার ডালে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটে, ফল ধরে আবার তা ঝরে পড়ে। আমিও জানি না কার নির্দেশে এত বড় একটা কঠিন কাজ আমাকে করতে হচ্ছে। আমি না চাইলেও অলক্ষ্য দেবতা আমার অজান্তে তাঁর কাজ ঠিক করে নেবেন। তোমার মুখ দিয়ে তার নির্দেশটা শুধু প্রকাশ পেল।

যুধিষ্ঠির কথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল। নিঃশব্দে সময় বয়ে যেতে লাগল।

দ্বৈপায়ন নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। কেমন একটা তন্ময়তা নামল তার দুই চোখের দৃষ্টিতে। কত মানুষ, কত ঘটনা, কত দৃশ্য তার চোখের তারায় ভেসে এল। চেতনায় আনাগোনা করতে লাগল। কিন্তু সেইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশি সাজানো নিয়ে সমস্যায় পড়ল।

দ্বৈপায়নের এ এক নতুন অনুভূতি। একটু একটু করে উপলব্ধি করল : ঘটনার বর্ণনা কাব্য নয়। রহস্য রচনার কৌশলেই ঘটনা কাব্য হয়। রহস্যই রস সঞ্চারের মূল কথা। রহস্য না থাকলে কৌতূহল জমি পায় না পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর। কৌতূহল সৃষ্টি রহস্যের গোড়ার কথা। এমন গভীর অনুভূতি আগে কখনো হয়নি। দ্বৈপায়নের

সমস্ত চেতনার মধ্যে মৃগনাভির মত একটা সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতরে কী এক অব্যক্ত অধীরতা জাগল। দ্বৈপায়ন একটু একটু করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মনের মধ্যে তার কথার তরঙ্গমালা।

বাইরেটা নিকষ-কালো অন্ধকার হওয়া সত্ত্বেও দ্বৈপায়নের ভেতরটা স্পন্দিত হতে লাগল। কুরু পাণ্ডবের জ্ঞাতি বিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস, সমকালীন ভারত-রাজনীতি; আর্য-অনার্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব; ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধের অনেক কথাই তার বুকের ভেতর তোলপাড় করল। এইসব ভাবনা-চিন্তা বিরোধের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দ্বৈপায়নের চোখের তারায় ভেসে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে সে যেন চেয়ে আছে তার দিকে। করুণাঘন মুখে তার অনির্বচনীয় মায়াবী হাসি। অন্ধকারের মধ্যে তার মুখের রহস্যময় হাসি ছাড়া দ্বৈপায়ন আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল দ্বৈপায়ন। প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা থেকে সহসা জেগে উঠল যেন। চারদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজল। কোথাও তাকে দেখতে পেল না। তবু তার কণ্ঠস্বর আকাশবাণীর মত তার কানের পর্দায় গুঞ্জরিত হল। মহাব্যোম থেকে বাতাসে ভেসে ভেসে তার কথাগুলো যেন দ্বৈপায়নের কানে গিয়ে পৌঁছোল। দ্বৈপায়ন কল্পনায় দেখল, কৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে। অধরে টেপা হাসি। ভ্রু ঈষৎ বঙ্কিম। চোখে জীবনরহস্য বোঝার কৌতুক।

দ্বৈপায়ন স্পষ্ট দেখছিল, কৃষ্ণ তার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে যেন বলছে: ঋষিবর, এই কাল-সময়ের জন্যে তুমি আমি সমান দায়ী। কেউ না জানলেও তুমি আমি জানি। আমরা দু'জন না চাইলে এ-যুদ্ধ বাঁধত না। প্রতিহিংসার অনল জ্বালিয়ে তুমি মনের আনন্দ, প্রাণের আরাম, আত্মার সুখ খুঁজতে এসেছিলে। আর আমি রাজনীতির ঘোলা আবর্তে জন্ম থেকে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আমার কোন উপায় ছিল না। তুমি ও আমি দুই বিপরীত কোটির মানুষ। আমাদের স্বার্থও সমান নয়। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ছিল না। তবু আমাদের মধ্যে একটা সহবস্থান ছিল। সত্যি বলতে কি, তুমি কৌরবদের ধ্বংস চেয়েছিলে। ব্যক্তিগত

প্রতিশোধ চরিতার্থতার তাগিদে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হোক এই অভিলাষ তোমার মনে ছিল। কিন্তু আমি এসেছিলাম আদর্শের তাড়নায়। এক অখণ্ড ভারতরাজ্য গড়ার স্বপ্ন নিয়ে, সমষ্টির কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা ভেবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ধ্বংস চেয়েছিলাম। দু'জনের চাওয়ার জগৎ ছিল আলাদা। তুমি চিরজীবন শুধু একটিমাত্র প্রেমে মজে রয়েছ, তার নাম আত্মপ্রেম। নিজেকে ছাড়া তুমি কাউকে ভালবাস না। আমি কিন্তু মানুষকে ভালবেসেছিলাম। মানুষের শুভ কামনা করেছিলাম। সর্বান্তঃকরণে চেয়েছি মানুষ সুখী হোক, সার্থক হোক, ধর্মে সুন্দর হোক। বিনা মূল্যে'ত আর কিছু পাওয়া যায় না তাই যুদ্ধের মূল্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু এখন জানলাম, আমার পরিকল্পনা ভুল; স্বপ্ন মিছে। হাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাটা আমার পাগলামি ছিল। জগতের হিতের জন্যে আমার এত বড় শুভ ইচ্ছেটার চেয়ে বড় অধর্ম আর পাপ কিছু নেই। কিন্তু তোমার অধর্ম, পাপ লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেল চিরদিন। কেউ জানতেও পারবে না কোনদিন। তুমি মহর্ষিই থেকে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণ হয়ে থাকবে মহাকাব্যের চির-কলঙ্কিত নায়ক।

অন্ধকারের মধ্যে দ্বৈপায়ন চমকে উঠল পুনর্বার। তার সমস্ত শরীর, বুকের ভেতর থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, পায়ের নিচে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেল। আসলে, এ কোন ভূমিকম্প ছিল না। তার নিজেরই শরীরের অপ্রতিবোধ্য আন্দোলন, হয়তো তার গভীর অভ্যন্তরের পাপ অনুভূতি কথা হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। নির্জন কক্ষ বাতাসে সেই কথাই অভিযোগের মত, ভৎর্সনার মত, তীক্ষ্ণ তিরস্কার বাক্যের মত কানে বাজছিল। নিজের অজান্তে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল দ্বৈপায়নের। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ভগবান সব মিলিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল তার মনের অভ্যন্তরে। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল।

দ্বৈপায়ন কয়েকদিন ধরে না পারল ঘুমোতে, না পারল জেগে থাকতে। ভেতরে একটা অস্থিরতা নিয়ে সে শয্যা ছেড়ে ঘুরে বেড়ায়

আবার এসে শয্যা নেয়। আকাশের দিকে চোখ পড়তে দেখতে পেল, কালপুরুষ তার দিকেই যেন তীর ধনুক উঁচিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আকাশের অন্যপ্রান্ত থেকে ধ্রুবতারা জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করল দ্বৈপায়ন। চোখ বুজলে জটিল চিন্তার গোলকধাঁধা। কেমন একটা দুর্বোধ্য পাপ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মনটা।

চরাচর নিঃশব্দ। গভীর ঘন অন্ধকার থেকে অশরীরী কান্না, দীর্ঘশ্বাসের মত, অট্টহাস্যের মত শব্দ করে কানে আসতে লাগল দ্বৈপায়নের। চোখের উপর ভেসে উঠল কত দৃশ্য; ভাই ভাইকে হত্যা করছে, পিতা পুত্রকে হত্যা করছে, জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে হত্যা করছে। আঠারো অক্ষৌহিণী লোক হানাহানি করে মরল শুধ। তারা কে ভাই, কে বন্ধু বিচার করল না। কারো ভেতর কোন গ্লানি ছিল না। রক্তের স্রোত বয়ে গেল কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে। অশ্রু স্রোত হয়ে মিশল সমুদ্রের নীল স্রোতে।

একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের ভিতর থেকে দ্বৈপায়ন অস্ফুট স্বরে নিজেকেই প্রশ্ন করল: কেন মিশল? তারপর নিজের মনেই জবাবটা দিল। এই 'কেন' জবাবটা একজন গৃহী দিলে যতটা গ্রহণ-যোগ্য হয় তার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় সন্ন্যাসীর মুখে শুনলে। কারণ, সন্ন্যাসীর কোন লোভ নেই, স্বার্থ নেই, আসক্তি নেই, দাবি নেই। দেহ ধারণের জন্য যতটুকু দরকার সেটুকুতেই সন্তুষ্ট সে। কিন্তু গৃহীর লোভ, স্বার্থ, দাবি অনন্ত। সমাজ ও সংসারের ভারসাম্য তাই গৃহীর দ্বারাই বিপন্ন হয়। অতিরিক্ত দাবি করলেই মনের শান্তি নষ্ট হয়। চিন্তা-ভাবনায় গোলমাল বেধে যায়। সংসারে যত হানাহানি, রেষারেষি, ঘৃণা, বিদ্বেষ—সব অতিরিক্ত অধিকারের দাবি নিয়ে। এই যে এত বড় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার মূলে রয়েছে ঐ অতিরিক্ত দাবি। সে দাবি এত তীব্র, অতিরিক্ত এবং একান্ত চাওয়া ছিল যে, যুদ্ধটা কিছুতে এড়ানো গেল না। উভয়পক্ষের তুমুল বিরোধ ও সংঘর্ষের মূলে যত-খানি স্বার্থবোধ ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল প্রতাপ, অহংকার এবং

অধিকারবোধ। এর একটা চরম মীমাংসা হওয়া তাই প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনটা অশান্ত ঘূর্ণির মত আছড়ে পড়ল কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে।

কিন্তু যুধিষ্ঠির যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধ প্রতিহত করতে সে ইন্দ্রপ্রস্থের বদলে পাঁচখানি গ্রাম চাইল। কৃষ্ণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিল, দুর্যোধনের মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কখনই পাণ্ডবদের পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনার দাবি মেনে নেবে না। কারণ, এই আপোষমূলক সন্ধি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। স্থায়ী মীমাংসা নয়। একদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের অধিকার ও দাবির একটা বিরাট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনিবার্য। কারণ, এই অসম অপমানজনক চুক্তি কোন স্থায়ী শান্তি কিংবা মীমাংসার বাতাবরণ তৈরী করে না। সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ বিলম্ব করার কোন মানে নেই। তাতে শত্রুই শক্তিমান হয়ে উঠবে। সুতরাং শত্রু দুর্বল থাকতে তার সঙ্গে সংগ্রাম করা উচিত। দুর্যোধন এই অপরিহার্য যুদ্ধকে আহ্বান করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন অনিবার্য হল অর্জুন তাকে পরিহার করতে যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করল। কারণ, কুরু-পাণ্ডবের অসমশক্তির লড়াইর ফল কখনও শুভ হতে পারে না। এই যুদ্ধে পাণ্ডবেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই অর্জুন যুদ্ধে অনীহা দেখাল।

কৃষ্ণ তার ইচ্ছেয় বাদ সাধতে কুরু-পাণ্ডবের সৈন্যের মাঝখানে রথ এনে দাঁড় করাল। শ্রীকৃষ্ণ নিজে তার সারথি। অগণিত সৈন্য-সামন্ত, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের বুক তোলপাড় করে উঠল। অসহায় গলায় বলল। সখা, এরা সবাই আমার আপনজন। কেউ স্বদেশবাসী, কেউ আত্মীয় এবং বন্ধু। এদের গায়ে কেমন করে অস্ত্র নিক্ষেপ করব। এ যে আত্মহনন। আমি এ যুদ্ধ করব না। তুমি রথ ফেরাও।

কৃষ্ণ কঠিন গলায় ভর্ৎসনা করে বলল : সখা, সংকটকালে তোমার এ ধরনের চিত্তদৌর্বল্যের কোন অর্থ হয় না। কর্তব্যের আহ্বানে রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করেছিল। তেমনি—

সখা, আমাদের দুপক্ষের সৈনিকরা খব সাধারণ মানুষ। তারা

নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। কোন দোষ করেনি। তাদের সাথে আমাদের কারো বিরোধ নেই। আমাদের শত্রু নয় তারা। শুধু পেটের জন্যে, এখানে সমবেত হয়েছে। আমাদের ঘৃণাবিদ্বেষ, রেষারেষিতে তাদের জীবনটা অন্ধকার করে দিতে পারি না। আমাদের জন্যে ওরা মরবে কেন?

কৃষ্ণ বলল: ওরা বৃত্তিভোগী কর্মচারী। যুদ্ধ ওদের বৃত্তি। যুদ্ধে মৃত্যু আছে জেনেই ওরা এই বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এজন্যে মন খারাপের কিছু নেই।

সখা, এত নিষ্ঠুর হতে বল না আমাকে। স্বদেশের জন্যে আত্মোৎসর্গ করা আর জীবিকার জন্যে নিরুপায় মৃত্যু বরণ করা কিন্তু এক নয়। একটা স্বতঃস্ফূর্ত আত্মদানের মহিমায় প্রাণবন্ত, অন্যটি মৃত্যুদণ্ডের মতই বাধ্যতামূলক। এভাবে নিরীহ মানুষদের বধ করে আমরা সাম্রাজ্য চাই না। আমি এই অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

কৃষ্ণ মৃদু চড়া সুরে বলল: অস্ত্রত্যাগের তুমি কে? মহাকাল তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে, তাই তুমি যুদ্ধ করছ। মহাকালের ইচ্ছেটাই সব। তুমি আমি না চাইলেও এ যুদ্ধ হবে।

সখা, কৌরবদের এগারো অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে পাণ্ডবদের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের এক অসম যুদ্ধে পাণ্ডবেরা ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, এক অন্তিম মুহূর্তে মহাকাল হয়ত আমাকে নিবৃত্ত করছে।

কৃষ্ণের অধরে কূট হাসি। বলল: সখা, তুমি সুতার্কিক। তোমার সাথে কথায় পারব না। কিন্তু নিজের সঙ্গে তোমার এই ছলনা শোভা পায় না। তুমি ভাল করেই জান ফেরার পথ বন্ধ। এ যুদ্ধে পাণ্ডব সেনাপতির এই হৃদয়দৌর্বল্য শোভা পায় না। এটা কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়। অধিকার কিংবা দাবি আদায়ের সংঘর্ষ নয়। মানুষের ধর্ম, বিবেক, ন্যায়বোধ বলে কিছু নেই। সব সদগুণ এবং মূল্যবোধের ধ্বংস হয়েছে। তা-না'হলে কোন পাষণ্ড নিজের ভ্রাতৃবধূকে প্রকাশ্য রাজসভায় অগণিত মানুষের সম্মুখে বিবস্ত্র করতে উদ্যত হয়! বিচার-বিবেচনা শুভ বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তাই অধর্ম, পাপ সগর্বে মাথা

তুলতে পারছে। মানুষের হৃত মনুষ্যত্ব পুনরুদ্ধার করতে একটা বড় আঘাতের প্রয়োজন আছে। শ্মশানেই নবতর উপলব্ধি হয়। স্বজন হারানোর শ্মশানে বহু দুঃখের-তপস্যায় আবার আমরা হারানো মূল্য-বোধ ফিরে পাব। এই যুদ্ধে আমরা অধর্মকে ধ্বংস করে ধর্মকে, মিথ্যাকে নাশ করে সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব। সুতরাং এ যুদ্ধ না করাই হবে সবচেয়ে বড় অধর্ম। মানুষের কর্তব্য না করার জন্য একদিন বিবেকের কাছেই তোমাকে অপরাধী থাকতে হবে। সখা, যুদ্ধে কোন হত্যাতেই আত্মগ্লানি জন্মে না। ওটা মনের ব্যাপার।

কথাটা দ্বৈপায়নের ভেতরটা চমকে দিল। নিরুচ্চারে মনে মনে উচ্চারণ করল, সত্যিই মনের ব্যাপার! কিন্তু মনকে বাদ দিয়ে'ত কোন কিছু হয় না। মন চালক, নিয়ন্ত্রক। মানুষ, মনের ক্রীড়নক, আবার তার বিচারকও বটে। এই মন যেমন দুঃখ যন্ত্রণা পায়, তেমনি তাকে সান্ত্বনাও দেয়।

জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বাম হাতের কনুইর উপর ভর দিয়ে কুশের চাটাইর উপর কাৎ হয়ে শুয়ে ছিল দ্বৈপায়ন। ঘুম এল না চোখে। তার বদলে নানারকম চিন্তা মাকড়সার মত জটিল জাল বুনতে লাগল সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন করে।

চরাচর নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে কানে আসে নিশাচর পাখির কলরব। নিদ্রিত পাখির পাখার ঝাপ্টানি আর শ্বাপদের গর্জন। মাঝে মাঝে বনের গভীর থেকে হরিণের আর্ত চিৎকার, বাঘের হুংকার, ভালুকের হাসি ভেসে আসছে। অথচ দিনের বেলায় এসব কিছুই বোঝা যায় না। কোথায় থাকে তারা সারা দিনমান।

দ্বৈপায়নের মনের ভেতর চিন্তায় তরঙ্গবলয় ক্রমবর্ধিত পরিধিতে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। তার বৃত্ত রচনার যেন কোন শেষ নেই। ঐ তরঙ্গবলয় বৃত্ত রচনা করতে করতে যেমন কূলে পৌঁছে দেয় জল-তরঙ্গকে, তেমনি দ্বৈপায়নও এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তা প্রবাহের মধ্যে অবিরত যাওয়া-আসা করতে লাগল। জীবনের অনেক গা-শিউরানো ঘটনা তার চেতনায় ফিরে আসছিল. কিন্তু দাঁড়ানোর

মাটি পাচ্ছিল না। কেন যে পাচ্ছিল না দ্বৈপায়নও নিজে জানে না। নিজের মনের মত না হওয়াটা না হওয়ার সমান।

যারা ভাবাভাবি করে তাদের মনে নানা ভাবনাই আসে। এ ভাবনা ভাবব, ও ভাবনা ভাবব না, এমন মুশকিল। প্রত্যেকে মানুষের নিজের কিছু ভাবনা থাকে। দ্বৈপায়ন জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করল। কিন্তু জিভটাও শুকনো এবং খড়খড়ে। দ্বৈপায়ন উঠে যে একটু জল খাবে সেই ইচ্ছেটাও পর্যন্ত তার ছিল না। সে যেন স্থবির প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। রাতের প্রবল সম্মোহন তাকে যেন শয্যার সঙ্গে লেপ্টে রেখেছে।

হঠাৎ নিশুতি রাত যেন তার নাম ধরে ডাকল: দ্বৈপায়ন, তুমি যদি একান্ত একা নিঃসঙ্গ বোধ কর, আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারি। তোমার বহু কর্মের সঙ্গী এবং সাক্ষী আমি। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না'ত? আমি তোমার বিবেক, তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম। তুমি যদি আমাকে এড়িয়ে চল, তাহলে শান্তি পাবে না। তুমি যদি সত্যদ্রষ্টা ঋষি হও আমি তোমাকে পুণ্যের পথে পৌঁছে দেব। অনন্ত শান্তি পাবে, যা সমস্ত পুণ্যের লক্ষ্য। আর তুমি যদি নিজেকে মনে কর পাপী, অপরাধী তা হলে তোমার স্বীকারোক্তি, তোমার পাপের ভার হাল্কা করে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। নদী যেমন সঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে নিষ্কলুস করে দেয় ধরণীকে, তেমনি তোমার সকল কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি তোমাকে গ্লানিমুক্ত করবে। নিজেকে তুমি শুধু কষ্ট দিচ্ছ। দ্বৈপায়ন, আমি তোমার বন্ধু। নিরন্তর নিজেকে তুমি অপরাধী মনে করছ। কিন্তু কি অপরাধ করেছ তুমি? এমন তো কিছু চোখে পড়ছে না যার বিচারে তোমাকে অপরাধী বলব। এসবই তোমার অদ্ভুত কল্পনা। পাণ্ডবদের জন্যে কাব্য লিখতে বসে তুমি তোমার অনুশোচনার স্মৃতি যদি অনুধ্যান কর, তা-হলে ভুল হবে, একেবারেই ভুল হবে। তোমার এই শূন্যতার অর্থ আমি জানি। অন্য কাউকে নয়, নিজেকে তুমি গোটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে দায়ী করছ।*

---

* মৎ-লিখিত 'কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন' গ্রন্থটি অবশ্যই আপনার পড়া দরকার হবে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? এত বড় একটা যুদ্ধ'ত একজনের চেষ্টায় হয় না। অনেক ইন্ধন জমা হলে তারপর একদিন দাবানলের মত দপ্ করে জ্বলে উঠে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও তাই। তুমি নিমিত্ত, কৃষ্ণ কারণ। পাণ্ডবেরা কর্ম। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের বিনাশ যার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, যে খণ্ড খণ্ড ভারতরাজ্যকে অখণ্ড ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে আজীবন শান্তি, প্রেম, মৈত্রীতে বিশ্বাসী, ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য যে কৃষ্ণ পার্থকে সংগ্রামে প্ররোচিত করল, পার্থের বংশধরকে রক্ষার জন্যে যে কৃষ্ণ তার নবঘন শ্যামস্নিগ্ধ তনুখানি দিয়ে আড়াল করল উত্তরার গর্ভস্থ শিশুকে, যার রক্ষায় অক্ষত থাকল ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা—সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের কীর্তন করলে তোমার মনের গ্লানি কেটে যাবে। অন্তরে শান্তি পাবে। কৃষ্ণ মানুষ আর ভগবান এই দুই সত্তার এক অখণ্ড পূর্ণরূপ। সবগুণে সমুজ্জ্বল সেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে ধন্য হোক 'পাণ্ডব-জয়' কাব্য। কৃষ্ণই সব। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে পাণ্ডবদের কোন অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। কৃষ্ণের অকুণ্ঠ সাহায্য, সহোযোগিতা, নেতৃত্ব, পরামর্শ, বন্ধুত্ব ব্যতীত এই অসম যুদ্ধে পাণ্ডবরা কখনও জয়ী হত না। কৃষ্ণের সেই নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, পরোপকার এবং বঞ্চিত, ভাগাহত, অসহায়, দুঃখী, দুর্গত, নির্যাতিত মানবকুলের প্রতি তার সত্যিকারের দরদ ও সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সাম্য, প্রেম, মৈত্রীর বিশ্বাস কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে অসাধারণত্ব দিয়েছে। সেই কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নয়, ভগবানের অংশ। তিনি নররূপী ঈশ্বর। তাকেই পূজা কর দ্বৈপায়ন।

দৈববাণীর মত কথাগুলো শুনল দ্বৈপায়ন। মনে হল, আকাশ থেকে পরীরা যেন নেমে এল অজস্র দীপ হাতে। হঠাৎ অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠল। কোথাও আড়াল নেই। পথটা দিবালোকে ঝলমল করতে লাগল। একটা থম-ধরা অনুভূতি নিয়ে দ্বৈপায়ন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বেশ বুঝতে পারছিল এ কোন দৈববাণী নয়, তার গভীর অভ্যন্তরের কথা। নির্জনতায় সেই কথাগুলো ছড়িয়ে গেল সমস্ত

স্নায়ুমণ্ডলে। সত্যি ভাবনাগুলো বড় এলোমেলো, অগোছালো। গুছিয়ে সুশৃংখলিত করতে না পারার দুর্ভাবনা শঙ্কা যেন তার কানে কত কি ফিস ফিস করে অভয়বাণীর মত শুনিয়ে গেল। ঐ আশ্বাসবাণী তার মনের প্রতিক্রিয়া থেকে জাত। কিন্তু তার ইচ্ছা, আকাংখার নির্দেশ।

দ্বৈপায়নের হৃদয় মন পুলকিত হল। মনের অভ্যন্তরে বিবেক পাহারাদারের মত হাঁক দিয়ে বলল: দ্বৈপায়ন এ যুদ্ধের এক খল পার্শ্বচরিত্র তুমিও। শ্রীকৃষ্ণের মত তুমিও মুখে ধর্ম ধর্ম করেছ। কারণ, তোমরা ভাল করেই জান, ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীকে ধোঁকা দেয়ার সহজ মন্ত্র হল ধর্ম। ধর্মের প্রভাব ভারতবাসীর মনে কত গভীর, কত ব্যাপক তোমরা দু'জনে তা বুঝেছিলে। তাই ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির ওতপ্রোত সম্বন্ধ স্থাপনে সার্থক হয়েছিলে। সাধারণ মানুষের অন্তরে এর প্রভাবকে ব্যবহার করতে পারলে কী ধরনের রাজনৈতিক সার্থকতা আসতে পারে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করে তা প্রমাণ করে দিলে। আগামী দিনের মানুষ এই যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নেবে ধর্মের প্রভাবকে রাজনীতিতে যে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করতে পারবে তার জয় অনিবার্য। সফল নেতৃত্ব দিতে তিনিই সক্ষম। সাধারণ মানুষ সহজ, সরল। ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক প্রতারণা, ছলনা তারা বোঝে না। তাই ধর্মের ভেক পরে তাদের ভুলিয়ে রাখা যাচ্ছে। তারা যদি জানতে পারত রাজনৈতিক নেতা কিংবা সন্ন্যাসী ধার্মিক নন, তা-হলে তাদের ভুলিয়ে রাখা যেত না। আসত বিপ্লব। বিদ্রোহ। ধর্ম দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অধর্মের সঙ্গে ধর্মের, অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের, মিথ্যের সঙ্গে সত্যের লড়াই হল, এ যুদ্ধ। অথচ কী আশ্চর্য, এ যুদ্ধে কোথাও ধর্ম ছিল না। সততা ছিল না। অন্ততঃ পাণ্ডবেরা কেউ ধর্মযুদ্ধ করেনি। কৃষ্ণও নিঃসঙ্কোচে অকপটে সে কথা স্বীকার করে যুধিষ্ঠিরকে বলেছে, "শোনো পাণ্ডবগণ, কৌরবেরা ছিল মহাযোদ্ধা। তোমরা ধর্মযুদ্ধে কিছুতেই তাদের হারাতে পারতে না।" কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সুরু ও শেষ অধর্ম দিয়ে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন,

কারো সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ হয়নি। পাণ্ডবদের কেউ সৎ কিংবা ধার্মিক নয়। স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও নয়। এমন কি দ্বৈপায়ন তুমিও নও। কৃষ্ণও নয়।

এসব কথা আগে এভাবে মনে হয়নি দ্বৈপায়নের। তবে কি তার অদৃষ্ট দেবতা সত্যি তাকে দিয়ে কিছু করাতে চান? ঈশ্বর তাকে যা করাবেন সে তা পারবে এই ভরসাটুকু দ্বৈপায়নের আছে। এবং এই মুহূর্তে সে নিজের ভেতর একটা দিব্যশক্তি অনুভব করল। এক মহৎ উদার অনুভূতিতে তার হৃদয় বিকশিত হল। দৃষ্টি অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেল। সুদূর অতীতকে দ্বৈপায়ন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে লাগল।

একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল দ্বৈপায়নের। মনে হল, এ সবই যেন তার আবার তার যেন নয়। এ যেমন তার বাইরেকার জগৎ, তেমনি তার অন্তরের জগৎ। এর সঙ্গে তার অনেককালের সম্পর্ক। কোন জীয়নকাঠির যাদুস্পর্শে তার স্তিমিত প্রাণে হঠাৎ আলোর দীপ জ্বলে উঠল। দ্বৈপায়নের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হল। মনে হল, জীবনের এক পরমক্ষণের ডাক এসেছে তার। দ্বৈপায়ন বুকের হৃৎস্পন্দনের মধ্যে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য বাজছে। আর দ্বৈপায়ন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। চোখের তারায় ভেসে উঠল কৃষ্ণের শ্রীময় অনিন্দ্যসুন্দর মুখ।

কৃষ্ণের সঙ্গে সেই তার প্রথম দর্শন।

স্থান দ্বারকা।

দেখেই ভাল লেগে গেল। মুখে একটা অপার্থিব পবিত্রতা। স্নিগ্ধ, শান্ত, গভীর ঢুলু ঢুলু দুনয়নে কী গভীর মায়া। চোখ ফেরানো যায় না। ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা চুম্বক আকর্ষণ ছিল যে দ্বৈপায়নও মুগ্ধ হল। কৃষ্ণের সব কিছুই ছিল অদ্ভুত। গায়ের রঙ গৌর, শ্যামলা, শুভ্র কিংবা কৃষ্ণবর্ণ নয়। অন্যরকম। আলো দেয় যে নীল আকাশ তা যেন পুণ্যের মত ঝরে পড়ছে তার সারা অঙ্গে। এ মানুষ কখনও সাধারণ হয় না। তার মধ্যে মহাপুরুষের অনেক লক্ষণই দ্বৈপায়নের চোখে পড়ল। ঋষির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাকে নিরীক্ষণ করল।

পৃথিবীতে এমন এমন মানুষ থাকে যাকে দেখেই প্রত্যয় জন্মে।

কৃষ্ণ সম্পর্কে অনুরূপ প্রত্যয় জন্মাল। মনে হল, এই মানুষটির মধ্যে বিধাতা জয় করার একটা আলাদা শক্তি দিয়েছেন। কৃষ্ণ পৃথিবীকে জয় করতে এসেছে। নতুন পথের হদিশ দিতে, নেতৃত্ব দিতে, লোকচালনা করতে, কর্তৃত্ব করতেই যেন তার আবির্ভাব। সাধারণ দুঃখী, অসহায় মানুষ তার যুদ্ধের ঘোড়া, আর সে সারথী। বয়সে কনিষ্ঠ হলেও ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণে দ্বৈপায়নের অন্তরের সংগোপন শ্রদ্ধা নিঃশব্দে আদায় করে নিল। কৃষ্ণের মধ্যে দ্বৈপায়ন তার ইষ্টকে, তার ঈশ্বরকে, জগতের পরিত্রাতাকে প্রত্যক্ষ করল। এতকাল ধরে একমনে যাকে খুঁজছিল দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের রূপ ধরে সে যেন দাঁড়িয়ে আছে তার চোখের সামনে। ভাগ্যদেবতার রথ নিয়ে যেন সে তার সামনে দাঁড়াল।

দ্বৈপায়ন রথের চাকার ঘর ঘর শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছিল তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনার ভেতর।

নিজের অজান্তে তার মন ভেসে গেল সুদূর অতীতে। ভারত পরিভ্রমণ করতে করতে দ্বৈপায়ন দ্বারকায় পৌঁছল দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ রথ নিয়ে এল তাকে অভ্যর্থনা করতে। সেই প্রথম কৃষ্ণদর্শন দ্বৈপায়নের। নীল সমুদ্রের নীল জল যেন পেখে করছে তার কলেবরে। অর্জুন ভিন্ন এরকম অদ্ভুত রঙ আর কোন মানুষের দেখেনি দ্বৈপায়ন। দেখা মাত্র চেনা হয়ে গেল। মুগ্ধ দুটি চোখ তার চোখের উপর স্থির। পলক পড়ে না মোটে।

রথ থেকে নামল কৃষ্ণ। হাসি হাসি মুখ। চোখে মায়ার ফাঁদ করজোড় করে পূজারীর মত বিনম্র ভঙ্গীতে দাঁড়াল একেবারে দ্বৈপায়নের সামনে। তারপর মাথা হেট করে দু'হাত দিয়ে পদযুগল স্পর্শ করল। ভক্তিভরে দু'হাত কপালে ঠেকাল, চরণরেণু গায়ে মাখল। পরিতৃপ্তির শ্বাস পড়ল। বিনীত ভাষণে বলল, ঋষিবর, আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হল কৃষ্ণ। আপনার পবিত্র পদস্পর্শে দ্বারকা পবিত্র হল। এখন অনুগত ভক্তের সেবা গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

কৃষ্ণের বিনম্র ভক্তি ও বিনয় আচরণে দ্বৈপায়ন মুগ্ধ ও অভিভূত

হল। মুখ দিয়ে তার কথা বার হল না। নিঃশব্দে এবং নীরবে সে কৃষ্ণের অনুগমন করল।

স্বপ্নাচ্ছন্নের মত রথ চালিত হয়ে দ্বারকাধামে পৌঁছল দ্বৈপায়ন। কৃষ্ণ নিজের হাতে সুগন্ধ জলে তার পাদপ্রক্ষালন করে দিল। তারপর রেশমের উত্তরীয় দিয়ে পদযুগল মুছিয়ে ছিল। বিস্ময়ের পর বিস্ময় দ্বৈপায়নকে অভিভূত করে ফেলল। কত বড় মানুষ কৃষ্ণ। তবু কোন রজগুণ নেই তার। নেই দম্ভ, অহংকার। কোন মুনি-ঋষিও বোধ হয় এত নিরহংকার কিংবা সত্ত্বগুণের অধিকারী নয়। তার ব্যক্তিত্বের অপার মহিমার পবিত্র আর মহৎ অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল দ্বৈপায়নের হৃদয়। ধ্যানদৃষ্টিতে কৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি ও কার্যকে প্রত্যক্ষ করল। কৃষ্ণকে মানুষের ঈশ্বর রূপ ধরে অবতীর্ণ হতে দেখল। একটা তীব্র আনন্দে তার দুচোখ বুজে গেল। মন্ত্রের মত বুকের ভেতর গুঞ্জরিত হল "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম"। অমনি দ্বৈপায়নের সারা গায়ে কাঁটা দিল।

দ্বৈপায়ন সম্মোহিত। তার বুদ্ধি কাজ করছিল না। ফুলের উপর আলো পড়ে তার পাপড়িগুলি কেমন করে খোলে তার রহস্য টের পায় না ফুল। তেমনি জানতে পারে না কোন অলক্ষ্য নির্দেশে ফুল ফল হল। দ্বৈপায়নও তেমনি জানে না, কার নির্দেশে কোন্ দিকে ছুটছে? তবে বুঝতে পারছিল কৃষ্ণ যেন তার দিকে টানছে। এক অনির্বচনীয় আনন্দে দ্বৈপায়নের বুক ভরে গেল।

বসার জন্যে কৃষ্ণ একটি স্বর্ণ-সিংহাসন এগিয়ে দিতেই দ্বৈপায়ন চমকে উঠল। বুকটা হঠাৎ থর থর করে কেঁপে গেল। দ্বৈপায়ন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল ক'টা মুহূর্ত। কৃষ্ণ কৌশল করে যে তার মন জেনে নিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মৃদু হাসতে হাসতে বলল: রাজাসনে সন্ন্যাসীকে মানায় না। এ হল কর্তৃত্বের আসন, অহংকার চিহ্ন। ঐশ্বর্যের গর্ব, লোভের স্বর্গ, চিত্তবিকারের উদ্যান। এর সংস্পর্শ থেকে সন্ন্যাসীকে দূরে থাকতে হয়।

কৃষ্ণ হাসল। বলল: ও সব মনের ব্যাপার। মন যদি ঠিক থাকে,

লোভশূন্য, স্বার্থহীন হয় তা-হলে কোন কিছুই মনে দাগ কাটে না।

স্বর্ণ-সিংহাসনের অদূরে রক্ষিত দারুনির্মিত একটি চৌকি টেনে নিয়ে উপবেশন করল দ্বৈপায়ন। কৃষ্ণ হাসি হাসি মুখ করে বলল: সেইজন্যে মনটা সামলাতে হয়। বশ করার মন্ত্র আয়ত্ত করতে হয়। যার নেই, মনের দরজায় মাথা কুটে মরতে হয় তাকে। মনটাই সব বলে, অভ্যাস, সংযমের কঠোরতা দরকার। অনুশীলন ছাড়া তা হয় না।

কৃষ্ণ হাসল। তর্ক করল না। স্তিমিত গলায় বলল: তা তো বটে।

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলল না। চুপ করে রইল। দ্বৈপায়ন আশা করছিল কৃষ্ণ কিছু বলবে। কিন্তু প্রতীক্ষা করে হতাশ হল। মাঝে মাঝে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। এমন করে কিছুক্ষণ কাটল।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের দিকে চেয়ে কুটিল হেসে বলল: মহর্ষি ভারত পর্যটন করে খুবই শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। চোখের কোটরে কালি পড়েছে। এখন আপনার বিশ্রামের আবশ্যক। সময়ান্তরে এসে ভারত-দর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনব।

কৃষ্ণের কথাটা লুফে নিল দ্বৈপায়ন। বলল: বৎস, এক বুক প্রত্যাশা নিয়ে এক ভাঙা ভারতবর্ষকে দেখলাম। যা জানলাম, চোখে দেখলাম, কানে শুনলাম তা কথায় বলার সাধ্য নেই। এক চরম পরীক্ষার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বিপদের প্রহর গুনছে যেন গোটা ভারতভূমি। বঞ্চনা অপমানের কালি মুখে মেখে কার প্রতীক্ষায় আছে যেন। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে জোনাকির আলোও জ্বলতে দেখলাম না। আমিও ভাল করে জানি না কোন অমরার সন্ধানে চলেছি। একদিন পথে হঠাৎ একটি পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পথ চলার গান গাইতে গাইতে তারা চলেছিল। হাতে তালি দিয়ে তারা একত্রে গাইছিল: "গড়ে তুলব ভাঙাঘর, সর্বহারা জনতা জীবন, / পৃথিবীর বায়ু আয়ু রক্তিত প্রাণের মহাবলে বাজাবো মুক্তির শাঁখ।" থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। তমসার মধ্যে এ কোন আলোর দূত আমি দেখলাম?

বিস্ময়ে আনন্দে বুক আমার ভরে গেল। সেই আনন্দ ব্যাপ্ত হল আর এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে।

সহসা কৃষ্ণ একটু চমকাল। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে দ্বৈপায়ন তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। কৃষ্ণ তার ভেতরটাকে যেন দেখছিল। কথাটা কিছু আঁচ করতে পেরেই টান টান হয়ে দাঁড়াল। বলল: আপনি কোন পরিবারের কথা বলছেন? তারা কে? তাদের উপর আপনার এত গভীর আস্থা, প্রত্যয় এবং দুর্বলতার কারণ কি?

দ্বৈপায়নের দু'চোখ রহস্যময় কৌতুকে হাসতে লাগল। কৃষ্ণ যাতে কিছু আঁচ করতে না পারে তার জন্যে বলল: মুনি-ঋষিরা একটু প্রণাম পেলেই খুশি হয়। একটু সেবা, শ্রদ্ধা, ভক্তি পেলে একেবারে গলে যায়। বড় স্পর্শকাতর আমরা। কিন্তু এখন মুনি-ঋষির আর সে সমাদর নেই। থাকবে কোথা থেকে? গর্বিত ক্ষাত্রশক্তি ব্রাহ্মণ্য গৌরবকে পূর্বের মত সমাদর করে না, সম্মান করে না। ক্ষাত্রশক্তির তেজে, প্রাধান্যে ব্রাহ্মণ্য গৌরব আজ যেতে বসেছে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে অনেক ব্রাহ্মণ স্বধর্ম ও স্ববৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করেছে। এটা মোটেই শুভ নয়। ব্রাহ্মণের প্রভাব কমছে বলেই ধর্মের প্রতি মানুষের মন নেই। অবিশ্বাস, সন্দেহে শুভবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। ঈশ্বরকে ভয় করে। কিন্তু শ্রদ্ধা কিংবা ভক্তিতে তার উৎসাহ নেই।

কৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলল: আমিও এসব কথা শুনতে উৎসাহ পাচ্ছি না। আপনি সমস্যার কথা বলছেন। সেই পরিবারের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। তবু জেনেশুনে আপনি লুকোনোর চেষ্টা করছেন।

সকৌতুকে দ্বৈপায়ন চোখ ঘুরিয়ে বলল: কৌতূহল খুব খারাপ জিনিস। তোমার কৌতূহল দেখে মনে হচ্ছে, তুমিও কারো অনুসন্ধান করছ। কাউকে খুঁজছ? কিন্তু তোমার খোঁজা, আমার খোঁজা এক না হতে পারে।

আবার মিলতেও পারে।

এরকম অনুমানের হেতু।

আমরা দু'জনেই একজনকে খুঁজছি বলে।

উঁহু—চালাকি করে কিছু জানতে পারবে না।

আপনি না বললেও আমি জানি, তারা কে? এইমাত্র জানলাম তারা জীবিত আছে।

দ্বৈপায়ন ধরা পড়ে গেল যেন কৃষ্ণের কাছে। তবু অবাক হওয়ার ভাণ করে বলল: তুমি কার কথা বলছ? যাদের সঙ্গে আমার দেখা হল তারা যে তোমার চাওয়ার মানুষ কেমন করে জানলে?

কৃষ্ণ হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি। জীবনরহস্য বুঝতে পারার কৌতুকে তার দুই চোখ জলজল করতে লাগল। অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে হাসল। বলল: নৌকোর হাল যেমন নদীকে জানে।

দ্বৈপায়নকে নীরব দেখে পুনরায় বলল কৃষ্ণ: আমি যাকে খুঁজছি তাকে আপনার চেনার কথা নয়। তবু তাদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি কেমন করে বুঝলেন?

দ্বৈপায়ন কাঁপড়ে পড়ল। কৃষ্ণের কাছে সে ধরা পড়ে গেল। ফাঁদে-পড়া পাখীর মত অসহায় করুণ দুটি চোখ মেলে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। আর, কৃষ্ণ তার দিকে চেয়ে মিটমিট করে হাসছিল। বলল: মহর্ষি কথা দিয়ে ছদ্মবেশ ঢাকা যায় না। আর কেউ না জানলেও, আমি অনুমান করতে পারি ঋষিত্ব আপনার ছদ্মবেশ।

দ্বৈপায়ন চমকাল কিন্তু প্রতিবাদের চেষ্টা করল না। বরং চুপসে গেল। হতবাক্ হয়ে কৃষ্ণের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

কোন ভাবান্তর নেই কৃষ্ণের। স্নিগ্ধ ও গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল আমার চোখের উপর। বলল: মহর্ষি, আমার কৌতূহলের উত্তর পেয়ে গেছি। জতুগৃহে যারা পুড়ে মরেছিল বলে রটেছিল সেই পঞ্চ-পাণ্ডব এখনও জীবিত। সেই শুভ সংবাদ দিতে আপনি দ্বারকায় এলেন। তবু, সংশয়ের মেঘ কাটছিল না।

বিস্ময়ে দ্বৈপায়নের বাক্যস্ফূর্তি হল না। একজন মানুষের মনের অভ্যন্তরের এত গভীর কথা কৃষ্ণ টের পায় কি করে? এক প্রগাঢ়

শ্রদ্ধায় দ্বৈপায়নের মাথা হেঁট হয়ে এল। আর এক আশ্চর্য অনুভূতি আর উদ্বেল আনন্দে দেহ মন ভরপুর হয়ে উঠল। দ্বৈপায়নের সমস্ত অন্তঃকরণ বাইরের রৌদ্রালোকিত পৃথিবীর মত হয়ে গেল। আলোর সমুদ্রে ভাসছে জগৎ। দ্বৈপায়নের অন্তর রৌদ্রালোকিত নীলাকাশের মত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। এক অনাস্বাদিত পুলকানুভূতিতে তার সারা শরীরে যেন ঘুঙুর বাজতে লাগল।

মুগ্ধ দুটি চোখ কৃষ্ণের চোখের উপর পেতে রেখে গদগদ কণ্ঠে নিরুচ্চারে বলল: "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে।" বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই কথাটা গানের ধুয়োর মত মনের ভেতর বার বার যাওয়া-আসা করতে লাগল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত দ্বৈপায়ন প্রশ্ন করল: কৃষ্ণ, তুমি কে?

কথাটা উচ্চারিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আকাশজোড়া বিদ্যুল্লেখার মত চমকিত হতে লাগল দ্বৈপায়নের ভেতরটা। তার সমস্ত অনুভূতিও স্পন্দিত হতে লাগল। কতক্ষণ কৃষ্ণের দু'খানা হাত বুকে চেপে ধরে রেখেছিল দ্বৈপায়নের হুঁশ ছিল না। দু'চোখের কোণ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল কৃষ্ণের দুই হাতে। তার হাত দুটি ভিজে গেল দ্বৈপায়নের অশ্রুনীরে।

কৃষ্ণের আহ্বানে দ্বৈপায়নের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। সম্মোহন থেকে চৈতন্যে ফিরল। একটা ঘোর-লাগা আচ্ছন্নতা লেগে ছিল দু'চোখে। কৃষ্ণ মধুর কণ্ঠস্বর শুনল: মহর্ষি কি হয়েছে আপনার?

দ্বৈপায়ন কথা বলতে পারল না। কৃষ্ণের ভেজা হাতটি সে যত্ন করে গেরুয়া উত্তরীয় দিয়ে মুছিয়ে দিল। তারপর বিড় বিড় করে বলল: ওগো মানুষের ভগবান, একবার আমার আঁখির সামনে দাঁড়াও। যে চোখ দিয়ে তুমি মানুষের ভেতরটা দেখতে পাও সেই চোখদুটিতে কত যাদু লুকনো আছে দেখব। কথাগুলো কৃষ্ণ শুনতে পেল কিনা জানে না দ্বৈপায়ন, কিন্তু তার সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে গেল। দ্বৈপায়ন নিজেও কম আশ্চর্য হল না। একটা অদ্ভুত সুখে ও আনন্দে ভরে গেল তার ভেতরটা।

সেই প্রথম দ্বৈপায়নের প্রাণে কৃষ্ণ অনুরাগের কল্লোল। সেই প্রথম আলোর চরণধ্বনি নতুন করে আবার বাজল বুকের খুব গভীরে।

দ্বৈপায়নের অন্তরে আর কোন দ্বিধা সংশয় রইল না। বহুযুগের সঞ্চিত তুষার গলে যেন পতিতপাবনী গঙ্গাধারায় পরিণত হল। মনটা ক্রমে সুধারসে অভিষিক্ত হল।

॥ দুই ॥

ক্ষৌমবাস পরে শুচিশুভ্র হয়ে দ্বৈপায়ন কাব্য রচনায় নিমগ্ন। তপস্বীর মত আত্মসমাহিত মুখ। চোখের দৃষ্টি কেমন একটা ঘোর-লাগা আচ্ছন্নভাব। হৃদয়ের গভীরে কৃষ্ণারতির দীপ জ্বলছে। কিন্তু কিছুতেই তার দীপ শিখা উদ্ভাসিত করতে পারছে না। বহু আপাত বিরোধ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে থমকে যাচ্ছে তার সব ভাবনা।

দ্বৈপায়ন ভেবে স্থির করল কিছুতেই বিচলিত হবে না। অকারণ কোন কিছু প্রশ্রয় দেবে না মনের মধ্যে। কিন্তু যখন ধীরভাবে মনের মধ্যে গভীর করে কিছু চিন্তা করে তখন শুনতে পায় মথুরার আর্ত-পীড়িত, অসহায় মানুষের আকুল ক্রন্দন। লক্ষ লক্ষ মানুষ মাথা ঠুকে, কপাল কেটে রক্তারক্তি করে, বুকে করাঘাত করে ঈশ্বরের কাছে তাদের শেষ আর্তিটুকু পৌঁছে দেবার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা করছে। তারপর ব্যর্থ হতাশায় ভেঙে পড়ে তাঁর কাছেই আবার প্রশ্ন করছে : ওগো বিশ্বদেবতা, তুমি অত উঁচুতে থেকেও কি দেখতে পাচ্ছ না সব? কতকাল আর চোখ বুজিয়ে থাকবে ঠাকুর? মহাদানব কংসের অনাচারে, অবিচারে, ব্যভিচারে, শাসনে, শোষণে, নির্যাতনে আমরা হাজার হাজার মানুষ কত কষ্টে কাটাচ্ছি। কত দুঃখে তোমাকে ডাকি, তবু তুমি শুনতে পাও না আমাদের কান্না? আমাদের বুকফাটা মরণ চিৎকার তোমার নিদ্রা ভাঙতে পারে না, কেন? তুমি কি বধির? মানুষ, পৃথিবী থেকে তুমি এতদূরে যে, আমাদের ডাক

তোমার কাছে পৌঁছয় না। তোমার দৃষ্টি পৌঁছয় না এতদূর পর্যন্ত। পৌঁছলে চুপ করে থাকতে পারতে না? তুমি শুধুই পাষাণ বিগ্রহ! বধির! নিষ্প্রাণ! জড়!

নিদ্রিত দেবতার ঘুম ভাঙতে আরো কত বছর কেটে গেল কে জানে?

কিন্তু মথুরার রাজনীতিতে হঠাৎ একটা বড় রকমের পরিবর্তনের ঝড় এল। সেই ঝড় বসুদেব। বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অসহায় মানবকুলকে সামনে রেখে বসুদেব রাজনীতির সামনে এসে দাঁড়াল। কংস প্রমাদ গুনল। অথচ সে প্রিয়তম ভগিনী দেবকীর স্বামী। কংস তার কর্তব্য স্থির করে ফেলল। রাজনীতিতে আত্মীয়, বন্ধু বলে কিছু নেই। ভগ্নিপতি বলে বসুদেবকে কোন মার্জনা করা প্রয়োজন বোধ করল না। মথুরাপুরের রাজনীতির পালে জনতার রোষের বাতাস লাগার আগেই কংস ভগিনী সহ তাকে কারারুদ্ধ করল। বসুদেব বলল: গোটা মথুরা আজ কারাগার। বিশাল কারাগার থেকে তুমি আমাকে ছোট কারাগারে নিয়ে এলে। আমাকে এখানে আঁটিবে'ত? ঘর বদলের এই খেলা করে তুমি ঝড় ঠেকাতে পারবে? মনের বনে যে দাবানল জ্বলছে তার আগুন নেভানোর শক্তি তোমার নেই। আমি সামান্য মানুষ, নগণ্য আমার শক্তি। কারাগারের বাইরে কিংবা ভেতরে থাকাতে আমার কিছু যায়-আসে না। মথুরার ঘরে ঘরে আজ বসুদেব। তুমি ক'টা বসুদেবকে বন্দী করবে?

কংস কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে বসুদেবের চোখে চোখ পেতে রাখল। তারপর ভয়ংকরভাবে অট্টহাস্য করে উঠল। মরিয়ার হাসি। প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল: আচ্ছা সে দেখা যাবে?

বসুদেব হাসল। বড় মধুর নির্ভয় সে হাসি। বলল: দেখবে বৈকি! অনন্ত আকূতির দীপ জ্বালিয়ে মথুরার মানুষ একদিন তোমার তৈরী এই অন্ধ-কারাগারে আলোর দেবতাকে পথ দেখিয়ে আনবে। সেদিন আর খুব দেরি নেই। তোমার সাধ্য কি অন্ধকারে তার আগমনকে ঠেকাও! তুমি কে? তোমার ক্ষমতাই বা কতটুকু?

কংস আবার মহিমার হাসি হাসল। দম্ভের সঙ্গে বলল : আমি কংস। আমি বিশ্ববিধাতার অনিয়ম। আমি মানি না নিয়ম, কানুন, বন্ধন, শৃংখল। আমি ঝঞ্ঝা, বজ্র, ভূমিকম্প। আমি সব মিলিয়ে মহাত্রাস। আমি সব কিছু ভেঙে করি চুরমার।

বসুদেব কংসের দম্ভ দেখে হাসল। মৃদু কণ্ঠে বলল : ভাঙা তার শোভা পায়, যে ভেঙে গড়তে জানে। যারা শুধু ভাঙে, গড়ে না কিছুই, তারা দানব। দানবের লুণ্ঠনে, অত্যাচারে বসুন্ধরা বারংবার হৃতশ্রী হয়েছে। তার শ্রী ফেরাতে, লাঞ্ছনা দূর করতে একদিন অবতারীর আবির্ভাব হয়।

কংস বলল : ও-সব গল্প আমি বিশ্বাস করি না।

বসুদেব বলল : আমি বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাসের মধ্যেই তিনি আছেন। বিশ্বসৃষ্টির অনাদি-অনন্তস্বরূপ হয়ে তিনি আমাদের অন্তরেই বিরাজ করছেন। বিশ্বাসই আসল। প্রহ্লাদ বিশ্বাস করত ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। রাজসভায় স্ফটিক স্তম্ভেতেও বিদ্যমান। হিরণ্য-কশিপু বিশ্বাস করল না। দম্ভে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে স্ফটিকগাত্রে পদাঘাত করল। অমনি অসীম শক্তি নিয়ে স্তম্ভ ভেঙে বেরিয়ে এল বিশ্বাসের দেবতা। নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করে অবিশ্বাসের অসুর হিরণ্যকশিপুকে নিমেষে কাল কাল করল। একে গল্প বলে উড়িয়ে দিও না। তোমাকেও অবিশ্বাসের মূল্য একদিন দিতে হবে। এই কথা বলে আমার এক পরমাত্মীয় ও বন্ধুকে শুধু সতর্ক হতে বললাম। বলতে পার, তোমার জন্যে আমার শেষ শুভ প্রার্থনা। তুমি মানুষ হও। আর আমি কিছু চাই না।

কংস হাসল না। কথাও বলতে পারল না। বড় বড় চোখ দুটিতে গভীর উদ্বেগের ছায়া ঘন হয়ে উঠল। অপরাধীর মত মাথা হেঁট করল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর কম্পিত গলায় বলল : মানুষের সেই বিশ্বাসের আমি টুঁটি চেপে ধরব। মথুরাপুরের কোন জননী আর শিশুর মুখ দেখবে না। শিশুর কান্না শুনবে না। বলতে বলতে প্রস্থান করল।

কথাগুলো দ্বৈপায়নের হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে ঝুলে রইল। কয়েকদিন ধরে কথাটা মনে যাওয়া-আসা করছিল। কিন্তু সত্যে পৌঁছতে পারছিল না। আজ প্রত্যূষে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রাতঃপ্রণাম করতে করতে আচমকা উত্তর পেল দ্বৈপায়ন। আর শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল: "ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা প্রভু তোমার পানে, তোমার পানে।'

অক্রুরও আনন্দের সিঁড়ি বেয়ে বসুদেবের কথার রহস্যে পৌঁছতে চেষ্টা করল। সত্য সবাইকে ধারণ করে রাখে। মনের সমস্ত তার-গুলি তার সুরে বাঁধা থাকে, অলক্ষ্য দেবতা যখন তা টংকার দেন তখন দেহ মন জুড়ে সুরের তরঙ্গ বয়ে যায়। তাঁর গান তিনিই করেন। সেই গানের সুর মানুষের মনের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে মনকে আলোড়িত করে, উদ্দীপিত করে। বসুদেবের ভেতরটা সেই গানের সুরে ভরপুর হয়ে আছে। তাই, বিশ্বাসের আশ্চর্য রহস্যলোকে ঢুকে পড়ে সে অনুভব করেছে 'তোমার গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তাকে চিনি আমি, তখন তারে জানি।' বসুদেবের মর্মের মধ্যে, সত্তার মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে এই ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটেছে। তার সেই ধ্যানজ্ঞান যেন মানবশিশুর কায়ারূপ পেল বসুদেবের মাধ্যমে। কী করে তার শরীর ধারণ করল, কোথা থেকে প্রাণ পেল, সে-রহস্য বিধাতাই জানেন। তবে এ পুত্র বসুদেব কিংবা মথুরাবাসীর দীন আকুতির অথবা আকাংখার সমষ্টি নয়। বিধাতা শিশুর ভেতর অন্য সম্ভাবনার বীজও উপ্ত করেছেন। এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলার জন্যে তার মধ্যে যেমন অনেক অসাধারণ অদ্ভুত গুণ ও কর্মের সমাবেশ হয়েছে তেমনি জন্মের শুভ লগ্ন থেকে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মধ্যে কোথায় একটা রহস্য রয়ে গেল, এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে একটা কিছু দ্বৈপায়নের ভেতরে স্পন্দন তুলল। সেদিনই মানুষ টের পেল এই শিশুর ভেতর একটা কিছু আছে। সেটা সেদিন তাদের চোখে ধরা পড়েনি, কিন্তু মন দিয়ে তাকে অনুভব করেছে। অনুরূপ একটা

অনুভূতি দ্বৈপায়নকে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করল। কৃষ্ণের আবির্ভাবের দিনটা তার চোখে ভেসে উঠল।

প্রকৃতির সেই নিকষ কালো ঘন অন্ধকারের কোন বর্ণনা নেই। সেই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের অতলে চাপা পড়েছিল পৃথিবীর সব অস্তিত্ব। লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বিশ্বচরাচর। পৃথিবীর সব আশা-ভরসা-বিশ্বাসের আলো যখন নিভে গেল তখন মানুষের ঈশ্বর, আলোর দীপ জ্বালাতে অন্ধকার রাতেই আবির্ভূত হলেন দুর্যোগকে সঙ্গী করে। মথুরায় মানুষকে সহজে চিনিয়ে দেবার জন্য প্রকৃতি যেন রুদ্ররূপে সাজল। দুর্গত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত মথুরাবাসীর দীর্ঘশ্বাস যেন প্রমত্ত প্রভঞ্জনের রূপ ধরে হু হু করে ছুটে এল, তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধ, উত্তেজনা যেন বজ্রের হুংকারে, বিদ্যুতের বিস্ফোরণে আকাশকে বিদীর্ণ করতে লাগল। সুপ্ত বৈকুণ্ঠপতির নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁর অপার করুণার বারি বর্ষণ হতে লাগল পৃথিবীতে। পরিত্রাতা যে অবতীর্ণ হলেন ধরাধামে, এটা বুঝিয়ে দিতে প্রকৃতির এই আয়োজন।

সেই রাতটা দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত মানুষের মনে লেগে রইল অনেক কাল। মানুষের চোখে তার আবির্ভাবটা বিশেষ অর্থবহ হয়ে থাকল। নন্দগৃহে যে শিশুর আবির্ভাব হল তার গায়ের রঙ সাধারণ মানব শিশুর মত নয়। কচি দুর্বাদলের মত কান্তিময় তার দেহ-লালিমা। তনুর ঐ বর্ণ মানুষের হয় না। ঐ গাত্রবর্ণই মথুরাবাসীকে তাদের পরিত্রাতাকে চিনিয়ে দিল। কৃষ্ণকে মথুরাবাসী নররূপী নারায়ণ ভাবল। দুঃখের পরিত্রাতারূপে এসেছে বলেই নিরানন্দ মথুরাপুরীতে সর্বত্র আনন্দের হাওয়া বইতে লাগল। সর্বত্র আনন্দম, পরমানন্দম্, পরম সুখম্, পরমা তৃপ্তি। কৃষ্ণের স্পর্শ, তার নামের গুণ যেন তার উপরে চন্দনের প্রলেপ দিল। সেই অনুভূতিতে দ্বৈপায়নের হৃদয়-মন জুড়িয়ে গেল। কেমন একটা ঘোর-লাগা আচ্ছন্নভাব তার দুই চোখের ঘন পল্লবে, ধ্যানদৃষ্টিতে নিবিড় হয়ে উঠল। এই অদ্ভুত ভাবাবেগের উৎস কোথায়; তার অনুরাগে, কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিতে, স্নেহে, না শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অথবা ঈশ্বর বিশ্বাসে; তার জানা নেই। তবে সুদূর

অতীতের অনেক ঘটনা ও দৃশ্য তার মনোভূমিতে নাড়া দিল।

কখনও যে কথা ভাবেনি দ্বৈপায়ন হঠাৎ সেই কথাটাই তার মনে হল। দেবকী বসুদেবের পত্নী নয়ঃ সে শৃংখলিতা ভারতমাতা। মনের কারাগারে বন্দী হয়ে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আজ সে বড় একা। ভয়ে তার মুখ থেকে স্বর পর্যন্ত বেরোচ্ছে না। তার আর্ত হাহাকার পর্যন্ত কেউ শুনতে পাচ্ছে না। পরিতাপের দুঃখ দহনে তার চিত্ত জ্বলছে। তবু অসহিষ্ণুতায় তার মুখের রেখা একটুও কুঁচকে যায়নি।

সম্মুখে অতলান্ত অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তবু সেই ঘোর অন্ধকারে একটি উজ্জ্বল তারা জ্বলছিল। সে হল ধ্রুবতারা। অর্থাৎ চিরন্তন সত্য। অন্ধকারও তার ঔজ্জ্বল্যকে গ্রাস করতে পারেনি। আশার প্রদীপ হয়ে বিশাল অন্ধকারের মধ্যে একটি টিপের মত জ্বলজ্বল করছিল। ধ্রুবতারা চিরদিন পথভোলাদের পথ দেখিয়ে আসছেন। বসুন্ধরাও যেন আকুল হয়ে আকাশের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে প্রার্থনা করছে; হে জ্যোতির্ময়, অন্ধকারে সুপ্ত দেবতাকে তুমি জাগ্রত কর। অনাবৃত কর তার অমৃতময় পরমস্বরূপ! ওগো, মানুষের ঈশ্বর তুমি কবে আবির্ভূত হবে? কবে দূর করবে অসহায় নারীর মাতৃত্বের এই নিত্য নতুন লাঞ্ছনা? হে সত্যস্বরূপ, তুমি প্রকাশিত হও, তুমি জাগ্রত হও। প্রকাশ কর তোমার অভয়রূপ। দ্বৈপায়নের ভেতরটা থর থর করে কেঁপে গেল।

সহস্র সহস্র বর্ষ আগের গল্প। সেদিন দস্যুর অত্যাচারে পীড়িত বসুন্ধরা এক বুক দুঃখ, উৎকণ্ঠা নিয়ে আকুল হয়ে ছুটে গেল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে। বসুন্ধরার কাতর মিনতি, তার অসহায় অবস্থা সৃষ্টিকর্তাকেও ব্যাকুল করল। অনন্তশয্যায় শায়িত নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুরও নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনিও আর নীরব থাকতে পারলেন না। রোরুদ্যমানা, হৃতশ্রী বসুন্ধরার দুর্দশা তাঁর চিত্ত বিগলিত করল! করুণার সাগর উথলে উঠল। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কৃপা ও করুণার পুণ্য মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হল নবজাতক। বিধাতার আশীর্বাদপূত পুষ্পরাশি ঝরে

পড়ল তার শিরে। আকাশে দিগঙ্গনারা হুলুধ্বনি দিল। ঐশ্বরিক শক্তি নিয়ে জন্মাল অমৃতের পুত্র। একবার নয় বহুবার। এক রূপে নয়, ভিন্ন ভিন্ন রূপে। অসত্য, অধর্ম, অশিব, অসুন্দর-এর হাত থেকে সত্যকে, ধর্মকে, শিবকে, সুন্দরকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর মর্তভূমিতে নেমে এলেন মানুষের পুত্র হয়ে, বন্ধু হয়ে। তা-হলে কৃষ্ণ ঈশ্বরের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে, মানুষের কামনার ধন হয়ে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে; মানুষের শুভকামনা করতে, মানুষের ভাল করতে। মানুষকে সৎ-মুখী ও ধর্মপরায়ণ করা ছাড়া আর কিছুই তার চাওয়া ছিল না। সকলের সততা, সুখ আর মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই সে নিজের জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতে চেয়েছিল। মানুষ মানুষ হোক—তার অধিকার, দাবি, মর্যাদা, গৌরব, সততা, আদর্শ, ধর্ম নিয়ে প্রেম, বিশ্বাস, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব নিয়ে সহবস্থান করুক, বৈষম্যের অবসান হোক, ন্যায়-সত্য-ধর্মের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করুক,—এটাই ছিল তার একমাত্র চাওয়া, মানুষের কাছে তার পরম প্রত্যাশা। নিজের জন্যে কখনো কিছু কামনা করেনি। মানুষের সেবার জন্যে, তার মঙ্গলের জন্যে, সত্য-সুন্দর-শিবের প্রতিষ্ঠার জন্যে সে সংগ্রাম করেছে, বিদ্রোহ করেছে। অসুন্দরকে ধ্বংস করেছে।

কৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি ও গুণগুলি এত প্রকট যে তাকে ঈশ্বরের দূত বা অবতারী বলে শ্রদ্ধা করতে হয়। দ্বৈপায়ন মনে মনে চিরদিন শ্রদ্ধা ও সম্মান করে এসেছে কিন্তু অবতারীবোধের সঙ্গে যুক্ত করে কখনো তার গুণ ও কর্মের বিচার করেনি। আজ একা বসে নিজের অভ্যন্তরে সেই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কথা ভাবতে ইচ্ছে হল তার। দ্বৈপায়নের বুকের ভেতর একটা তোলপাড় দেখা দিল। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনে প্রকৃতি কিংবা ঈশ্বর নিজেই তার অবতীর্ণ হওয়ার এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। কংসের অন্ধকার কারাকক্ষে দেবকীর যখন গর্ভ-যন্ত্রণা সুরু হল তখন থেকেই আকাশ কালো করে এল। তারপর গর্ভ-যন্ত্রণা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপ

বদলাল। সন্ধ্যার পূর্বেই ঝড় জল বিদ্যুৎ সহকারে প্রবল বর্ষণ নামল। প্রকৃতি যেন দেবকীর গর্ভ-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে নিজেই বড় উতলা হল। শৃংখলিতা দেবকীর অন্তরের অন্তস্তল বিদীর্ণ করে মন্দ্রিত হচ্ছিল একটা আর্তযন্ত্রণা। এক স্বরহীন কাতর কান্না। কষ্টে তার শরীর বেঁকে যাচ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল।

বসুদেব অদূরে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। অসহায় দৃষ্টিতে দেবকীর দিকে তাকিয়ে ছিল। আর নিরুচ্চারে প্রার্থনা করছিল: ভগবান আর কত কাল সইব এ নরক-যন্ত্রণা? আর'ত সহ্য হয় না। কবে হে ঈশ্বর তুমি অবতীর্ণ হবে? কবে দূর হবে নারীর এ লাঞ্ছনা, মাতার মাতৃত্ব লোভের এ অভিশাপ? মথুরা থেকে কবে এ পাপ দূর করবে? অধর্মের ধ্বংস হবে কবে? ওগো, জ্যোতির্ময় স্বরূপে তুমি প্রকাশ কর নিজেকে। হে বিশ্বস্রষ্টা! তুমি আবির্ভূত হও, প্রকাশ কর তোমার অভয়রূপ।

দেবকী যেন বসুদেবের অন্তরের কথাগুলো শুনতে পেয়ে বলল: সত্যি আর পারছি না ভগবান। সাত-সাতটি সন্তানের জননী হলাম, অথচ একজনেরও কচি, নরম তুলতুলে দেহের স্পর্শ পর্যন্ত পেলাম না। শুনতে পেলাম না তাদের কণ্ঠে—মা-ডাক। অথচ ঐ একটি ডাক শোনার জন্যে নারী কত ক্লেশ হাসিমুখে বরণ করে? আর তুমি মায়ের সব কষ্ট যন্ত্রণা দিয়েও আমাকে মা হওয়া থেকে বঞ্চিত রাখলে। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে? বল, আর কত যন্ত্রণা দেবে আমাকে?

হঠাৎ কারাকক্ষে শুনতে পেল, আর দেরী নেই। বিশ্বের আত্মা ভগবান এই দুর্যোগময়ী প্রকৃতিতে অবির্ভূত হবেন। প্রকৃতিতে তার পায়ের নূপুরধ্বনি বাজছে। তিনি এসে গেছেন একেবারে ঘরের দোরের কাছে।

অদৃশ্যলোক থেকে কথাটা দেবকীর কানে কত কি যেন ফিসফিস করে গেল। বসুদেবও সে কথা শুনল। বলল: শুনতে পাচ্ছ দেবকী!

আকাশবাণী হচ্ছে। ঈশ্বর অবতীর্ণ হচ্ছেন। দুর্যোগের আঁধার রাতেই তিনি আসছেন।

দেবকীর কোন সাড়া-শব্দ নেই। একটা দুরন্ত কষ্টের সঙ্গে মুখ টিপে তখন লড়াই করছে। কারাকক্ষে কোন মানুষ নেই। সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রহরীরা পর্যন্ত নিদ্রিত। তা-হলে আকাশ-বাণীর মত কথাগুলো কোন শূন্যলোক থেকে ভেসে এল? পরক্ষণেই বসুদেবের মনে হল, এ কোন ব্যক্তির অভয় বাক্য নয়, আকাশবাণীও নয়। এ হয়তো তার মুক্তি ব্যাকুল অন্তরের গভীর অভ্যন্তরের কথা। মনের সেই অধৈর্যতা কথা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘরময়। দীর্ঘশ্বাস মোচন করল বসুদেব। নিঃশব্দ এক হতাশা, পরিতাপ যেন আর্তনাদ করে বুক থেকে উঠে এল।

এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হল কারাকক্ষের অভ্যন্তর। বসুদেবের মনে হল আলোর রথে চড়ে কে যেন কারাগৃহে ঢুকল। আলোর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বিদ্যুতালোকে ঘর ভরে গেল। ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে উঠল নবজাতক। সেই মুহূর্তে বাইরে কোথাও বাজ পড়ল। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে চাপা পড়ল নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

বসুদেব চেয়ে আছে নবজাতকের দিকে। এক মহৎ ও বিশাল অনুভূতিতে আবিষ্ট হয়ে গেল বসুদেবের চেতনা। মুহূর্মুহু বিদ্যুতের আলোকচ্ছটা পুণ্যের আলোর মত ঝরে পড়ল নবজাতকের মুখে। মুহূর্তে কী যেন একটা ঘটে গেল তার ভেতর।

বসুদেব নির্বাক। তার কেবলই মনে হতে লাগল, ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে এ শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। তাই তার ক্ষুদ্র অবয়ব ঘিরে এত অন্ধকারের ভেতরেও আকাশ থেকে জ্যোতি চুঁইয়ে পড়ছে। বাতাস ভরে আছে নবজাতকের গায়ের সুগন্ধে।

দেবকী উৎসুক চোখে চেয়ে আছে বসুদেবের দিকে। তার ঘন কালো ডাগর দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে টলমল করছে কি গভীর মমতা। বিচিত্র একটা আবেগের ঢেউ বয়ে গেল দু'জনের প্রাণে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল। খুশির হাসি। মুক্তির হাসি।

মিট মিট করে একটা দীপ জ্বলছিল দেবকীর শিয়রে। প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো পড়ল তার মুখে। ভীষণ শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাকে। দু'চোখের পাতায় নিদারুণ কষ্টের ছাপ লেগে ছিল তখনও।

বসুদেব গুটি গুটি পায়ে দেবকীর কাছে এসে বসল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় নবজাতকের মুখখানা খুঁটিয়ে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল: ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাতে এসেছে আমাদের দুঃখরাতের রাজা। এই রাতের মতই ওর গায়ের রঙ। বিশ্বভুবনও আজ কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে। সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্ধ্বে, অধোদেশে সর্বত্রই এই ঘোর অন্ধকার। তাই ওর নাম রাখলাম কৃষ্ণ।

দেবকী কথা বলতে পারল না। আপন দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে তার চিত্ত বিগলিত হল। কান্না পেল। দু'চোখ ভরে জল নামল। বসুদেবের হাতটা টেনে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে চেপে ধরল দেবকী। কান্না জড়ানো গলায় বলল: স্বামী আর'ত পারি না, বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। সন্তানের জীবনের বিনিময়ে এই-ভাবে বাঁচার মতন লজ্জা, অগৌরব আর কিছু নেই। এইভাবে তিল তিল করে মরার চেয়ে, একবারে মরা অনেক ভাল। এঁকে বাঁচা বলে? এরকম বেঁচে লাভ কি? বল? সাতটি সন্তান হল। কারো মুখে মা-ডাক শুনলাম না। এর চেয়ে ব্যর্থ জীবন আর হয়? অথচ ঐ একটি ডাক শোনার জন্যে কী ব্যাকুল হয়ে আছে আমার হৃদয়। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হল না কোনদিন। ঈশ্বরের কানে আমার মনের ডাকটা পৌঁছল না। এমন অভিশপ্ত জীবন আমার। চোখের সামনে পাষাণ দেয়ালে আছড়ে নরঘাতক কংস নির্দয়ভাবে আমার শিশুপুত্রদের হত্যা করেছে, আর মা হয়ে সেই দৃশ্য আমি দেখেছি প্রতিবার। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আমার কি আছে? কেঁদে কেঁদে তবু এ চোখ দুটো অন্ধ হয় না, হৃদয় পাষাণ হয় না, কান বধির হয়ে যায় না। ঈশ্বর আমাকে আরো শাস্তি দিতে চান। দুর্যোগময় প্রকৃতির মত আমারও সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙেছে। আমি আর পারছি না। তোমার কৃষ্ণ বরণ কৃষ্ণকে দেখে বুকে আমার মমতার পাহাড় গলতে সুরু করেছে

প্রাণে আমার এ কোন নির্ঝর নামল স্বামী! আমি এখন কী করব? কোথায় লুকোব?

বসুদেব তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ধরা গলায় বলল: কেন এসব বলছ? বলে কি লাভ? শুধু শুধু দুঃখ পাওয়া। নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখ। তাঁর কাজ তিনিই করবেন। তোমার আমার ভেতর দিয়ে তাঁর কাজ ঠিকই করে নেবেন। আমরা নিমিত্ত।

দেবকী বসুদেবের হাত দুটো ধরে কান্নায় ভাঙা ভাঙা আর অস্পষ্ট গলায় বলল: আমার ছেলে—আমার নয়নমণি কৃষ্ণকে যে ওরা হত্যা করবে—

বসুদেবের মুখের উপর বহু দূর দিগন্ত থেকে বিদ্যুতের এক ঝলক আলো এসে পড়ল। এক অপার্থিব আলোয় ভেসে গেল কারাকক্ষ। দীপশিখার মত কেঁপে উঠল দেবকী। বসুদেব ফিস ফিস করে বলল: দেবকী ওরা কেউ আমার আঁধার রাতের রাজাকে হত্যা করতে পারবে না। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবে।

খুট্ করে একটা শব্দ হল। অমনি দেবকীর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে আঁচল দিয়ে আড়াল করল।

কালো বস্ত্রাবৃত একটি মানুষ এসে দাঁড়াল বসুদেবের সামনে। ফিস ফিস করে বলল: বসুদেব সব প্রস্তুত। একমুহূর্ত আর দেরী নয়। এই সুযোগের ভেতরে আমরা বেড়িয়ে পড়ব। পুত্রকে কোলে তুলে নাও।

দেবকী ওদের কথা শুনতে পেল। মৃদু হাসির আভাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার শীর্ণ, কৃশ, মুখখানা। এক গভীর প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। অস্ফুটস্বরে বলল: স্বামী নিয়ে যাও। যেখানেই থাকুক, জানব, আমার কৃষ্ণ বেঁচে আছে। সেই আমার সুখ, আমার আনন্দ।

কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে দেবকী প্রাণভরে আদর করল, মুখ ভরে চুমু দিল, গায়ের ঘ্রাণ নিল। তারপর কাপড়ে জড়িয়ে বসুদেবের হাতে যত্নে তুলে দিল। পুত্রের দিকে সজল চোখে চেয়ে বলল: দুর্যোগের

রাতে যখন এসেছ বাবা, দুর্যোগকে তখন ভয় পেলে'ত চলবে না। এখন দুর্যোগ, দুর্ভোগ ঘরে-বাইরে। একাই তোমায় নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। আশীর্বাদ করি সব দুর্যোগকে মাথায় বহন করার শক্তি হোক তোমার। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

সেই ঝড়-জলের ভেতর বসুদেব সদ্যজাত পুত্রকে বুকে নিয়ে ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশময় আঁকাবাঁকা পথের মত সরু সরু রেখা টেনে বসুদেবকে পথ দেখাল।

স্বস্তির শ্বাস পড়ল দেবকীর। নিজের শয্যায় এসে টান টান হয়ে শুল। শুয়ে শুয়ে মনে হল ; বসুদেব কৃষ্ণকে নিয়ে কোথায় গেল, তাকে কোথায় রাখবে, কিংবা সে কারাগারে আর ফিরে আসবে কিনা, এসব কিছুই জিগ্যেস করা হল না। কেমন যেন আচমকা সব ঘটে গেল। কার অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে কে বা কারা এত বড় একটা দুঃসাহসী কাজ করল, ভেবে পেল না দেবকী।

ভাবতে গিয়ে দেবকীর চোখে ঘুম নামল। বড় শান্তিতে ও আরামে ঘুমল। কিন্তু জননীর নিজস্ব উদ্বেগ, দুর্ভাবনাগুলো ঘুমের মধ্যে তার স্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। স্বপ্নের মধ্যে দেখল শালগ্রাম শিলার সামনে উপুর হয়ে পড়ে সে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে ঃ ভগবান তুমি আমার সন্তানকে রক্ষা কর। ত্রাণ কর তাকে দুষ্কৃতের নৃশংসতা থেকে। তুমি ছাড়া কেউ নেই তার।

উৎকণ্ঠা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হল দেবকী। নিবিড় একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। সহসা দেখল শালগ্রাম শিলার চারদিকে জ্যোতি বেরোচ্ছে, আর সেখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করে যেন অভয় দিচ্ছেন। আলোড়িত হয়ে উঠল তার চেতনা।

ঘুমের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনতে পেল বিষ্ণু বলছে ; দেবকী, আমি এসেছি। তোমার কি গত জন্মের কথা স্মরণ হয় ? পূর্বজন্মে তুমি সুতপা আর বসুদেব পৃশ্নিরূপে আমাকে সন্তানরূপে প্রার্থনা করেছিলে। তোমাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ করতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম তোমার

কোলে। তারপরে আরো একবার তোমাদের পুত্র হয়ে আসি, তখন বসুদেব ছিল কশ্যপ, তুমি অদিতি আর বামনরূপধারী আমার নাম ছিল উপেন্দ্র। এই তৃতীয়বার তোমরা আমাকে আবার পুত্ররূপে লাভ করলে। তোমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে, তোমার উদ্বেগ, দুর্ভাবনা দূর করতে আমায় এই রূপ তোমাকে দেখালাম। তোমার কোন ভয় নেই জননী। আর কিছু তোমাকে হারাতে হবে না। এখন থেকে তোমার পাওয়ার ঘর ভরে উঠবে। তোমার সব দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার ইতি ঘটবে। তুমি রাজমাতা হবে, তুমি নররূপী নারায়ণের জননীরূপে পূজিত হবে।

বিষ্ণুমূর্তি অন্তর্হিত হল।

দেবকী ঘুমের ভেতর সদ্যজাত শিশুপুত্র শ্যামসুন্দরকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধরার জন্য দুটি ব্যাকুল হাত বাড়াল। অমনি ঘুম ভেঙে গেল। চমকে চেয়ে দেখল দেবতা কোথাও নেই।

মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে কারাকক্ষের এক কোণে। আর তার খুব কাছে ভিজে কাপড় গায়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসুদেব অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মনে হল, ভীষণ সুখে নিদ্রা যাচ্ছে।

বাইরে ঝড়, জল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেমে গেছে। কালো মেঘ সরে গেছে। নীল আকাশে নিশা শেষের দু'একটি তারা ফুটে আছে।

বসুদেবের বুকের কাছে কাপড়ের পুঁটলিটা নড়ে উঠল। একটি শিশু হাত পা ছুঁড়ে খেলছে। দেবকীর বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। হৃৎপিণ্ডের ধুক পুক, ধুক পুক শব্দটা তীব্র উৎকণ্ঠায় গতিময় হল। পাথর হয়ে চেয়ে রইল দেবকী সেই দিকে!

এক বিপুল সুখের আবেশে আচ্ছন্ন দ্বৈপায়নের চেতনার ভেতরে এক অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছিল ছোট্ট, অসাধারণ, মহাপ্রাণ এক বালক। সে দীন, দুঃখী, দুর্গত, আর্ত মানুষকে মুক্ত করতে, শরণাগতকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হল দেবকীর জঠরে। কিন্তু কারাগারের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে, দেবকীর ক্ষুদ্র ক্রোড়ে তাকে ধরে না বলে,

জন্মেই নিজের মুক্তির পথ নিজে করে নিল। এর চেয়ে বিস্ময় কি আছে!

দ্বৈপায়ন মনের চোখ দিয়ে দেখতে লাগল বালক কৃষ্ণের জ্যোতির্ময় রূপ। তার চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিনী, চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, কণ্ঠে গুঞ্জরমালা; পরিধানে পীতবসন। সেই নবঘন নীলমণি কৃষ্ণ গোকুলের আশার আলো, তাদের নিরুপায়, নিঃসহায় জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এই বিশ্বাস কৃষ্ণের আবির্ভাবে তৈরী হল। হবেই-বা না কেন? যে শিশু কংসের কারাগারের প্রহরীদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে, বাঁধা পেরিয়ে অনায়াসে বাইরে বেরোতে পারল, ভয়াবহ দুর্যোগ অবলীলায় অতিক্রম করল, ঝড়, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, প্লাবন তুচ্ছ করে নিপীড়িত মানুষকে মুক্ত ও শরণাগতকে রক্ষা করতে গোকুলে অবতীর্ণ হল; সে শিশু কখনও সাধারণ মানব নয়। ঈশ্বরের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে ঈশ্বরপ্রদত্ত বিপুল শক্তি নিয়ে যে জন্মগ্রহণ করেছে তাতে আর কারো সন্দেহ রইল না। বিস্ময়ের কথা, তার সব কার্যকলাপই ছিল অদ্ভুত, অসাধারণ, অলৌকিক।

সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে অদ্ভুত গল্প তৈরী হল। তুচ্ছ এবং অতি সামান্য ঘটনার উপর ঈশ্বর বিশ্বাসের আলো পড়ে কৃষ্ণ লোকচক্ষে অনেক বড় হয়ে উঠল। তার চারপাশের মানুষজনেরও জীবন আশায়, বিশ্বাসে, সাহসে উদ্ভাসিত হল। হীনমন্যতার গ্লানি, নির্বীর্যের কলংক-কালিমা, দুর্বলতা হঠাৎ কেটে গিয়ে তাদের সবাকার সামনে বড় হবার এক অপূর্ব সুযোগ এল। ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানো, দেশের জন্যে, জাতির জন্যে, পরিবারের জন্যে, নিজের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে মহান সাহসে বড় হওয়ার এক পরিবেশ তৈরী হল কৃষ্ণের আবির্ভাবে এবং তার নিবিড় সান্নিধ্যে। আগে যা হল না, তার জন্মের পর কেমন করে সেই অসম্ভব সম্ভব হল—এই বিস্ময়টা লোককে তার দিকে আকর্ষণ করল।

দ্বৈপায়ন লিখছিল না, ধ্যান করছিল পরিত্রাণপরায়ণ কৃষ্ণের সেই

পরমপুরুষ মানবরূপ। অন্তর্দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল তাঁর কার্যকলাপ। মনে মনে নিরুচ্চারে প্রার্থনা করল : হে কৃষ্ণ, তোমাকে যত দেখছি, যত জানছি তত বিস্মিত হচ্ছি। তুমি বুদ্ধির অতীত। তুমি প্রকৃতিতে পুরুষরূপে সূক্ষ্মভাবে বিদিত। তুমি আনন্দস্বরূপ। ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টির মধ্যে তুমি প্রবিষ্ট বলে প্রতীত, যদিও তুমিও প্রবিষ্ট নও। কারণরূপে যার মধ্যে তুমি বিরাজমান, তার মধ্যে তোমার প্রবেশ অকল্পনীয়। অনুরূপ-ভাবে তুমি দেবকীর জঠরে সঞ্চারিত যদিও তুমি সঞ্চারিত নও। আসলে তুমি কংসের নৃশংস সৈন্যবাহিনী এবং অনুগত স্বার্থলিপ্স দুর্জনদের অত্যাচার থেকে তাদের রক্ষা করতে এসেছ। নররূপে সেই কাজ করে তুমি জানালে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তিনি প্রকৃতির মধ্যেও আছেন। তুমিও আধারে-আধেয়রূপে বিরাজমান, তুমি আধযের আধারস্বরূপ। তুমি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ব বস্তুতে নিহিত হয়েও ইন্দ্রাতীত, তুমি অনাবৃত, চিররহস্যময়, তুমি অপরূপ। তোমার সেই অলৌকিক রূপ আমাকে উদ্ঘাটন কর।

দ্বৈপাযনের সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। একা বসে সে কৃষ্ণের মুখচ্ছবি, তার অলৌকিক কার্যকলাপ কল্পনা করার প্রয়াস করল। মুদিত নেত্রে মনে মনে প্রার্থনা জানাল : হে কৃষ্ণ, তুমি প্রসন্ন হও। প্রতিদিন যে অগণিত মানুষ মুক্তির জন্যে তোমার মুখ চেয়ে বসেছিল, যারা তোমাকে ছাড়া কিছু জানত না, তোমার কাছেই যাদের প্রার্থনা ছিল অনন্ত, তাদের আত্মবিশ্বাস ফেরাতে, এবং স্বৈরাচারী শাসকের সঙ্গে সংঘাতে বিজয়কে পরিপূর্ণ এবং নিশ্চিত করতে মনের বেশিভাগ শক্তি ও সময় তুমি যেভাবে কাজে লাগালে সেই পরিত্রাণপরায়ণ পরমপুরুষ মানবরূপ ধ্যান করার শক্তি আমাকে দাও।

দ্বৈপায়ন নিজেই চমকে উঠল। বুকের ভেতর দপ্ করে একটা স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল। কারণ, অনেক ঘটনার শ্রোতা ও দ্রষ্টা সে।

মথুরার অভ্যন্তরে যে বিক্ষোভ বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল তাকে কণ্ঠরুদ্ধ করতে নব নব নির্যাতন ভোগ করতে হল মথুরাবাসীকে। অবশেষে, মৃত্যুভয়ে ভীত ও ত্রস্ত কংস জীবন ও সিংহাসন নিরাপদ

করতে প্রত্যেক নাগরিকের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্যে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সুরু করল। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও গণপ্রতিরোধের সমাধি দিতে আগামী প্রজন্মকে নিশ্চিহ্ন করা ছিল তার লক্ষ্য। সেজন্য মথুরার শিশু-হত্যা চলল অবাধে এবং নির্বিচারে।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নায়িকা একজন অনার্য-রমণী। কংসের প্রণয়প্রার্থিনী—নাম পুতনা। প্রণয়-পিপাসায় উন্মাদ হয়ে পুতনা কংসের মনোরঞ্জনার্থে স্বেচ্ছায় শিশুহত্যার মত একটি জঘন্য কাজ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হল না। কংসের হৃদয় জয় করার এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু জানা ছিল না তার। পুতনার নিষ্ঠুরতায় ঘরে ঘরে কান্নার হাহাকার পড়ে গেল। দুরাচারী কংস এবং তার সহযোগিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় মথুরা-বাসী গভীর বনে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু পুতনার শ্যেন দৃষ্টি তাদের তাড়া করে ফিরল।

বাঁচার তাগিদে, মথুরার অন্য পাড়ে পাহাড়-ঘেরা বনভূমিতে আশ্রয়-চ্যুত, নির্যাতিত মানুষদের এক বসতি গড়ে উঠল। যদুকুল পুরোহিত আচার্য গর্গের নেতৃত্বে এক দুর্ভেদ্য সংগঠিত প্রতিরোধ গড়ে উঠল। একদিন অন্যান্য নির্যাচিত যাদবদের মত নন্দও পরিবার-পরিজন সহ গোকুলে আশ্রয় নিল।

গোকুল হল কৃষ্ণের শৈশবের লীলাভূমি। কৃষ্ণের আবির্ভাবে গোকুলের জীবনধারা বদলে গেল। সহসা কোথা হতে দীপ্ত প্রাণের উল্লাসে প্লাবিত হল গোকুল। প্রত্যেকের প্রাণে ঈশ্বরের উজ্জ্বল উপস্থিতির এক অনুভূতি। কৃষ্ণের মধ্যে তারা ঈশ্বরকে দেখল। ঈশ্বর কৃষ্ণকে যেন অন্য এক মানবশিশু করে গড়েছে। তাই, তার সবকিছুতে একটা অসাধারণের ছাপ। আচার্য গর্গ মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কৃষ্ণ মানুষ নয়, নররূপী বিষ্ণু। তাদের পরিত্রাতা। এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সব প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করে কংসের রুদ্ধ কারাগার থেকে যে গোকুলে সশরীরে হাজির হল, সে'ত আর সাধারণ মানবশিশু হতে পারে না। শিশু-কৃষ্ণের হাতে পুতনার অস্বাভাবিক

মৃত্যুবরণ তাদের প্রত্যয়কে শুধু দৃঢ় করল। পুতনার মৃত্যুটা তারা ভুলল না। ভুলবে কেমন করে? পুতনাকে বধ করে কৃষ্ণ মথুরার মানুষের যে উপকার করল সেত কথা দিয়ে বোঝানোর নয়। শিশু-কৃষ্ণের প্রতি তাদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে রইল।

পুতনা হত্যার ব্যাপারটা মথুরার মানুষের মুখে মুখে বলার মত একটা গল্প হয়ে উঠল। কত গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তবে অন্যজনের কুট অভিসন্ধি এবং দুষ্ট অভিপ্রায়কে বোঝা যায়। সে এক কঠিন উপলব্ধি। খুব কম সুচতুর বয়স্ক ব্যক্তি তা অনুমান করতে পারে। বয়স্করা সহজে যা পারে না, শিশু-কৃষ্ণ অনায়াসে তা বুঝল কেমন করে? এই বিষয়টা তাদের চিন্তায় ভাবনায় লেগে রইল। কৃষ্ণ শিশু বয়সে এই বিচক্ষণতা পেল কোথায়? কে দিল তাকে এই দৃষ্টি? কোন্ মন্ত্র-বলে সে পুতনার মনোভাব বুঝল?

স্বভাবত শিশুরা খুব সাবধানী। চেনা মানুষ ছাড়া অচেনাদের তারা পছন্দ করে না। অপরিচিতদের এড়িয়ে চলে। জোর করে কিছু করতে গেলে চিৎকার করে কেঁদে আপত্তি জানায়। কিন্তু শিশু-কৃষ্ণ ব্যতিক্রম। অচেনা পুতনার কোল বিচার করল না। ভয়ে কাঁদল না। বরং হাসিমুখেই তার কোলে চড়ে বসল। খিল খিল করে হাসল কত। একটুও ভয় পেল না কৃষ্ণ। পুতনার মতলবটা যে টের পেয়েছে, বুঝতে দিল না শিশু। নির্বিকারভাবে পুতনার আদর খেতে লাগল। নির্ভয়ে তার কোলে খেলা করতে লাগল। সুযোগ বুঝে পুতনা তার বিষের প্রলেপ-মাখানো স্তন-বৃন্ত কৃষ্ণের মুখে দেয়ার চেষ্টা করল। কৃষ্ণও ক্রীড়াচ্ছলে তারস্তন-বৃন্ত নিয়ে খেলা করতে লাগল। পুতনা থেকে থেকে তাকে স্তন দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু কৃষ্ণ প্রতিবারেই হাসতে হাসতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর মুখে এক ধরনের খুশি ও আনন্দের শব্দ করতে লাগল, যা শুধু শিশুরাই করতে পারে।

পুতনা কেমন যেন হয়ে গেল। শিশুর আদর তার ভাল লাগল। বুকের ভেতর কি যেন গলে গলে পড়তে লাগল। অনেককাল পর

তার উষর বুকে বর্ষা নামল। কৃষ্ণ পুতনাকে আদর করতে করতে তার বিষ-মাখা দুটি হাত পুতনার মুখে পুড়ে দিল। আর পুতনাও বাৎসল্যের বশে বিস্মৃত হয়ে দুটি হাত লেহন করল। অমনি এক তীব্র বিষজ্বালায় ছটফট করতে করতে তার জীবনাবসান হল। পুতনার এই অদ্ভুত এবং আকস্মিক মৃত্যুটা সকলের মনে দাগ কেটে গেল। তাদের বিশ্বাস হল কৃষ্ণ মানুষ নয়. ঈশ্বর। কোন মানব-শিশুর পক্ষে এ কার্য সম্ভব নয়। কিন্তু শিশু-কৃষ্ণ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করল অলৌকিকভাবে।

পুতনা-বধে শিশু-কৃষ্ণের অসীম বুদ্ধিবল, সাহস, কৌশল, বিচক্ষণতা, সময় নির্বাচনের নিপুণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেল। কখন, কি উপায়ে শত্রুকে আঘাত করলে সুনিশ্চিত পতন হয় তার সম্যক জ্ঞান ঐ বয়সে শিশু-কৃষ্ণের ছিল। এ কোন শেখা বিদ্যা নয়, তার নিজস্ব প্রজ্ঞা। শিশুর আত্মরক্ষার এ জ্ঞান কে দিল? সেটাই হল বিস্ময়। এ ক্ষমতা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো থাকে না। শিশু-কৃষ্ণ নিশ্চয়ই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের নররূপ। কৃষ্ণই ভগবান। পুতনাকে বধ করে শিশু-কৃষ্ণ নিজেকে শুধু রক্ষা করল না, গোটা মথুরাকে জানিয়ে দিল তাদের পরিত্রাতা হয়ে এসেছে। পুতনাকে বধ করে সে মথুরার আগামী প্রজন্মকে বাঁচাল। নিপীড়িত, অসহায় মানুষের মহামুক্তি সূচনা করল।

কৃষ্ণের সব কার্যেই একটা অসাধারণত্ব আছে। এক একটা কাণ্ড ঘটে আর কৃষ্ণ অসাধারণ হয়ে উঠে। সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে এরকম অনেক ঘটনা ও কাহিনী দ্বৈপায়নের মনে পড়ল। সেগুলি নিছক গল্প নয়, সত্য। মানুষের অন্তরের কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের নিজ নিজ ঈশ্বর অনুরক্তি। তখন কৃষ্ণে আর ঈশ্বরে তফাৎ থাকে না। কৃষ্ণই ভগবান হয়ে যায়।

পুতনার মৃত্যুতে কংসের মনোবল ভেঙে পড়ল। তবু তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সাহস হল না। ছোট্ট একটা শিশুর কাণ্ডকারখানা দেখে-শুনে সে মনে মনে ভীত হল। কিসের একটা ভয় যেন তাকে কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল। যে শিশু নিজেকে রক্ষা করার কৌশল জানে, এ বিশ্বভুবনে তার অনিষ্ট করবে কে? কৃষ্ণকে নিয়ে তাই তার

দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সর্বদা মনে হয়, সে তার পথের কণ্টক। তার নিয়তি। কবে ধ্বংস হবে?

চুপ করে থাকল না কংস। মথুরার ভগবানকে অন্য উপায়ে হত্যা করার এক ফন্দী আঁটল। কৃষ্ণের উপর নজর রাখার জন্যে চর নিয়োগ হল।

একদিন সুযোগও হল।

আঙিনায় বসে আপন মনে কৃষ্ণ খেলছিল একা। তার চার-পাশে কেউ ছিল না। আততায়ী সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে চটপট একটি গো-শকটে দুটি বলদ জুড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। কেউ বুঝবার আগেই গা ঢাকা দিল তারা। আর চালকহীন শকটটি ঢাল পথে হুড়মুড়িয়ে একেবারে কৃষ্ণের উপর এসে পড়ল। ক্ষিপ্র হস্তে কৃষ্ণ একটি লৌহচক্রের খেলনা নিয়ে সজোরে শকটের দিকে ছুঁড়ল অমনি বলদ দুটি সভয়ে গতি সংবরণ করতে গিয়ে শকটসহ উল্টে পড়ল। প্রত্যুৎপন্নমতি, সাহস, বুদ্ধিবলের জন্যে কৃষ্ণ সে যাত্রা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল।

কংসের আত্মবিশ্বাসের দেয়াল ফেটে চৌচির হল। মানুষের ক্ষমতায় যে মৃত্যু এড়ানো অসম্ভব, কৃষ্ণ শিশু হয়ে তাকে জয় করল কেমন করে? এই জিজ্ঞাসাটা কংসের অন্তরে ভারী বস্তুর মত ঝুলে রইল।

এর কিছুকাল পরে আরো একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। আকাশ আঁধার করে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড় উদ্দাম বেগে তেড়ে এল। মুহূর্তে চতুর্দিক লণ্ডভণ্ড করে ফেলল। ধূলোয় আকাশ ভরে গেল। পাক খেতে খেতে ঘূর্ণিঝড় খড়-কুটো নিয়ে কৃষ্ণের দিকে ধেয়ে গেল। এক ঝাপ্টায় কৃষ্ণকে বাজপাখীর মত ছোঁ দিয়ে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলল। যারা সে দৃশ্য দেখেছিল, হায় হায় করে উঠল তাদের অন্তর। কিন্তু আশ্চর্য. ঝড় তাকে পাশের গাঁয়ে একটি খড়ের গাদায় এনে ফেলল। কৃষ্ণের কিছুই হল না। ঘটনাটা এত অতর্কিতে ঘটল এবং কৃষ্ণ যেভাবে রক্ষা পেল তাতে কংসের ধারণা হল কৃষ্ণ স্বয়ং

ঈশ্বর। ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে সে এক যাদু সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এসব করে কৃষ্ণের কি লাভ? কৃষ্ণ তার কাছে কি চায়? একটা ছোট্ট বালককে তার প্রবল প্রতিপক্ষ ভাবতে খুবই খারাপ লাগল। আবার না ভেবে উপায় ছিল না। কৃষ্ণ এখন বাস্তব সত্য। কংস তাই নিজেকে প্রশ্ন করল: ভগবানের সঙ্গে লড়াই করে কবে কোন মানুষ জিতেছে? জেতার চেয়ে বড় কথা, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ-লড়াই ক'জন মানুষের ভাগ্যে হয়? তার মত ভাগ্যবান ক'জন আছে?

নররূপী ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তার জয় অনিশ্চিত। তাই সংগ্রামের পথ পরিহার করে কৃষ্ণকে অন্য উপায়ে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করল। এই হত্যা-চক্রান্ত ব্যর্থ হলে প্রমাণ হবে কৃষ্ণই ঈশ্বর।

বাছাই করা মল্লযোদ্ধা, সাহসী এবং কৌশলী অসুর দানবদের সুশিক্ষিত করে কংস গোকুলে এবং বৃন্দাবনে পাঠাল। কৃষ্ণ এখন শিশু কিংবা বালক নয়, কিশোর। বকাসুর, অঘাসুর, ধেনুকাসুর, কালীয় নাগ কৃষ্ণকে বন্দী করার জাল পাতল। কিন্তু তারা নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই মরল। কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরল না। কংস ভীত হল। তার মনোবল ভেঙে পড়ল। কৃষ্ণ যে সত্যিই ভগবান তাতে আর কোন সংশয় রইল না তার। হোক ভগবান, তবু তার কাছে নতি স্বীকার করতে পারবে না। মানুষও ভগবানের চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়, হীন নয়। মানুষের মহিমা এবং গরিমা নিয়ে মায়াবী ঈশ্বরের সঙ্গে প্রয়োজনে সে একা লড়বে।

তবু কংসের সংশয় কাটল না। নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্যে বলল: ভগবান বলে সত্যি কিছু নেই। তবু মানুষ কৃষ্ণকে ভগবান ভগবান করে। কেন? কি জন্যে? কি লাভ হয় তাতে?

কংসকে বোঝাতে অক্রূর কিন্তু অন্য কথা বলল: মানুষ একটা অবলম্বন চায়। ভগবান তার সেই অবলম্বন। ভগবানকে চোখে দেখা যায় না, তাঁকে স্পর্শ করা যায় না, তিনি শুধু কল্পনার। তবু তার নাম স্মরণ করলে মনে জোর ফিরে আসে, আত্মবিশ্বাস জন্মে। কৃষ্ণ

প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব। তার সাথে কথা বললে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তার সান্নিধ্যে এক অনাস্বাদিত আনন্দ পায়। ফুরিয়ে যাওয়া জীবন নবীকৃত হয়। আর কোন শিশুর বেলায় তা হয় না। তাই কৃষ্ণ তাদের দুর্দিনের অবলম্বন। একমাত্র বন্ধু।

তোমার কথা ঠিক বুঝলাম না অক্রূর। তুমিও শেষে কৃষ্ণভক্ত হলে।

মহারাজ, ভক্ত হওয়া যায় না, ভক্ত হয়ে যায়। আপনিও তার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণ কোথায় কি করছে তার কথা শুনতে আপনি কি কম ব্যগ্র! বিড় বিড় করে কৃষ্ণ নামও সর্বদা জপ করেন।

অক্রূর, তুমি ভুল বকছ। তার কথা শুনলে রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলে।

এটাই'ত বিপদের কথা। আপনাকে সে কথাটা কিছুতে বোঝাতে পারছি না। আপনার ক্রোধ যত ভয়ংকর হবে ততই অত্যাচারিত মানুষ সংহত হবে। ঐক্যবদ্ধ হবে। অত্যাচার ও নির্যাতনই মানুষের পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক। মনে রাখবেন আপনার ক্রোধের যজ্ঞাহুতি থেকে কৃষ্ণের উদ্ভব হয়েছে।

অক্রূর তোমার মাথাটা সত্যি খারাপ হয়েছে।

মহারাজ, রাজনৈতিক অবিচার, অত্যাচার যখন দুর্বিষহ হয় তখন কুপিত সমাজ ও দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হয়। উৎপীড়িত মানুষের শৃংখলমুক্তির জন্যে এক ঐশীশক্তির উন্মেষ হয়। মানুষের দুর্জয় সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা, বুদ্ধিবল, এবং আত্মবিশ্বাসের মধ্যে লুকনো থাকে সে শক্তি। যেদিন আত্মিকশক্তির এই উদ্বোধন হয়, সেদিনই তাদের পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটে। যুগে যুগে আমরা এই আবির্ভাব দেখেছি। কৃষ্ণ সেই যুগদেবতা। কালের গর্ভে তার জন্ম। কাল সবাইকে আকর্ষণ করে। কৃষ্ণ সময়ের স্রোতে ভেসে আসা একটি নীলপদ্ম, তাই তার আকর্ষণ দুর্নিবার। কারো সাধ্য নেই নিজেকে দূরে রাখার। সবাইকে পতঙ্গবৎ ঝাঁপ দিতে হবে।

অক্রূরের কথা শুনে কংস গম্ভীর হয়ে গেল। মুখখানা ছাইর মত সাদা হয়ে গেল।

দ্বৈপায়নের লেখনী থেমে গেল। কেমন একটা উদাস অন্যমনস্কতায় সে স্থির হয়ে বসে রইল। তার চোখদুটি পাতা রইল বিশ্বজগতের দিকে। নিজের অজান্তে মন ভেসে গেল দূরে। এক সুদূর অতীতকে সে দেখতে পাচ্ছিল।

গোধন নিয়ে কৃষ্ণ আগে আগে বাঁশী বাজিয়ে চলল বৃন্দাবনের পথে। বাঁশির সুর যেন ডেকে বলছিল, ওগো মথুরাবাসী, মনের কারাগারের গরাদ ভেঙে বেরিয়ে এস। কংসের রাজ্যে আমরা কেউ বেঁচে নেই। পাথর চাপা কুনো ব্যাঙের মত অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে আছি। দেহ মন আত্মা পাষাণভারে পিষ্ট হচ্ছে। তবু একেই সয়ে বেঁচে থাকা বলছি। এই কী জীবন। একে কেউ বেঁচে থাকা বলে? বেঁচে, সয়ে, সরে থেকে বাঁচার মানেটা আমরা ভুলে গেছি। বেঁচে থাকার পরম জিনিস হল ভালবাসা, বিশ্বাস, সত্তার মর্যাদাবোধ। কিন্তু কোথায় গেল জীবনের সেই পরম সম্পদ? প্রাণের ভেতর তার দীপ্তি নিভে গেলে থাকে শুধু অন্ধকার। তোমরা এই অন্ধকারের ভেতর চেয়ে আছ গাছেরা, পাহাড়েরা যেমন চেয়ে থাকে। ওদের মতই তোমরা বেঁচে আছ। কিন্তু মানুষ'ত গাছ নয়। সে শুধু চিত্রাপিতের মত চেয়ে চেয়ে জীবন কাটাতে পারে না। মানুষের জীবনে আঘাত সংঘাত, আনন্দ-বেদনা, দুঃখ কষ্ট, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ থাকে যা শুধু মানুষেরই জানার কথা। মানুষের সে কথা যখন মানুষ বোঝে না তখন তার সঙ্গে বাস করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের সুন্দর জীবনটাকে অর্থহীন কর না। দীপ্ত প্রাণের হর্ষে তোমরা সব ফেলে বেরিয়ে এস। এস হাওয়ায় ভেসে। দু'হাতে তালি দিয়ে কংসকে চমকে দিয়ে মথুরার ধূলো উড়িয়ে কাঁকড়, বালি মাড়িয়ে তোমাদের অভ্যস্ত-জীবনের অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে এস। মিথ্যা জীবনের বাঁধন ছিঁড়ে চল আমরা ঝর্ণার মত উন্মত্ত উৎসারে, বাতাসের মত প্রমত্ত আবেগে ধেয়ে যাই অন্য জীবনের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। বাঁশীর সুরের মত খুশিতে ভরে উঠুক আমাদের খুশিহীন জীবন। নিয়ে-দিয়ে, দিয়ে-নিয়ে সকলকে সুধন্য

করে চলে যাওয়ার নাম জীবন।

এরকম একটা অদ্ভুত অনুভূতির পুলকিত শিহরনে দ্বৈপায়নের ভেতরটা কেঁপে গেল। বাস্তবে কোথাও বাঁশি বাজছিল না। তাহলে, মনের গহনে এ কোন বংশীধ্বনি শুনল সে? একি তার মনের অভ্যন্তরে কৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্ময়! তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। কিন্তু পাণ্ডবদের জয়-কাব্য লিখতে বসে কৃষ্ণভাবনা কেন আকুল করল তাকে? বুকের ভেতর কৃষ্ণ সম্পর্কে এ মুগ্ধতা কার সৃষ্টি? কৃষ্ণের প্রতি তার অনুভূতি এমন তীব্র হয়ে উঠল কিসের আকর্ষণে?

আকর্ষণটাও কৃষ্ণের নিজের তৈরী। তার চাওয়া-পাওয়ার জগৎ একটু অন্যরকম বলেই তাকে সকলের থেকে আলাদা করে দেখে সবাই। দেখবে বা না কেন? যে মানুষ নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, প্রত্যাশা করে না, ভুলেও কারোকে প্রত্যাঘাত করে না, অন্যের দুঃখ দুর্গতিকে নিজের করে নেয়, সব বন্ধনের ভেতর থেকেও যে বন্ধনের উর্ধ্বে উঠতে পারে, তাকে কি বলবে দ্বৈপায়ন? মানুষরূপী ঈশ্বর বলাই ভাল তাকে।

দ্বৈপায়নের সমস্ত অনুভূতির ভেতর স্পন্দিত হতে লাগল কৃষ্ণের দুষ্টুমি আর ছেলেমানুষী। এসবই পরবর্তীকালে তার শোনা গল্প। হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি এসে তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। খণ্ডিত কালের গণ্ডি থেকে মনটা প্রসারিত হয়ে গেল কৃষ্ণের শৈশব থেকে কৈশোরে এবং যৌবনে।

দ্বৈপায়নের মন থেমে ছিল না। কল্পনায় সুদূর অতীতের সেই শোনা কাহিনী নিজের মত করে চোখের আয়নায় দেখছিল। যেমন করে শিল্পী মনের মাধুরী মিশিয়ে তার ছবি আঁকে।

নবীন কৃষ্ণের নীল নবঘন আষাঢ় গগনের মত রূপের মাধুরী, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের মত গাত্রবরণ, মৃগের মত দীঘল কালো চোখ তাকে আবিষ্ট করে রাখল। কৃষ্ণ এখন দ্বৈপায়নের অনুভূতিতে বাস্তব সত্য। বিস্ময়ে আবেগ গাঢ় স্বরে নিজের কাছেই প্রশ্ন করল: কৃষ্ণ, তুমি কে? মনের চোখ দিয়ে তোমাকে যত দেখি, তত অবাক হই।

দেখায় নেশা ধরে যায়।

দ্বৈপায়নের স্থূল দেহটা পড়ে রইল তপোবনে, কিন্তু মন গেল বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গৃহে গৃহে গোপ-গোপীদের মন চুরি করে দিন দিন ক্ষীর, দধি, ননী, চুরিতে নিপুণ হয়ে উঠল কৃষ্ণ। চুরিতে কৃষ্ণের সাহস বেড়ে গেল। আড়ালে তাকে গালমন্দ করে, কিন্তু সামনাসামনি সমীহ করে। একদিন নিজের ঘরেই হাতে-নাতে ধরল যশোদা। আর যায় কোথায়? যশোদা'ত রেগে আগুন। দড়ি নিয়ে তেড়ে এল বাঁধতে। এই ছেলের জন্যে তার স্বস্তি নেই। ওর দৌরাত্ম্যে পাড়ার লোক পর্যন্ত অস্থির। নিত্য অভিযোগ লেগে আছে। কতদিন কত নিষেধ করেছে যশোদা, তবু কানে নেয়নি গোপাল। চুরির অভ্যাস কি সহজে বদলানো যায়? যশোদা যখন হাতে-নাতে ধরেছে তখন ভয়ংকর শাস্তি তার কপালের লিখন আজ।

যশোদা তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আর, কৃষ্ণ মায়ের মন গলানোর জন্যে দুষ্টু ছেলের মত চিৎকার করে বলল: মা-গো এত জোরে বাঁধলে লাগে আমার হাতে। আমার বুঝি কষ্ট হয় না? কি এমন দোষ করেছি যে শুধু শুধু বাঁধছ? বাড়ীতে সব ছেলেই অমন একটু আধটু করে থাকে।

রোহিণী যেতে যেতে বলল: ও ছেলেকে বেঁধ না বোন। ওর নরম হাতে সত্যি লাগছে। ছেড়ে দাও ওকে।

যশোদা রেগে গিয়ে বলল: আমাকে বাধা দিও না। ওর জন্যে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না।

রোহিণী যশোদার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসল। বলল: মিছে-মিছি ওকে বাঁধবার চেষ্টা করছ। ওকে বেঁধে রাখতে পারবে না। ও বাঁধা থাকে না। আগেও কতবার বাঁধাবাঁধি করেছ। পেরেছ কি? ওকে তুমি ছেড়ে দাও। ওর মত থাকতে দাও। পাড়া-পড়শী মুখে যাই বলুক, ওটা তাদের প্রাণের কথা নয়।

বৃষভানুর স্ত্রী কীর্তিকা সেই সময় এসেছিল নন্দের গৃহে। যশোদা তখন কৃষ্ণকে বাঁধতে হিমশিম হয়ে গেল। যশোদার কাণ্ড দেখে

হেসেই ফেলল। বলল: করছ কি দিদি? কি দোষ করল আমাদের গোপাল?

যশোদা ঝংকার দিয়ে বলল: আর পারি না এই ছেলে নিয়ে। লোকের গালমন্দ শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আজ একটা বিহিত করব।

হাসিহাসি মুখ করে কীর্তিকা বলল: লোকের কথা ছেড়ে দাও। ওরা রাগও করে আবার প্রাণভরে ভালবাসে। তুমি তাদের রাগটা দেখলে, ভালবাসাটা দেখলে না? ও এই বৃন্দাবনের নয়নমণি। আমাদের শুষ্ক নিরানন্দ মরুভূমির মত জীবনের একফালি মরুদ্যান। ওর যদি কোন দোষ থাকত তা-হলে এত ভালবাসা পেত না। এত'ত বালক আছে, কিন্তু ঐ একটি ছেলের জন্যে এত মায়া কেন? কোনদিন জানতে চেয়েছে ও কে? কেন ওর জন্যে এত প্রাণভরা আকুতি? কেন? সত্যি ও আমাদের কে? কে-গো? বলতে বলতে কীর্তিকার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

বলরাম মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। এবার যেন একটু সাহস পেয়ে একবার কৃষ্ণের দিকে একবার যশোদার দিকে তাকাল। তারপর বলল: মামীর কথাই ঠিক। কৃষ্ণ আমাদের প্রাণ। ওর মনের কথাটা কেউ বোঝে না। বুঝলে এত অশান্তি থাকত না। বৃন্দাবনের মানুষ যদি বুঝত তা-হলে কংসের এই অত্যাচার থেকে কবে মুক্তি পেতাম। আমরাও অনেক বড় হয়ে যেতে পারতাম আদর্শে এবং মনে।

যশোদার চোখদুটো যেন কৃষ্ণের মধ্যে কি খুঁজে বেড়াতে লাগল। আর কৃষ্ণ অবাক চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল জননীর মুখের দিকে। যশোদার কানে বাজছিল বলরামের কথাগুলো। কৃষ্ণকে তুমি যা ভাবছ ও তা নয়। ওর মত মায়া-দয়া খুব কম মানুষের হয়। সকলের জন্যে ওর মায়া, সকলের দুঃখে দুঃখ পায়, কেউ ওর পর নয়, সবাই ওর কাছে আপন। তাই সবাইর সুখ, আনন্দ ও' প্রাণভরে চায়। ওর চাওয়াটা এত আন্তরিক যে ওকে

শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। মামীর মত আমিও প্রশ্ন করি : ও কে? চারপাশের মানুষ থেকে ও' কেন এত আলাদা? মানুষের কাছে সত্যি ও' কি চায়?

সুদামা বলল : জান জননী, কৃষ্ণের মত মহাপ্রাণ বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। ওর এবং আমাদের মধ্যে বিরাট ফাঁক। কিন্তু ওই ফাঁকটুকু ওর ঔদার্যে, মহত্বে ভরে গেছে। ওর কাছে শিখলাম দেশের সম্পদের উপর সকলের সমান ভাগ। একজনের আছে বলে পাবে, অন্যজনের নেই বলে পাবে না—এই অসাম্য ঈশ্বরের রাজ্যে থাকবে কেন? কৃষ্ণ প্রতিবেশীর উদ্বৃত্ত দই, ক্ষীর, ননী শুধু কেন চাল, ডাল ও অভাবীদের বিলিয়ে দিয়ে বৃন্দাবনের মানুষকে শেখাল সকলের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হওয়ার আদর্শ। বঞ্চনা শুধু দুঃখ দেয়, ক্ষোভ বাড়ায়। কিন্তু ঈশ্বর'ত কোন ক্ষোভের অধিকার রাখেননি। প্রকৃতিতে কোন বৈষম্য নেই। সকলের সমান অধিকার সেখানে। তা-হলে সে অধিকার পাবে না কেন? নিজের অধিকারকে চিনতে হবে, মানুষকে বোঝাতে হবে। কৃষ্ণ আমাদের সেই কথাই শিখিয়েছে।

সুবল বলল : জননী, অধিকার যে ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না, এই বয়সেই আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। অধিকার অর্জন করতে হয়। যা আমার ন্যায্য পাওনা তা অন্যের অনুগ্রহ কিংবা কৃপার দান নয়। সে আমার অধিকার। সেটা যদি কেউ কেড়ে নেয় তা-হলে সে শত্রু।

যশোদা এমন অদ্ভুত কথা আগে শোনেনি। এ কোন হাওয়া এসে দেশের ছেলেগুলোর মন বদলে দিল? এরা রাতারাতি সব কেমন যেন হয়ে গেল! এদের বোধ-বুদ্ধি সব বয়স্ক মানুষের মতন। তাই ওদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল : তা-হলে, আমি তোদের শত্রু।

কৃষ্ণ কাঁদ কাঁদ গলায় বলল : আমার বাঁধন খুলে দাও মা। বড্ড লাগছে। আমি'ত তোমার খারাপ ছেলে। অবাধ্য, চোর। লোকের কাছে গালমন্দ শুনতে হয়। বেশ, আমি চলে যাব। তোমাদের

কাছে আর থাকব না। যেদিকে দু'চোখ চলে যায়, চলে যাব। তুমিও শান্তি পাবে।

যশোদা চমকে তাকাল কৃষ্ণের দিকে। বুকের ভেতরটা তার ছিঁড়ে যেতে লাগল। চোখ ভরে জল নামল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল: এত নিষ্ঠুর কথা বলতে তোর মুখে বাঁধল না। তুই বলতে পারলি? আমার কষ্টটা একবারও মনে হল না?

কেন হবে? আমাকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধতে তোমার'ত একটুও মনে হয়নি গোপালের কষ্ট হবে? রোদে দাঁড় করে রেখেছ, একবারও ভেবেছ—তার ক'ত কষ্ট হচ্ছে? ছোটবেলায় কত মায়ের ছেলে ননী মাখন খায়, কিন্তু তাদের মায়েরা কি ছেলেকে বেঁধে রাখে? সুদাম, সুবলকে জিগ্যেস করে দ্যাখ'ত কোনদিন কি ওদের মা শাস্তি দিয়েছে? আর তুমি—

কৃষ্ণকে যশোদা বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। চোখের জল বুকের উপর ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলল: অমন কথা বলতে নেই বাবা। এই আমি তোর বাঁধন খুলে দিলাম। আর কক্ষনো অমন কথা মুখে আনবি না। বল, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবি না? বল যাবি না?

কৃষ্ণ যশোদার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলধারা মুছিয়ে দিল। মায়ের গালে মুখ রেখে বলল: তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব মা? বুক-ভরা এমন সুধা আর কোথায় আছে? তুমি আমার ধাত্রী। তোমার ভেতর দিয়ে আমি ধরিত্রীকে দেখি।

যশোদা কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। চোখে পলক পড়ে না তার। বিভোর হয়ে কি যেন দেখছিল তার মুখে! যশোদাই জানে। কিন্তু লোকের মুখে তার এক আশ্চর্য গল্প তৈরী হল।

গোপালের মুখে যশোদা দেখল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র দৃশ্য—বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম সবকিছু। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, পর্বত, নদী-সাগর, দিগন্ত নীল, সবুজ বনানী, অন্তলীন আকাশ, পৃথিবী, ভূমণ্ডলস্থ প্রাণীকুল, আরো কত কি! যশোদার দেখার ভেতর কোন মিথ্যে ছিল না।

মাতৃস্নেহের প্রভাবে বিস্ময় ও ভগবৎঅনুভূতি একাকার হয়ে গিয়েছিল তার চোখে। বাৎসল্যরসে অনুরঞ্জিত হয়ে যশোদা আপন সন্তানের মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি এবং বিকাশকে দেখেছে। এর কারণ, গোপাল তার চোখে ভগবানরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ভগবান এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, ধারক, পালক, এবং সংহারী। যশোদা জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সর্বভূতে বিরাজমান সেই ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে আপন সন্তানের মধ্যে দেখল। অসীম স্নেহ-মমতার সূত্রে বিধৃত হয়ে প্রকাশ পেল তার অনুভূতি। গোপালের বিশ্বরূপ জননীর কল্পনা। অনন্ত বাৎসল্যের আবেগময় অভিব্যক্তি। কিন্তু এরকম অদ্ভুত অভিব্যক্তি ক'জন মায়ের হয়েছে? ক'টা মা সন্তানের মধ্যে বিশ্বের আকাশ, বাঁচার পৃথিবী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে পায়? অন্য মায়ের অন্তরে যে অনুভূতি কখন জাগল না, যশোদার অন্তরে সেই অদ্ভুত ইচ্ছে উদয় হল কেন? এ প্রশ্ন দ্বৈপায়ন হঠাৎ নিজেকে করল, আর নিজেই তার উত্তর দিল। কারণ, কৃষ্ণের ভেতর এমন একটা বড মাপের আশ্চর্য মানুষ ছিল, যাকে এই পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ধরে না। তাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তার সেই বিরাট আমির স্বরূপ খুঁজল যশোদা। যদুকুলগুরু গর্গাচার্য বলেন, যশোদার এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্বরূপ বলে। বিশ্বের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে না দেখলে, তার বিরাটত্বকে বিশালত্বকে ধরা যায় না।

এক আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে গেল দ্বৈপায়নের অন্তর। ভাল লাগার আবেগে দু'চোখের চাহনি নিবিড হয়ে উঠল। কৃষ্ণ তার চোখে ঈশ্বর-রূপে প্রতিভাত হল। মাটির পৃথিবীর কর্মশালায় এক অদৃশ্য কর্মকার তাকে সকলের থেকে আলাদা করে সৃষ্টি করল। সৃষ্টিছাড়া বলেই বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরিমাপ করা যায় না। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে অন্য এক জগতের মানুষ। তার পরিধি মাপতে জননী যশোদার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে দরকার হল। কারণ সন্তান তার সাধারণ নয়, পরমব্রহ্মের অংশ। দ্বৈপায়নেরও বিশ্বাস কৃষ্ণ ভগবান। দেরীতে হলেও তার ঈশ্বর দর্শন হল।

তপোবনে কুয়াশার মত সন্ধ্যা নামল ধীরে। বনস্থলী ক্রমে আঁধার হয়ে

এল। পাখীদের কলরব স্তব্ধ হল। পুব আকাশে ধ্রুবতারা উঠল আকাশ উজ্জ্বল করে। দ্বৈপায়ন হাত-পা প্রক্ষালন করে ধ্যানে বসল। কিন্তু কিছুতে মনসংযোগ করতে পারল না। চোখ বুজলে কৃষ্ণের মুখ দেখতে পায়। কৃষ্ণের নবদুর্বাদল শ্যামরূপ, সর্বাঙ্গে মণিমাণিক্যের আভরণ, গুঞ্জরমালা, পীত অংশুক বসন, শোভিত বরতনু, আজানু-লম্বিত হস্ত, আকর্ণ প্রসারিত মোহন আঁখি, অধরে স্নিগ্ধ হাসির দ্যুতি ধ্যান-চোখে দর্শন করে দ্বৈপায়ন প্রীত ও অভিভূত হল। জপ, তপ, মন্ত্র সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

কৃষ্ণচিন্তায় তার চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কংসের মত দুরাচারী ভয়ংকর রাজাও কৃষ্ণের মত একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় তরুণের ভয়ে ভীত। বিশাল রাজশক্তি যাকে সমীহ করে, সে কখনও সাধারণ নয়। বিবিধ প্রতিকূল শক্তিকে যে অলৌকিক উপায়ে কৃষ্ণ জয় করল তাতে কংসের বিশ্বাস জন্মাল কৃষ্ণ মানুষ নয়, ঈশ্বর। তার নিয়তি। তাই তার ব্যক্তিত্বের যাদুস্পর্শে মথুরা-বৃন্দাবনের মানুষ যেন সহস্র যৌবনশিখায় জ্বলে উঠল। তাদের শিরায়-উপশিরায় আত্মাহুতির দুর্মর আবেগ সঞ্চার করল কৃষ্ণ। সবাকার সামনে বড় হবার এক অপর্ব সুযোগ এনে দিল। মানে, সম্মানে, ঐশ্বর্যে, ক্ষমতায় বড় হওয়া নয়, ত্যাগে, দুঃখে, বেদনায়, বীর্যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোয়, দেশের ও দশের স্বার্থের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করে মহান সাহসে বড় হওয়ার এক আদর্শের আলো এসে পড়ল তাদের জীবনে। তাতে তারা বড় হয়ে গেল, উদ্দীপিত হল। কৃষ্ণের মোহন বাঁশীর সুরে সব দুর্বলতা, ভয়, জড়তা দূর হয়ে গেল। মথুরার মরা নদীতে জীবনের বান এল। আপন ক্ষুদ্র গৃহকোণে যে জীবন ছিল অবরুদ্ধ, কৃষ্ণের বাঁশীর সুর হঠাৎ তাকে বাইরে বের করে আনল। বাঁশীতে কৃষ্ণের আহ্বানের শক্তি ছিল। তাই কৃষ্ণের বাঁশী যখন বাজল তখন ঘর ছেড়ে সব বেরিয়ে এল। ভাববার সময় পেল না। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। উৎসাহের দীপ্তিকে, আনন্দের আবেগে তাদের ভিতর বাইরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে মোহন সুরের এমনি আকর্ষণ যে কোন বাধাকেই আর বাধা মনে

হল না।

মুক্তির হাওয়া লাগল মানুষের প্রাণে। সমস্ত জাতির জাগ্রত যৌবন মুক্তির জন্যে পাগল হল। গোপবালারাও দূরে সরে থাকল না। তারাও এল মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে। জীবনের দিগন্ত থেকে একটা চিরন্তন আহ্বানের মত। কৃষ্ণের বাঁশীর সুর তাদের ঘরে থাকতে দিল না। গোপপল্লী পেছনে ফেলে বনবীথি অতিক্রম করে কখনো ছায়ায় কখনো জোৎস্নায় ছুটতে ছুটতে গোপবালারা এল সেই যমুনার তীরে, কৃষ্ণের সেই প্রিয় কদম গাছের নিচে। যেখানে কৃষ্ণের বাঁশী, নূপুরের নিক্কণ আর জীবনযমুনার উত্তরোল প্রবাহ।

কৃষ্ণ যাবে মথুরায় কংসের ধনুর্ভঙ্গ যজ্ঞোৎসবে যোগ দিতে। তাই তাকে ঘিরে চলল বৃন্দাবনের নৃত্যোৎসব। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী সবাই এল নির্মল প্রণয়ের দীপ জ্বালিয়ে। বিশ্বাসে নির্ভর হয়ে তারা এল কৃষ্ণকে নন্দিত করতে। প্রাণভরা প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে। একমাত্র প্রেম দিতে পারে মানুষকে আত্মপ্রত্যয়, বিশ্বাস, নির্ভরতা, শক্তি।

গোপবালারা কৃষ্ণের চারপাশে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়াল। তাদের প্রত্যেকের অধরে টেপা হাসি। চোখে বিদ্যুৎদীপ্তি। কি সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি চোখে তাকিয়ে আছে তারা। কৃষ্ণও কেমন উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। সহসা কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে সমুদ্র কল্লোলিত হল। সুরের আবেশে কৃষ্ণের দুই চোখ বুজে গেল। স্বপ্নের ঘুম নামল যেন চোখে। অমনি শুরু হয়ে গেল বীর বরণের উৎসব। জয়ধ্বনি উঠল দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে। সে জয়ধ্বনি মন্ত্রধ্বনির মত বুকের ভিতর কল্লোলিত হল। মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে এক অনাবিল আনন্দে মেতে উঠল। মেয়ে-পুরুষের ভেদ থাকল না। আনন্দ সাগরে সব ভেসে গেল। কৃষ্ণের কাছে তাদের নিবেদন করায় এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল আনন্দ উল্লাসের মত্ততায়। কৃষ্ণের বুকের ভেতর উথাল-পাথাল ভাব। বেদী থেকে নেমে এসে মিলে গেল জনারণ্যে।

সমুদ্র দোলায় দুলতে লাগল নৃত্যস্থলী। নারী-পুরুষের মাঝখানে বহুকালের দেয়ালটা ভেঙে ফেলল তারা। সব অবরোধ ঠেলে বেরিয়ে এল মুক্ত জীবন। মুক্ত প্রেমের আশীর্বাদ কৃষ্ণের উপর দেবতার অকৃপণ দানের মত বর্ষিত হল। কৃষ্ণ সর্বান্তকরণে যা চেয়েছিল সেই প্রাণভরা মুক্তির উল্লাস আর সুখ বৃন্দাবনবাসীর শিরায়-উপশিরায় কুহরে কুহরে রুদ্রের ডমরু বাজাল। দেশের চাওয়ার সঙ্গে জীবনের পাওনার সুর মিলল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে। প্রতিমুহূর্ত বৃন্দাবনের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মনে হতে লাগল একটা পরমলগ্ন এসেছে জীবনে। মহাকালের রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি যেন সকলে শুনল বুকের মাঝখানে।

গোপবালারা কৃষ্ণের ললাটে এঁকে দিল মঙ্গলতিলক। চন্দ্রাবলী বলল: গোটা বৃন্দাবনের যেন আজ অভিসার, কি যে ভাল লাগছে!

ললিতা বলল: এ অভিসার নয় আমার বঁধুয়ার অভিষেক।

বিশাখা বলল: কত রঙ্গ জান বঁধু। একদিনেই সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে দিলে। আর, আমাদের হারানোর কিছু ভয় থাকল না। পাওয়ার ঘর আমাদের ভরে গেল।

জয়াবতী বলল: চোখ বুজলে আমার বঁধুয়াকে দেখি।

কৃষ্ণ মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছিল। আবেগ গাঢ় স্বরে বলল: চোখ বন্ধ করলে আমি দেখি কংসের কারাগার। আমার সর্বরিক্তা জননী, অসহায় পিতা যেন দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকছে। কী কাতর কণ্ঠে নিজের অদৃষ্টের কাছে প্রশ্ন করছে—কতকাল? আর কতকাল? আমি আর স্থির থাকতে পারছি না সখী। আমার বুকের ভেতর এক অশান্ত সমুদ্র। সেখানে শুধুই ঢেউ। ঢেউ'র ফণায় দুলছে আমার ক্রোধ, জিঘাংসা, আকাংখা, মুক্তি, স্বপ্ন।

দ্বৈপায়নের ভেতরটা চমকাল। কেমন একটা শিহরণ খেয়ে গেল শরীরের মধ্যে। মুখে চোখে এক অদ্ভুত অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। চোখদুটিতে কী গভীর তন্ময়তা! প্রাণ রাঙানোর, প্রাণ মাতানোর এত বড় শক্তি এত অল্প বয়সের একজন তরুণের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র দেবদুর্লভ ব্যক্তির মধ্যেই এই শক্তির

বিকাশ ঘটে। দ্বৈপায়নের সমস্ত চেতনায় ভেতর এই বিস্ময়টা ছড়িয়ে গেল ফুলের মিষ্টি গন্ধের মতন। আর তাতেই তার অনুভূতিটা অন্যরকম হয়ে গেল। এক স্বর্গীয় সুখ আর তৃপ্তির ভেতর ডুবে গেল তার চেতনা। মনে হল, এই অনুভূতির ভেতর সে কৃষ্ণের সর্বস্বময় ঈশ্বররূপ দেখতে লাগল।

বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণকেই তাদের একমাত্র অবলম্বন এবং আশ্রয় ভাবল। কৃষ্ণই তাদের পরমগতি। তাদের পরিত্রাতা। কংসের অপশাসন থেকে, অত্যাচার থেকে কেউ যদি তাদের মুক্ত করতে পারে সে কৃষ্ণ। কৃষ্ণই তাদের বল ও ভরসা। কৃষ্ণ ছাড়া বৃন্দাবনের মানুষ কিছু জানে না। গোটা বৃন্দাবন আজ কৃষ্ণময়; অথবা কৃষ্ণই বৃন্দাবনময়। কিন্তু কৃষ্ণের কি আছে? কিছু নেই। নিঃস্ব, রিক্ত, অনাগত এক জাতির আদরের ধন। কৃষ্ণের থাকার ভেতর আছে এই বিত্তটুকু।

মানুষের ভালবাসা, আস্থা, নির্ভরতা তাকে করে তুলল দায়িত্বশীল। শৈশব থেকেই কৃষ্ণ নিজের অজান্তে বৃন্দাবনের প্রতিটি মানুষের মনে এই প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল। দুঃখী মানুষের আশার দীপ। এই দীপ-শিখাটুকু জ্বালিয়ে রাখার জন্য কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তাদের। মানুষের এই একান্ত নির্ভরতার দাম দিতে কৃষ্ণ নিজেকে উৎসর্গ করল। সবটুকু সুবুদ্ধি দিয়ে কি করে একটা স্বৈরাচারী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে ধীরে ধীরে তাকে হীনবল করে তোলা যায় তার এক অদ্ভুত চতুর খেলায় মেতে উঠল কৃষ্ণ। অথচ তার সৈন্যবল নেই, ধনবল নেই, যুদ্ধ করার অস্ত্র নেই, এমন কি কোন রাজশক্তির সমর্থন কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা নেই। তবু তার মত সর্বরিক্ত নিরস্ত্র একটি মানুষকে কংসের কত ভয়। কংসের সর্বক্ষণের আতঙ্ক কৃষ্ণ। কৃষ্ণ তার মনোবল ভেঙে দিয়েছে, আত্মবিশ্বাস হরণ করেছে, রাতের নিদ্রা এবং দিনের নিশ্চয়তা কেড়ে নিয়েছে। কিসের জোরে পারল কৃষ্ণ? আত্মবিশ্বাসের জোরে,

লোকবল আর বাহুবলের জোরে। মানুষের পরম নির্ভরতা আর চরম বিশ্বাসই তাকে দায়িত্বশীল, চতুর, কুটকৌশলী, বিবেকবান জনগণমন অধিনায়ক করে তুলল।

অধিনায়কত্ব দেবার একটা নিজস্ব ক্ষমতা ছিল কৃষ্ণের। একেবারে ছোট থেকেই ছিল। নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্তব্য মাথায় করে নেবার একটা দুঃসাহস তার চিরদিন ছিল। তাই কংসের ধনুর্যজ্ঞ আমন্ত্রণ কৃষ্ণ নির্ভয়ে গ্রহণ করল। এটা যে আদৌ যজ্ঞ নয় তার মরণ ফাঁদ, কৃষ্ণ জানত। তবু সেজন্য কোন উদ্বেগ কিংবা দুর্ভাবনা ছিল না। অন্তরে কোন শংকাও হল না। বরং প্রজ্ঞাবলে বুঝেছিল, কংসের নিয়তিই তাকে নিয়ে যাচ্ছে মথুরায়।

কৃষ্ণ কোনদিন কংসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চায়নি। অথচ, কী অপূর্ব কৌশলে তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রাখল সর্বক্ষণ। একে একে বিশ্বস্ত লোকদের হত্যা করে তাকে হীনবল করল, তার মনোবল ভেঙে দিল। মৃত্যুর আতঙ্ক যে সদা উদভ্রান্ত এবং অপ্রকৃতিস্থ হয়ে থাকল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সে এখন নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। কী অসাধারণ বুদ্ধিবল আর কৌশলে কৃষ্ণ এক বিরাট-রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এড়িয়ে স্বৈরাচারী রাজশক্তির পতন ঘটাল তা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। একটা প্রবল রাজশক্তির পক্ষে যা সম্ভব ছিল না, কৃষ্ণ সেই অনায়াসসাধ্য কাজ কত শান্ত সংযতভাবে করল তার পনেরো বছর বয়সে।

এমন বুদ্ধি, কৌশল, প্রজ্ঞা কোন মানুষের হয়, না হতে পারে? কৃষ্ণকে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না বলে, তার সব কাজের প্রতি কেমন একটা মুগ্ধ অনুরাগ গভীর হয়ে ওঠে। তখন কৃষ্ণ আর মানুষ থাকে না দেবতা হয়ে যায়। দ্বৈপায়নের মনে হল, কৃষ্ণের দেবত্ব মানুষের সৃষ্টি। যা কিছু বুদ্ধির অগম্য, চিন্তার অতীত তার উপরে মানুষ দেবত্ব আরোপ করে।

যুগযুগান্তর ধরে রক্তে বহমান সরল ধর্মবিশ্বাসের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৃষ্ণের অবতারী মূর্তি। অমিতশক্তির অধিকারী এবং ঈশ্বরের

আশীর্বাদ ধন্য বলেই কৃষ্ণ এক অসাধ্যকে সাধন করল। এমনিতে মথুরা-বৃন্দাবনে তার বলিষ্ঠতার বিপুল খ্যাতি। তার দুই হাতের বজ্রমুঠিতে কত বাঘা বাঘা অসুর, দুর্বৃত্তের মাথার খুলি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল, এমন কি পশুর সঙ্গে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে খালি দুই হাতে লড়ে তাদের জখম অথবা হত্যা করল। দৈহিক বল সম্পর্কে তার নিজের কোন সংশয় ছিল না। বলতে কি জেনেশুনেই সে জীবনের সঙ্গে পরম কৌতুক করার জন্যেই যেন নির্ভয়ে সিংহের গুহায় ঢুকল। কারণ কৃষ্ণ সহজা ত বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিল যে, এই ধনুর্যজ্ঞে যোগদান করলে জনচক্ষে তার জীবনকে এক অভিনব গৌরবে উদ্ভাসিত করে তুলবে।

হলও তাই। কৃষ্ণের আগমনের সংবাদটা কেমন করে যেন রটে গেল। তাকে দেখার জন্যে মল্লভূমি লোকে লোকারণ্য হল; সকলের দৃষ্টি কৃষ্ণের উপর। মল্লভূমিতে সে একেবারে একা নিঃসঙ্গ। নিরস্ত্র। একটু ভাল করে তার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় যেন তার কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোন অস্ত্রের। নিরাবরণ নরম আর কমনীয় চেহারার মধ্যে একটা বলিষ্ঠতা যেন স্পষ্ট। কিন্তু কোথাও দেহের ভাঁজে ভাঁজে পেশীগুলো ফুলে উঠেনি। মনে হয় শ্যামল সবুজ পাথর কুঁদে কুঁদে কেটে তৈরী সেই বলিষ্ঠ যৌবন-মূর্তি। আশ্চর্য সেই দেহশ্রী মল্লভূমির ফাঁকা পরিবেশে ভাস্কর্যের মত লাগছিল।

বাতাসে ভেসে এল হাতীর বৃংহণ। কৃষ্ণের ভ্রূক্ষেপ নেই। অবিচলিতভাবেই সে দাঁড়িয়ে রইল। জনতা উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কৃষ্ণের দিকে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে রইল। মদ-মত্ত উল্লাসে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কুবলয়পীড় তেড়ে গেল কৃষ্ণের দিকে।

কৃষ্ণের কোন ভাবান্তর ঘটল না। অমিতশক্তি আর সাহসের অধিকারী যে, সে ভয় পায় না কিছুই। নির্ভয়ে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রইল মল্লভূমিতে। কুবলয়পীড়ের ঘন ঘন হুংকারে সহসা এক আতংক সৃষ্টি হল। কিন্তু কৃষ্ণ একেবারে স্থির। একভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কুবলয়পীড়ের পায়ের উপর কোন বল ছিল না, বল ছিল না তার গতির উপর। তার শরীরটা টলছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। কুবলয়পীড কৃষ্ণের একেবারে সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। এক পা আর এগিয়ে যেতে সাহস পেল না। হাঁটু মুড়ে বসল কৃষ্ণের সামনে। শুঁড় তুলে ঘন ঘন হুংকার দিতে লাগল। কৃষ্ণ তার দু'চোখের উপর চোখ রেখে এক পা, দু' পা করে তার দিকে এগিয়ে গেল।

অবোধ প্রাণীটিও যেন বুঝতে পারল কৃষ্ণ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের স্থান এবং কৃষ্ণই সর্বভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব কৃষ্ণই সর্বপ্রধান পূজনীয়। তিনি সনাতন পরমপুরুষ। কৃষ্ণের মহৎ আর জ্যোতির্ময় সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে যেন তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করল। তার করুণা প্রার্থনা করল নিজস্ব প্রথায়। যে দুষ্কর্মের জন্যে দায়ী সে নয় তার শাস্তি প্রার্থনা করছিল। এহেন অদ্ভুত দৃশ্য জনতার অন্তরে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের মহিমার এক মহৎ অনুভূতিতে আবিষ্ট করল। তাদের উচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনি কৃষ্ণকে উদ্দীপিত করল। একলাফে সে কুবলয়পীড়ের ঘাড়ে চেপে বসল। এবং প্রবল বিক্রমে তার বৃহৎ দন্তদ্বয় উৎপাটিত করতে লাগল, আর তার গলা থেকে একধরনের গোঙানির মত শব্দ বেরোতে লাগল। কুবলয়পীড় তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় হাঁক ছেড়ে আর্তনাদ করতে করতে মল্লভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে মাটি ভিজে গেল।

খুন চেপে গেল কৃষ্ণের মাথায়। একটা তীক্ষ্ণ তীব্র উত্তেজনা তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে গলন্ত আগুনের স্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। আর তার বলিষ্ঠ দুই হাতের পেশী ও শিরা এই মুহূর্তে ফুলে ফুলে গোলাকৃতি এবং শক্ত হয়ে উঠল। আর তার হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশীর মত তার বৃহৎদন্ত চেপে ধরে উৎপাটিত করে ফেলল। কুবলয়পীড়ের মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। রক্তের নদীর ভেতর পড়ে রইল তার সংজ্ঞাহীন দেহ। তবু কৃষ্ণ উৎপাটিত দন্ত দ্বারা আঘাত করে তার মাথা চূর্ণ করল।

ভয়ংকর আক্রোশে কৃষ্ণের চোখদুটি আগুনের গোলার মত জ্বলছিল দপ্‌দপ্‌ করে। ফিসফিস গলায় বলল: কোথায় কংস? এবার তোমার আমার বোঝাপড়া।

মল্লভূমির মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে দেখল কংস চুপিচুপি পালানোর চেষ্টা করছে। ক্রোধে কৃষ্ণের মাথার চুল খাঁড়া হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠল কৃষ্ণ। কোথা যাও কংস? পালানোর চেষ্টা বৃথা। পালিয়ে তুমি রেহাই পাবে ভেবেছ?

কৃষ্ণের শরীরের ভেতর দেবতার মত একটা অলৌকিক শক্তি জেগে উঠল। তিলার্ধ দেরী না করে মাটি থেকে একটা বড় পাথরের খণ্ড অবলীলায় তুলে নিয়ে কংসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। কী আশ্চর্য, সেই আঘাতেই কংস ধরাশায়ী হল। মুহূর্তে করুণ আর্তনাদে আর মৃত্যু যন্ত্রণার গোঙানিতে মল্লভূমির বাতাস ভারী হয়ে উঠল।

ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল জনতা। মুহূর্তে যেন একটা প্রলয় ঘটে গেল। তারপরে যা হয়। ঝড়ের পর সব শান্ত। মৃত্যুর মত নিথর স্তব্ধতা নেমে এল মল্লভূমিতে।

কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর দর্শকদের কেউ কেউ মল্লভূমির দিকে এগিয়ে গেল। এল তাদের মুক্তিদাতা কৃষ্ণের সামনে। তাদের দু'চোখে কৃতজ্ঞতা আর অপার্থিব বিস্ময়ে থমথম করতে লাগল মুখখানি।

কৃষ্ণের এই রূপের ধ্যান করতে করতে বিপুল এক সুখের আবেশে আচ্ছন্ন দ্বৈপায়নের চেতনার ভেতরে অপরূপ ইন্দ্রজালের মত খেলা করছিল শালপ্রাংশু মহাভুজ একটি অসাধারণ শক্তিমান পুরুষের প্রতিকৃতি। তিনি হলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু। মনে হল, সে জগৎপরিত্রাতা বিষ্ণু যেন কৃষ্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

মথুরার সারা আকাশ রাঙা করে সূর্য উঠল। মনে হল গোটা আকাশটাকে কে বা কারা যেন আবির রাঙিয়ে দিয়েছে। সর্বত্র একটা

খুশির হিল্লোল বয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা জীবনের কল্লোল এসে পড়ল মথুরার স্রোতহীন শান্ত জীবন-নদে।

প্রাসাদ-শীর্ষে কংসের শার্দুল অংকিত লাল পতাকা নামিয়ে শূরসেনের স্বস্তিকা চিহ্নিত গৈরিক পতাকা পতপত করে উড়ছিল।

মথুরার চতুর্দিকে বাতাসে রাষ্ট্র হয়ে গেল কোনরকম লোকক্ষয় না করে কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেছে। এবং কৃষ্ণ নিজে শূরসেনের বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে মথুরার সিংহাসনে তাঁকে অভিষেক করেছে। অমনি মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। উলুধ্বনি কল্লোলিত হল। বাতাসে ভেসে এল মিষ্টি ফুলের সুবাস।

কংসের হাত থেকে মথুরার মানুষকে সুখশান্তি, ঐশ্বর্য এবং মুক্তি দেয়াতে কৃষ্ণের গৌরব ও মহিমা বেড়ে গেল। কংস না থাকলে কৃষ্ণের ভেতর যে অনন্ত ঐশ্বর্য আর বিরাট-শক্তি লুকিয়ে ছিল তা জানা হত না। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণাগুলো, অমিত-শক্তিধর কৃষ্ণের অনেক অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনা এবং চরিত্রগুণের মাধুর্য, ঔদার্য, মহত্ত্বের সাথে মিলে-মিশে অর্থময় হয়ে উঠল। কংসের মত দুরন্ত স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী রাজাকে কৃষ্ণ একা কি করে বধ করল এই বিস্ময়টা যতদিন মথুরার মানুষের মনে থাকবে ততদিন কৃষ্ণ তাদের কাছে ঈশ্বরের অবতার ছাড়া অন্য কিছু নয়। কোন একজন মানুষ একা ইতিহাস বদলে দিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ একাই সেই অসম্ভব কার্য পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কেমন করে করল? দৈববলেই পারল। দেবতার প্রসাদে সে অজেয়, দুর্ধর্ষ, দুর্নর। কংস নিধনের জন্যে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ।

একজন মানুষ তার গুণ ও কর্মের জন্যে কত অল্প বয়সে মানুষের হৃদয়ের দেবতা হয়ে যায় কৃষ্ণ তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণকে ঈশ্বর বানিয়ে মথুরাবাসী সেদিন এক স্বর্গসুখ অনুভব করেছিল। তাই, অকাতরে কৃষ্ণের জন্যে প্রাণ দিতে, কষ্ট ভোগ করতে তারা কোন ক্লেশ বোধ করল না। এটাই আশ্চর্যের কথা।

কিন্তু কংসকে বধ করে কৃষ্ণ মথুরাবাসীর জীবনে কোন নিশ্চিত

সুখ ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না। সুখের মুখ দেখার আগে আরো একটা বড় উপদ্রব এবং অশান্তি তাদের উপহার দিল।

কংসের মৃত্যুতে মথুরাবাসী স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচল। কিন্তু প্রত্যাশিত সুখ ও শান্তি তখনও নাগালের বাইরে থাকল। জামাতা কংসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করল। এক দীর্ঘকালের যুদ্ধ শুরু হল। কংসের সময় যে যুদ্ধ ছিল গৃহযুদ্ধ, স্নায়ুযুদ্ধ তা খোলা ময়দানের প্রকাশ্য লড়াইতে পরিণত হল। কিন্তু কৃষ্ণের নেতৃত্ব এবং সংগঠনের জোরে জরাসন্ধ কিছু করতে পারল না। অপরাজেয় দাম্ভিক জরাসন্ধকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হল। একবার নয়, বার বার। আঠারো বার জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করল। কিন্তু যুদ্ধফলের কোন পরিবর্তন হল না।

অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবলে কৃষ্ণ বুঝল, যুদ্ধটা এখন আর শূরসেনের সঙ্গে গিরিব্রজের নয়। এ যুদ্ধ সরাসরি তার সঙ্গে জরাসন্ধের মর্যাদার লড়াই। যে যুদ্ধ শুধু একজন ব্যক্তির জন্যে, সে যুদ্ধে গোটা দেশ ও জাতির ভাগ্য জড়ানো উচিত নয়। শুধু তার নিরাপত্তা, স্বার্থ ও ভাবমূর্তির জন্যে মথুরার যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা ছিল অর্থহীন। এভাবে যুদ্ধ হলে মথুরার ক্ষতি হবে। নিজের জন্যে কৃষ্ণ মথুরার জনগণকে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গ্রাসের মুখে ফেলে দিতে পারল না। এমনিতে তার জন্যে মথুরার মানুষ অনেক মূল্যে দিয়েছে। অনেক লাঞ্ছনা সয়েছে। তাদের বোঝা আর বাড়াতে চাইল না। মথুরাবাসী যখন বুঝবে তাদের দুর্ভাগ্যের হেতু কৃষ্ণ তখন কর্পূরের মত সব আবেগ উবে যাবে। শ্রদ্ধা, ভালবাসার বিশাল সাম্রাজ্য হারাবে। সেই রকম কিছু ঘটার আগে কৃষ্ণ মথুরা ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। প্রজ্ঞাবলে বুঝেছিল, মথুরা ত্যাগের অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ থেমে যাবে। তার পলায়নটা হবে জরাসন্ধের কাছে কৃষ্ণের পরাজয়। যদিও পলায়ন পরাজয় নয়, যুদ্ধ কৌশল। তবু জরাসন্ধের অহং পরিতৃপ্ত হবে। আর তাতেই মথুরার সঙ্গে তার শত্রুতার অবসান হবে। এসব ভেবেচিন্তে কৃষ্ণ কাউকে না জানিয়ে গোপনে বলরামের সঙ্গে মথুরা

ত্যাগ করল। অল্প কয়েকদিনের ভেতর সেই সংবাদ রটে গেলে জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ তুলে নিল এবং কৃষ্ণের পিছনে ধাওয়া করল।

দেশ ও জাতির কষ্ট ও বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করে যে মানুষ তাদের ক্লেশ লাঘবের জন্যে, কল্যাণের জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে, দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্যে অক্লেশে নিরাপত্তাহীন এক অনিশ্চিত অবস্থা স্বেচ্ছায় বরণ করার সাহস ও মনোবল দেখাল তার মত মহাপ্রাণ মানুষ আর কে আছে? কৃষ্ণের এই মহানুভবতা, এবং করুণাই পৌঁছে দিল তাকে ঈশ্বরের খুব কাছে।

কৃষ্ণই ঈশ্বর। মানে, ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট গুণগুলি সব কৃষ্ণের মধ্যে আছে। কৃষ্ণে আর ঈশ্বরে তাই পার্থক্য নেই। কথাটা দ্বৈপায়নের অনুভূতির ভেতর তরঙ্গায়িত হয়ে গেল। কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ল অপূর্ব উল্লাসে। বুকের ভেতর নিরুচ্চারে প্রাতধ্বনিত হতে লাগল। সমস্ত বিশ্বচরাচর জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল ঐ একটি নামের মাহাত্ম্য: কৃষ্ণস্তু ভগবান। কৃষ্ণ জগতের পরিত্রাতা। নিরুপায়ের উপায় করতে, দুষ্কৃতকারীকে দমন করে, অধার্মিককে ধর্মপরায়ণ করতেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছে।

এই চোখে কৃষ্ণকে আগে কথনো দেখেনি দ্বৈপায়ন। দেখার দরকার হয়নি। সময়ের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধ পাল্টে গেল। সময়ে সব বদলে যায়। দ্বৈপায়নের ধ্যান-ধারণায় কৃষ্ণ তেমনি আমূল পাল্টে গেল।

অম্বিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে একদিন সে নিজেই কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিল।* সেদিন কি করলে এবং কার সাহায্য পেলে গোপন মনের বাসনা পূরণ হয় তার চিন্তায় ও পরিকল্পনায় দ্বৈপায়নের দিন ও রাত্রি কেটেছিল। পাণ্ডুপুত্রদের ভাগ্যবিপর্যয় যখন তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল, কণামাত্র আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না, তখন হঠাৎ

---

* এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাকে অবশ্যই মৎ-লিখিত "কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন" পাঠ করতে হবে।

যার কথা প্রথম মনে পড়ল, সে কৃষ্ণ। কেন মনে হল, জানে না। এই মানুষটার অকৃপণ সাহায্য ও বন্ধুত্ব হয়ত তাকে গোপন প্রতিহিংসায় চরিতার্থ করতে পারে। এক বিশেষ সংকটমুহূর্তে এসব কথা মনে হল কেন, দ্বৈপায়ন জানে না। কোনদিন কারণ বিশ্লেষণ করে দেখেনি। আজও সেদিনের ইচ্ছেটাকে রহস্যময় মনে হল। ঈশ্বরের মতই অন্তর্যামী। দ্বারকায় তার আগমনকে পূর্বাহ্নেই টের পেয়েছিল। এবং সাগরতীরে নিজে উপস্থিত হয়েছিল তাকে পূর্ণ মর্যাদায় অভ্যর্থনা করতে। পদধূলি গ্রহণ করে বলল: ঋষিবর, আপনার পদরেণুতে দ্বারকা ধন্য হবে এ'ত আমি জানতাম। আমার প্রতীক্ষার সেই কাল পূর্ণ হল আজ।

দ্বৈপায়নের বিস্ময়ের অন্ত নেই। অবাক স্বরে বলল: কৃষ্ণ তোমার নাম শুনেছি। চোখে দেখার সাথে সাথে তুমি আমাকে জয় করে নিলে। তুমি শুধু ননী চোরা নও, মন চোরাও।

কৃষ্ণ হাসল। বলল: চোর আর চুরির অপবাদ আমার কোনদিন যাবে না।

অপবাদ বলছো কেন? এ তোমার চরিত্রের অলংকার। শুধু তোমাকেই মানায়।

কৃষ্ণের অধরে সেই সকৃতজ্ঞ অনিন্দ্যসুন্দর বিনয় হাসির লাবণ্যটুকু তার দু'চোখের তারায় ধ্রুবতারার মত জ্বলছিল।

কৃষ্ণের মুখে কেমন এক অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নামল। চোখে গভীর সম্মোহন। কৃষ্ণ যেন তার ভিতরটা দেখতে পাচ্ছিল। সে যে কিছু বলতে চায় এটা বোধহয় কৃষ্ণের কাছে গোপন ছিল না। তাই অমন অদ্ভুত চোখে চেয়ে দিল। শান্ত অথচ মৃদু-গম্ভীর গলায় বলল: মহর্ষি, আমরা দু'জনে দুজনকে বোধ হয় খুব খুঁজছি। একান্তভাবে মনেপ্রাণে চাইছিলাম। সেই চাওয়াটা পূর্ণ হল।

কৃষ্ণের কথায় দ্বৈপায়ন চমকে উঠল। ভিতরে এক শিহরিত আনন্দের উদ্দীপকস্পর্শে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হল। মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল: কেমন করে জানলে?

গাছের কবে কুঁড়ি ধরবে, সে কি গাছকে বলে দিতে হয়? কুঁড়ি ফোটার সময় হলে গাছ যেমন ঋতুর আগমন টের পায় তেমনি করে সমস্ত মন দিয়ে জানতে পেলাম আপনি দ্বারকায় আসছেন।

কৃষ্ণের কথা দ্বৈপায়নের বুকে মোহ সৃষ্টি করল। তার সমস্ত সত্তার একমুখী স্রোত দুরন্ত এক গতিতে কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। উজান বাইবার শক্তি তার ছিল না। সে ভেসে যাচ্ছিল এক অমোঘ লক্ষ্যে। নিয়তির নির্দেশে। ঋষির ধ্যানের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছিল কৃষ্ণের মধ্যে একটা দিব্যশক্তির প্রভাব আছে। যা কেবলই আকর্ষণ করে এবং ধরে রাখে। কৃষ্ণও তাকে আকর্ষণ করছে। খুব ধীরে ধীরে। আর তার ভেতরটা পরম প্রাপ্তির এক অনাবিল সুখ ও আনন্দে টৈ-টুম্বুর হয়ে যেতে লাগল।

পরমেশ্বরের অংশ বলেই কৃষ্ণ হয়ত তাকে এমন করে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অতীতের সে কথা মনে পড়লে সমস্ত অন্তরটা তার কাঙাল হয়ে যায়। আজও হল।

রাত গভীর। নীল আকাশ চুপ করে পড়ে আছে। গাছেরা, পাহাড়েরা, তারারা, সব চেয়ে আছে দীন নয়নে। দেবতার বিরাটত্বের কাছে বোধ হয় মনটা এমন দীন হয়ে যায়। চোখ পেতে চেয়ে থাকার ভেতরেও একটা সুখ আছে। মৃগনাভির মত আকুল করা সে সুখের গন্ধে মনটা সুরভিত হয়ে যায়,—এ কি কম পাওয়া জীবনে?

॥ তিন ॥

পাণ্ডবের বিজয়-কাব্য লিখতে এ কোন্ অদ্ভুত অনুভূতি হল দ্বৈপায়নের? পাণ্ডবের সব কীর্তি গৌরব যেন কৃষ্ণ মহিমায় ঢাকা পড়ে গেল। কার ইচ্ছেয় এমন হল? পাণ্ডবদের যশ-কীর্তনের একটি চরণও লেখা হল না, কথাটা কতবার তার কতভাবে মনে হল। কর্তব্য না করার জন্যে একটা আপশোষ ছিল মনের ভেতর। কিন্তু করারও ছিল না কিছু। লেখনীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কে যেন তাকে দিয়ে লেখাচ্ছিল,

আর সে লিখছিল। কৃষ্ণ ছাড়া পাণ্ডব জয়কাব্য হয় না। কৃষ্ণই তাদের জীবনাকাশের চন্দ্র-সূর্য। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের ছায়া।

কৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তীর পুত্র পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের কত নিকট আত্মীয়। তবু দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে কোন আত্মীয় বন্ধন ছিল না। থাকবে কি করে? কৃষ্ণ সে-সময় মথুরা থেকে স্বৈরাচারী শাসকের অপশাসন থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করতে দিবসের বেশিভাগ সময় ব্যয় করল। পাণ্ডবদের কথা তখন ভাববার অবসর কোথায়? নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংকট নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত। একটা ভবিষ্যৎ করে নেয়ার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছিল। রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে পাণ্ডবদের খোঁজ-খবর করতে আরো কিছুকাল সময় কেটে গেল। সত্যিকারে সময় যখন কৃষ্ণের হল, পাণ্ডু-পুত্রেরা তখন হস্তিনাপুর ছেড়ে বারণাবতে বাস করছিল। এর কিছুকাল পরে মনোরম বাসগৃহ জতুগৃহ অকস্মাৎ ভস্মীভূত হওয়ার খবর এল। সেই সংগে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবের মৃত্যু সংবাদ রটে গেল। পাণ্ডবদের সম্পর্কে কৃষ্ণের কৌতূহল ও উৎসাহের ভাঁটা পড়ল সেখানে। তারা বেঁচে আছে কি নেই এটা জানতে কয়েকটা বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন পাঞ্চাল থেকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার নিমন্ত্রণ এল। দ্রৌপদীর বীর্যশুল্ক হওয়ার শর্তটি অদ্ভুত ছিল। কৃষ্ণের তখনই কেমন একটা সন্দেহ হল। মনে হল এই স্বয়ম্বর সভায় একটা কিছু ঘটবে। বহুকালের কোন অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। সেই রহস্যের কেন্দ্র বিন্দু অবশ্যই পঞ্চপাণ্ডবের আত্মপ্রকাশ। কথাটা না ভেবেই হঠাৎ মনে এল। অবদমিত কৌতূহলটা চাপতে না পেরে বলরামের সামনেই বলে ফেলল: জান ভাইয়া, পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রুপদের একটা গোপন যোগাযোগ হয়ত আছে।

বলরাম বলল: এরকম অদ্ভুত কথা মনে হল কেন?

স্বয়ম্বর সভার অদ্ভুত শর্তগুলো যেন কারো কথা ভেবে তৈরী। লৌহ-ধনুটি একটি লৌহ শকটে রাখা হল কেন? ধনু উত্তোলন করে ঘুরন্ত চক্রের মধ্যে দিয়ে উপরে রক্ষিত লক্ষ্যবস্তু যে বিদ্ধ করতে পারবে

দ্রৌপদী তার জয়লব্ধা হবে। এর অর্থ ধনু উত্তোলনের ব্যাপারটা সাধারণ ঘটনা নয়। একটা বিশেষ কৌশল ছাড়া ধনুটি যে তোলা সম্ভব নয় এটা নিশ্চিত। ঘূরন্ত চক্রের ভিতর দিয়ে লক্ষ্যবস্তু বিদ্ধ করার জন্যে অনুশীলনে পারদর্শী হওয়া চাই। দ্রোণাচার্য শিষ্যদের লক্ষ্যভেদের যে পরীক্ষা নিয়েছিল তার সঙ্গে এই লক্ষ্যভেদটির মিল বেশি। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় কেবল অর্জুনই জয়ী হয়েছিল। তাই বলছিলাম, স্বয়ম্বরের এই দুটি শর্তের মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্য লুকনো আছে। আর সেই রহস্যের চাবিকাঠি আছে একজনের কাছে। কে সে? তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

বলরাম হাসল। বলল: অন্য কেউ'ত হতে পারে।

কৃষ্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল: না। দ্রুপদের চিরদিনের অভিলাষ ছিল অর্জুনকে জামাতা করার। অর্জুন সহ পঞ্চপাণ্ডবের এক সম্মানজনক আত্মপ্রকাশ মাথায় রেখে যে দ্রুপদ স্বয়ম্বর সভায় এই অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের পরিকল্পনা করেনি, কে বলতে পারে?

অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে কৃষ্ণ অনুমান করেছিল যে জতুগৃহে পাণ্ডবেরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়নি, তারা কোথাও না কোথাও বেঁচে আছে। এরকম একটা প্রত্যয় নিয়ে কৃষ্ণ বলরাম এবং অন্যান্য যাদবদের সমভিব্যাহারে যাত্রা করল পাঞ্চালে।

কৃষ্ণের অনুমান সত্য হল। পঞ্চপাণ্ডবদের আগে না দেখলেও প্রজ্ঞাবলে তাদের চিনতে ভুল হল না। ব্রাহ্মণদের ছদ্মবেশে যে একজন প্রতিযোগী বসেছিল অতবড় স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো তা নজরে পড়ল না। কত গভীর পর্যবেক্ষণ এবং লোকচরিত্র অভিজ্ঞতা থাকলে তবে সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে উঠা যায়, কৃষ্ণের দূরদৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা ছিল তার অভিজ্ঞান।

কৃষ্ণের মত বিরল ব্যক্তিত্বের মানুষের দর্শন কদাচিৎও হয় না। হলে, পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণের সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বিদ্যুত-দীপ্তি সহসা সভা-মধ্যে ঝলকে উঠল।

দ্বৈপায়নের চোখে সেই দৃশ্যটি জ্বলজ্বল করে উঠল। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি। কোন মানুষ বোধ হয় কৃষ্ণের সেই ভূমিকা বিস্মৃত হবে না। বুকের অতলে তার বিস্ময় এবং স্মৃতির দীপ জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।

ব্রাহ্মণবেশী তৃতীয় পাণ্ডবের জয়লব্ধা হল দ্রৌপদী। অমনি, আশাহত, ব্যর্থ নৃপতিবর্গ এবং প্রতিযোগিরা প্রমত্ত ঝঞ্ঝার মত তেড়ে এল তৃতীয় পাণ্ডবের দিকে। কোথা থেকে মধ্যম পাণ্ডব কৃতান্তের মত তার পাশে এসে দাঁড়াল। দুই-ভাই বীরবিক্রমে যুঝতে লাগল ব্যর্থ প্রতিযোগিদের আক্রমণ। মুহূর্তে এক তাণ্ডব সুরু হল। হৈ চৈ, কোলাহলে বাদ-প্রতিবাদ-আস্ফালন-গর্জন, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ, হাতাহাতি মিলে স্বয়ম্বরসভা রণক্ষেত্রে পরিণত হল। বিবাদমান, যুদ্ধরত দুই পক্ষের মাঝখানে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণ। সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং ভাস্বর লাগল তাকে। অকম্পিত স্বরে অশান্ত নৃপবর্গকে শান্ত ও সংযত হওয়ার আবেদন করল। মনে হল, বহুদূর থেকে অজানা কোন গ্রহ থেকে যেন তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। হে আমার পরমশ্রদ্ধেয় বান্ধবগণ, আজ বিবাদের দিন নয়, আনন্দের দিন। আমরা সবাই বোধ হয় একটু আত্মহারা হয়ে আনন্দকে বিষাদে পরিণত করে ফেলেছি। কিন্তু কেন? হানাহানি করে কি আর ভাগ্যফল ফেরানো যাবে? নিয়তির নির্দ্দেশে যা হওয়ার হয়েছে। ভাগ্যফল নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ক্রোধের বশে, অস্ত্র নিয়ে হানাহানি করলে আপনাদের মত সম্মানিত রাজন্যবর্গের কারো গৌরব বাড়বে না। সম্মান খোয়া যাবে। সৌভাগ্যও ফিরবে না। তা-হলে, এই বিরোধ করে লাভ কি? কার স্বার্থে এবং কেন বিরোধ করবেন? হঠকারিতা করে কারো কিছু লাভ হবে না। এই দুই ব্রাহ্মণের বাহুবল, সাহস, শক্তি এবং তেজ প্রমাণ করেছে এরা কারো চেয়ে হীন নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এঁরা তো ধর্মতঃ সর্বসমক্ষে পাঞ্চালীকে লাভ করেছে। তা-হলে, এঁদের সঙ্গে কেন যুদ্ধ করবেন আপনারা? দয়া করে আপনারা হঠকারিতা বন্ধ করুন। তার বজ্রগম্ভীর স্বর সভাকক্ষে গম-

গম করে উঠল। ঝঞ্ঝাবার্তা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র নির্ঘোষের মত কল্লোলিত হল।

কৃষ্ণের আবেদন মন্ত্রের মত কাজ করল। নিমেষে থমকে দাঁড়াল সবাই। সম্মোহিতের মত তারা কৃষ্ণের ভাষণ শুনল। মুহূর্তের মধ্যে বিবাদ-হানাহানি ভুলে যেন কোন মন্ত্র বলে এমন নিশ্চল হয়ে গেল। সভাশুদ্ধ লোকের কাছে তা পরম বিস্ময়। কৃষ্ণের কণ্ঠে আহ্বান করার মত এমন একটা শক্তি ছিল যে তারা অভিভূত হয়ে গেল। প্রশ্ন করার মত স্বর গলা দিয়ে বেরোল না। কৃষ্ণের প্রশান্ত স্নিগ্ধ কালো দুই আঁখির তারার গভীরে তাদের চেতনা হারিয়ে গেল। তারা তখন কৃষ্ণের বশীভূত।

কিন্তু কৃষ্ণের মুখে কোন বিস্ময় রেখাপাত হল না। তার কোন ভাব নেই। নির্বিকার এবং নির্লিপ্ত। প্রতিহিংসার উল্লাসে যুদ্ধোন্মত্ত দুটি পক্ষ যখন রক্তের তৃষ্ণায় পাগল হয়ে উঠল তখন কৃষ্ণ কোন মন্ত্র বলে তাদের ক্রোধের আগুনে জল ঢেলে দিয়ে তাদের শান্ত ও সংযত করল ভাবতে বিস্ময় লাগল দ্বৈপায়নের। অনেককাল আগের সেই দৃশ্যটা দ্বৈপায়ন অবিকল দেখতে লাগল। কৃষ্ণ কী গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। কি সরল নিষ্পাপ আলোয় ধোয়া তার মুখ। তার নীরব স্পর্শে যেন দেহ-মন এক আশ্চর্য সুখে ভরে গেল। চোখে মুখে তাদের খুশির নির্ঝর।

কৃষ্ণের কণ্ঠে বিধাতা আহ্বানের শক্তি দিয়েছিল। সেই ডাক যখন পৌঁছয় চিত্তলোকে তখন সব ভাষা নীরব হয়ে যায়। প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। সপ্ত-স্বরা বীণার মত বুকের গভীরে অনাহত স্বরে বেজে যেতে থাকে। যার আহ্বানে প্রাণের ভেতর এত বড় সুধা সিন্ধু বইয়ে দিতে পারে, অন্তরে মহত্ত্বের দীপ উজ্জ্বলিত করে দিতে পারে তার মত বড় জগৎশাসক কে আছে? স্বয়ম্বর সভায় কৃষ্ণের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তিটি সেদিনই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ভারতীয় রাজন্যবর্গের অন্তরে। দ্বৈপায়নের নিজেরও একটা মহৎ, উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চেতনা। আর তীব্র একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন মহাপ্রাণ কৃষ্ণের এক অখণ্ড জ্যোতির্ময় সত্তার কাছে

লুটিয়ে পড়তে চাইল। আকুল হল হৃদয়। বুকের অভ্যন্তরে সহসা কার কণ্ঠস্বর শুনল যেন? কে যেন বলল, দ্বৈপায়ন ডুব দাও আত্মার গভীরে, ধ্যানে, কল্পনায় কৃষ্ণলীলার অনুভূতি ও দর্শন হবে তোমার। রচনা কর আনন্দামৃতরস-সিক্ত কৃষ্ণ মাহাত্ম্য। পূর্ণতমকে লাভ করে পূর্ণ হও, সার্থক হও, জগৎকেও সঞ্জীবিত কর কৃষ্ণলীলামৃত রসে।

মহান ভারতের মহান সন্তান কৃষ্ণ বিরাট, অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর। বিরাট তাঁর কর্মশালা। মহাবিশ্বে বিস্তৃত তাঁর বিশ্বরূপ। কিন্তু মহাভারতের মহানায়ক-কৃষ্ণ রাজনৈতিক নেতা, সমরকুশলী প্রাজ্ঞ রাজপুরুষ। স্বয়ম্বর সভায় গোষ্ঠে যাওয়ার মুরলী বাজল না, শ্যামল ধবলীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল না হাম্বা হাম্বা রব, বৃন্দাবনের গোপপল্লীর দধিমন্থন ধ্বনির সঙ্গে মাতা যশোদার কণ্ঠ হতে বার হল না স্নেহকোমল তিরস্কার, ভৎর্সনায় অজস্র বাক্য। অস্ত্রের ঝনঝনা আর কোলাহলের মধ্যে ডুবে গেল কৃষ্ণের সেই শান্ত, মধুর রূপ। এখানে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী কৃষ্ণ নন। কালের নিয়ন্তা অবতারী। জগতে শান্তি ও ধর্ম সংস্থাপন করতেই অবতীর্ণ হয়েছেন। কৃষ্ণ সকল দেহের আত্মা, সকল মনের নিয়ন্ত্রা, সকল প্রাণের আরাম। মনের আনন্দ-রূপে নিজেকে প্রকাশ করল ঐ স্বয়ম্বর সভায়। ভারতীয় রাজন্যবর্গ সেদিন একথাটা স্পষ্টভাবে না জানলেও মনের গভীরে এরকম একটা প্রচ্ছন্ন অনুভূতি হয়েছিল। তাই তার বাক্যে সম্মোহিত হল তারা। নয়নের হিংসার বহ্নি প্রেমের পরশে গলে গেল। প্রেমময় কৃষ্ণের সর্বব্যাপী প্রেম, নিঃস্বার্থ ভালবাসা হিংসোন্মত্ত রাজন্যবর্গের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করল; মনুষ্যত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করল। সত্যের পথে, ধর্মের পথে ও কল্যাণের পথে তাদের আকর্ষণ করল।

এত গভীর করে আগে কখনো এ সমস্ত ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি দ্বৈপায়ন। আজ যখন প্রবেশ করল সেই সময়ের আনন্দ এবং বিস্ময়ে তার ভেতরে এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটল। সেই ঘটনার মধ্যে এ কোন কৃষ্ণকে পেল? অনন্ত ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরের বিরাট সত্তার সঙ্গে কৃষ্ণ যেন তার অনুভূতিতে একাকার হয়ে গেল। যে ঈশ্বরকে চোখে

দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না সেই পূর্ণতমের বিকাশ দ্বৈপায়নের সত্তায়, চৈতন্যে মিশে কৃষ্ণ যেন অনন্ত ঐশ্বর্যময় ঈশ্বরের সমস্ত রূপসম্ভার নিয়ে অব্যয় প্রাপ্ত হল।

পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রথম দর্শনের বিস্ময় এবং মুগ্ধতার কথা দ্বৈপায়নের অজানা ছিল না। পাঞ্চালীকে সঙ্গে নিয়ে অর্জুন,' ভীম ভার্গবের কর্মশালার দিকে যখন রওনা হল তখন তাদের যাত্রাপথের দিকে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। মুখে তার মুগ্ধতার হাসি। চোখে কৌতুক।

দ্বৈপায়ন একটু কুটিল চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে ছিল। কৃষ্ণের লুব্ধ দুটি চোখ দ্বৈপায়নের মুখের উপর স্থির। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠার জন্যে বলল: মহর্ষি, এদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যেই বোধ হয় দৈব আমাকে টেনে নিয়ে এল এখানে। হয়'ত একটা বিরাট কিছু ঘটবে। এতে তোমার ভূমিকাও কম নয়। দ্বারকায় তোমার কথায় রহস্যের যে ইংগিত ছিল, কার্যত তার সত্যতা যাচাই করতে এসেছি। না এলে, একটা বড় ক্ষতি হত। অনেক কিছুই অসমাপ্ত থেকে যেত।

এমন কথা বলছ কেন? পাণ্ডবদের মধ্যে তুমি কি দেখলে? বলতে বাধা না থাকলে খুলে বল।

পাণ্ডবেরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। তারা একেবারে মাটি মানুষের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষের চাওয়া, প্রত্যাশা, আশা-আকাংখা দুঃখ-কষ্টকে ওরা ভাল করেই জানে। সুতরাং এই পৃথিবীটাকে স্বর্গ করে তুলতে হলে ওদের মত মানুষের সাহায্য দরকার। ওদের মিত্র পেলে আমিই ধন্য হব। আর ও কাজটা এখুনি সেরে ফেলা দরকার। কারণ ওদের সাহস, তেজ, বীরত্ব, ভ্রাতৃপ্রেম এবং দুর্ভাগ্যকে জয় করার মনোবল, যে কোন মানুষের মন কেড়ে নেয়। ওদের দেখার পর থেকে আমার মনটা কেমন আকুল হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, এরা পারবে আমার বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর পতাকা বইতে।

দ্বৈপায়ন একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল কৃষ্ণের দিকে। বলল: কৃষ্ণ তুমি না বললেও আমি জানি, মানুষের দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভাগ্য, সহায়হীন অবস্থা তুমি সইতে পারবে না। বঞ্চিত মানুষের দুঃখে তোমার বুক টাটায়। তাই অভাগা মানুষকে করুণা করতে, তার দুর্দশার প্রতিকার করতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তাই লোকে তোমাকে দীনবন্ধু, করুণাসিন্ধু বলে। বুক ছাপানো সেই প্রেমের বশবর্তী হয়ে তুমি পাণ্ডবদের গৃহে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়েছ।

কৃষ্ণ হাসল। এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি। বলল: আমি কিছুই করছি না। একজন মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের কিছু মানবিক কর্তব্য আছে। সেটুকু না করলে নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী থাকতে হয়। ওদের দেখা থেকেই মনে হয়েছে একজন আত্মীয়ের যা করণীয়, আমি তার কিছুই করিনি। সেই অনুশোচনায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছে। ওরা দুঃখী, দরিদ্র, বঞ্চিত এবং ভাগ্যহীন বলে যদি ওদের এড়িয়ে চলি তাহলে মানুষের মত কাজ হবে না। নিজের বিবেককে কি কৈফিয়ৎ দেব ? সুসময়ের বন্ধুর অভাব হয় না, কিন্তু দুঃসময়ের বন্ধুই বন্ধু। তা-ছাড়া ওরা আমার আত্মীয়। ওদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেবার জন্যে আমার কিছু করণীয় আছে। ভার্গবের কুটিরে সেই কর্তব্য করতে যাব।

দ্বৈপায়ন হেসে বলল: তুমি খুবই চতুর। এক ঢিলে দুই পাখী মারছ।

ঋষিবর সব কাজেই নিন্দে এবং প্রশংসা আছে। যে যেভাবে নেবে। চেষ্টা করলেও আমি কারো ধারণা বদলে দিতে পারব না। যা সত্য ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। কালের কষ্টি পাথরে সত্য-মিথ্যার বিচার হবে। সেই দিন না আসা পর্যন্ত এই অপবাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে।

কথাটা সহসা দ্বৈপায়নের মনের ভেতর ঝলক দিয়ে গেল। আর অমনি মহৎ উদার ও পবিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। শুদ্ধ ভক্তির আলো পড়ে কৃষ্ণ হয়ে গেল পরমপুরুষ ভগবান

দ্বৈপায়নের হৃদয়ে কৃষ্ণের অমৃতময় স্নিগ্ধ অনুভূতির মধুর আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। এই অনুভূতির উৎস কোথায়—তার শুদ্ধ কৃষ্ণানুরক্তিতে, না বাহ্য ঘটনার বিস্ময়ে ভেবে পেল না।

যত দিন যায় কৃষ্ণানুরক্তি প্রবল হল দ্বৈপায়নের। একরাশ উদাস চোখে নিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কৃষ্ণ সম্পর্কে কত অদ্ভুত ভাবনা তার চেতনার মধ্যে আতসবাজির উৎক্ষিপ্ত কণার মত ছিটকে যাচ্ছিল। আর তাতে তার মনটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল।

পাণ্ডবদের জীবননাট্যের এক নতুন অঙ্ক শুরু হল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে। ভার্গবের কুটিরে। এখানে প্রতিমুহূর্ত একটা দারুণ অনিশ্চয়, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটতে লাগল পাণ্ডবদের সময়। দৃশ্যপট, স্থান-কাল-পাত্র পৃথক হওয়ার জন্যে একটা নিরন্তর দুর্ভাবনা ছিল কৃষ্ণের অন্তরে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ন্যায়ত ধর্মত পাণ্ডবদের উত্তরাধিকারিত্বের দাবি কতখানি সুরক্ষিত করতে পারবে তার উপরেই নির্ভর করবে অসহায় প্রপীড়িত মানব-সমাজের প্রকৃত বন্ধু হওয়ার ভাবমূর্তি। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে যত ভাবনা। পাণ্ডবদের দাবি যদি না মানে তাহলে পাণ্ডবেরা কি করবে? এই জটিল প্রশ্ন মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ পঞ্চ-পাণ্ডব, পাঞ্চালী ও পৃথা সহ হস্তিনাপুরে যাত্রা করল।

কৃষ্ণের আগমনে পাণ্ডবেরা বিস্মিত অভিভূত। দুঃসময়ে কৃষ্ণের মত ভারতখ্যাত রাজনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন এক মহান নায়ককে পাওয়া শুধু ভাগ্যের কথা নয়, দেবতার পরম আশীর্বাদ। কৃপাময় ঈশ্বর তাদের আত্মপ্রকাশের চরম সংকট সময়ে কৃষ্ণকে যেন দেবদূতের মত তাদের কাছে পাঠালেন। ন্যায়ের জন্যে, ধর্মের জন্যে, সত্যের জন্যে একজন বিবেকবান মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানবদরদী মানুষের মতই কৃষ্ণ তাদের পাশে দাঁড়াল। তার আচরণ, ব্যবহার, স্বভাবের ভেতর এমন কিছু ছিল যা তাদের কৃষ্ণ অনুরাগী করল। এমন দেবচরিত্র সম্পন্ন

মানুষের সাক্ষাৎ দুর্লভ। কত দেশ, জনপদ, নগর, ঘুরল তবু কৃষ্ণের মত এমন মহান, সুন্দর, উপকারী, বন্ধুবৎসল মানুষ একজনও পেল না। কৃষ্ণ যে দুঃখী, দুর্গত, অসহায় মানুষদের পরম বন্ধু ও আশ্রয় সে'ত আগেই জেনেছিল, এখন দেখে প্রত্যয় জন্মাল। তাদের সংকট থেকে রাস্তা খুঁজতে নিজেই তাদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে এল। এর চেয়ে আশ্চার্য কি আছে? কৃষ্ণের কথা যত ভাবে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ততই আশ্চর্য হয় তারা। এই পৃথিবীতে এমন নির্লোভী, নিঃস্বার্থপর, ত্যাগী, দেবচরিত্রের মানুষ সত্যিই কি জন্মে? কৃষ্ণকে এক মহৎ কার্য সম্পাদন করতে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কৃষ্ণ রাজার দুলাল নয়। কৃষ্ণ ত'দের মত নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত মানব সমাজের একজন। অন্ধকার কারাকক্ষে জন্মগ্রহণ করে সে এল এক আলোর রাজ্যে মুক্তির বার্তা নিয়ে। লক্ষ মূঢ় মূক মানুষের বুকে বল, ভরসা, সৃষ্টি করে অত্যাচারী স্বৈরাচারী শক্তি ধ্বংস করে স্বপ্রতিষ্ঠ হল। সেই কৃষ্ণ তাদের সহায়। কৃষ্ণ সাথে থাকলে হয়ত অসম্ভব কিছু একটা ঘটতে পারে। এই বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব সহ পৃথা হস্তিনাপুরে পা রাখল।

কৃষ্ণ যাদের সহায় তাদের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্রের মনে যে ইচ্ছেই থাকুক, কৃষ্ণের দৌত্যের পাণ্ডু-পুত্রদের একেবারে রাজ্যের ভাগ বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারল না। নতুন রাজ্য ও রাজধানী করে নেওয়ার জন্যে লোকালয়হীন, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য খাণ্ডবপ্রস্থ পাণ্ডবদের অর্পণ করল। পঞ্চ-পাণ্ডব কিংবা পৃথা এ প্রস্তাবে কেউ খুশি হল না। কৃষ্ণের প্রশান্ত মুখমণ্ডল ও স্থির শান্ত দু' নয়নের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা চুপ করে রইল। কৃষ্ণ তাদের বোঝাতে বলল: কুরুপতি তোমাদের মঙ্গলের কথা ভেবেই যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। এক সিংহাসনের উপর দুজনের অধিকার কখনই সম্ভব নয়। তা-ছাড়া প্রতিষ্ঠিত নগরী ও জনপদে বিপদ বাধা লেগেই থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বসতি থেকে বনভূমি অনেক শ্রেয়। সেখানে ঈর্ষা নেই, প্রতারণা

নেই, অধর্ম নেই। পতিত বনাঞ্চলকে তোমাদের স্বপ্ন, বাসনা কল্পনামত তৈরী করে নাও। নতুন করে কিছু তৈরী করার আনন্দ অনেক। একদিন এই মন নিয়ে আমিও মথুরা থেকে দ্বারকায় নগর নির্মাণ করেছি। অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়াও একটা বড় সুখ। তোমরা সুখী হবে, শান্তি পাবে। কুরুপতির ইচ্ছে অমান্য কর না।

কৃষ্ণের কথায় মুগ্ধ ও অভিভূত হল পঞ্চ-পাণ্ডব সহ পৃথা। জট-পাকানো জীবনের গ্রন্থী এমন অবলীলায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে কৃষ্ণ খুলল কোন মায়ামন্ত্র বলে? ভাবতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে আপ্লুত হল তাদের চিত্ত। পৃথার দু'চোখ ভরে জল এল কৃতজ্ঞতায়, ফিরে পাওয়ার আনন্দে না কৃষ্ণের মত একজন দেবচরিত্রের মানুষকে পাওয়ার সুখে। কৃষ্ণ কে? মানুষ, না দেবতা—জানে না পৃথা। কোন মানুষ এমন নিঃস্বার্থভাবে, উপযাচক হয়ে অপরের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। কেউ না চাইলেও তার চাওয়ার কথাটা বুঝে নেওয়ার মত হৃদয় ক'জন মানুষের আছে? ঈশ্বরের মত দুঃখী মানুষের জন্যে হৃদয় কাঁদতে কৃষ্ণের মত আর কাউকে দেখল না।

দুর্দিনের বন্ধু ও আত্মীয় কৃষ্ণ সম্পর্কে এক অপার্থিব মুগ্ধতা সঞ্চারিত হল পৃথার মনে। হস্তিনাপুরের চারদিকে নানারকম মানুষ। কৃষ্ণ নীরব প্রহরীর মত তাদের ঘিরে আছে। হস্তিনাপুরের রাজ-সভায় আলাদা তার ব্যক্তিত্বের দ্যুতি। তাই তার নরমে গরমে মেশানো কুট ভাষণটি মনে এবং বুকে গেঁথে ছিল পৃথার। কৃষ্ণ না থাকলে পাণ্ডু-পুত্রেরা কিছুতে অর্ধেক সাম্রাজ্যের অধিকার ফিরে পেত না। পৃথার চেয়ে বেশি আর কেউ সে কথা জানে না।

পৃথার তাই বিস্ময়ের অন্ত নেই। অন্যের অনুভূতিকে হৃদয় দিয়ে ছোঁবার মত গভীরতা কৃষ্ণের মত ক'জন মানুষের আছে? সারা জীবন ধরে খুঁজে কৃষ্ণের মত এরকম একটা মানুষ পায়নি পৃথা।

পুরনো কথা ভাবলে মনের ভেতর তার ঝড় উঠে। পরিবেশ জীবনযাত্রা সবকিছু সম্বন্ধে মনটা তিক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। কিছু

ভাল লাগে না তখন। অকস্মাৎ কৃষ্ণের স্নিগ্ধ সান্নিধ্য তার ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে নবীকৃত করল। কৃষ্ণের কথায় নতুন প্রাণ পেল। এই প্রথম একটু নিশ্চিন্ত হল। একটু শান্তি পেল।

পৃথার সমস্ত চেতনার উপর নেমে এল বিহ্বলতার স্বপ্ন। এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তির মধ্যে অনুভব করল, কৃষ্ণ যেন তার অন্তরের ডাক শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছে। নিজেই তাকে খুঁজে নিয়েছে। কিছু চাইবার আগেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বন্ধু ও আত্মীয় বলে সম্মানিত করেছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর যা পারেনি, একা কৃষ্ণ সেই কাজ করল। তার চেষ্টাতে দীর্ঘকালের এক জট খুলে গেল। এক অসম্ভব কার্য উদ্ধার হল। তার সামাজিক, রাজনৈতিক মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা পেল। ভিক্ষুকিণী হল রাজমাতা। এ কি কম কথা! অন্তর্যামী ভগবান ছাড়া আর কেউ তার মনের কথা জানে না। কৃষ্ণ কেমন করে সেই কথাটা টের পেল। তার একান্ত বাসনাটি বাস্তবে রূপায়িত করল। অন্যের অনুভূতিকে হৃদয় দিয়ে ছোঁবার মত গভীরতা যে মানুষের আছে তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা তার নেই। কৃষ্ণ তার চোখে পরম করুণাময় ভগবানরূপে প্রতিভাত হল। এবং সে নিজে তার করুণা ও কৃপায় ধন্য। তার মত ভাগ্যবতী পৃথিবীতে ক'জন আছে?

নিজের অজান্তে কৃষ্ণের দিকে দু'হাত জোর করে কপাল স্পর্শ করল। বিনম্র ভক্তি ও পূজার রূপান্তরিত হয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হল সে নমস্কার। মনে মনে উচ্চারণ করল প্রাণের ঠাকুর, বুকের ঠাকুর আমার, তোমার এই প্রসন্নতা কোনদিন যেন বঞ্চিত না হই। তুমি আমার ইষ্ট, আমার ধর্ম, আমার ঈশ্বর। আমি ও আমার পুত্রেরা তোমার শরণাগত। আমাদের সর্বকর্মের সহায় থেক তুমি। তোমাতেই আমরা চিত্ত সমর্পণ করলাম। তোমার করুণা যেন চির-তরে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। দারুণ দুঃখ দুর্বিপাকে কিংবা অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য সুখের মধ্যে তোমাকে বিস্মৃত না হই। তোমাতে

আমাদের মতি অটুট রেখ কৃপাময়।

দ্বৈপায়নের লেখনী হঠাৎ থেমে গেল। পৃথার এই আকুল কর। ডাকটা তার অন্তরের ভেতর কি সব যেন হঠাৎ করে গলিয়ে দিল। সেইসব গভীর অনাস্বাদিত বোধ তার বুকের ভেতর কোথায় যে লুকিয়ে ছিল এতদিন জানত না। হঠাৎ করে পৃথার আত্মসমর্পণের প্রার্থনায় আচমকা তার নিজের ভেতর লুকানো ঈশ্বর প্রেম, কৃষ্ণানুরক্তি প্রবল হয়ে যেন পৃথার মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। আর এক দারুণ মুগ্ধ চমকে নিজেকে প্রশ্ন করল: এত কৃষ্ণ প্রেম বুকের কোন গুহায় লুকনো ছিল?

পাণ্ডবদের জয়-কাব্য রচনা করতে করতে নিজের সম্পর্কে কত কথাই মনে পড়ল দ্বৈপায়নের। নিজের সব ভাবনার কথা অন্যকে জানাতে নেই। লাভ হয় না কোন। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটা বড় তফাৎ রয়েছে। কারণ, এক একজনের ভাবনা এক এক স্তরে চলে। এক আকাশে যেমন নানাজাতের পাখি উড়ে নানা স্তরে।

দুপুরের আহারাদি সেরে বিশ্রাম করছিল দ্বৈপায়ন। একটানা ঝরণার শব্দ আসছিল। ঘুম এল না। সব সময় এক অস্ফুট আলোড়ন হচ্ছিল মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে। কিন্তু সে-সব রহস্য পুরোপুরি ভেদ করার কোন সুযোগ নেই এই রচনায়। করা উচিতও নয়। কারণ তাতে নিজের গৌরব বাড়বে না।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে অপরাহ্নে পৌঁছল। ক্লান্ত পশুপাখিদের ঘরে ফেরার সময় এটা। মাঝে মাঝে তাদের ডাক ভেসে আসে। দ্বৈপায়ন শয্যা ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় বসল। এখন বিকেলের অন্যরূপ। কিছুক্ষণ পরেই বিষণ্ণ উদাস রূপ নেবে এই তপোবন এবং অরণ্য। কোন দলছুট হরিণ যেতে যেতে হয়ত থমকে দাঁড়াবে একবার, তারপর ভয় পেয়ে দৌড়ে যাবে বনের অভ্যন্তরে। বনের বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে অন্য হরিণদের মুখে মুখ রেখে নিঃশব্দে কথা

বলবে। সোহাগ জানাবে, আদর করবে, রমণ করবে, সুখে নিদ্রা যাবে। আর তপোবন সারারাত ধরে গাছের দীর্ঘশ্বাস, পাতার বিলাপ শুনবে। আকাশ থেকে খসে :পড়া তারার দুঃসহ যন্ত্রণা দেখবে।

পশ্চিম আকাশে এখন নরম লাল গোল বলের মত সূর্য। বনান্তের দিগন্তে লীন হয়ে যাবার তোড়জোড় করছে। রাত মানেই অস্তিত্বহীনতার মধ্যে ডুবে যাওয়া। নিরবচ্ছিন্ন একাকীত্ব এবং নিঃসঙ্গতা। একা থাকা বড় কষ্ট। ঋষিদের এই কষ্ট করার কোন মানে নেই। মুনিদের মত গৃহ-জীবনে থেকে ধ্যান, জপ, তপ, সিদ্ধি অর্জনের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এক বৃহৎ রাজনৈতিক স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে রমণীর প্রেম, সন্তানের ভালবাসা পেল না। ঋষিদের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রমণীর প্রেমে, সন্তানের স্নেহে বাধা পড়তে নেই। তথাপি সব ঋষিই পিতা। সেও ব্যতিক্রম, নয়। কিন্তু প্রেম, পিতৃস্নেহ কাকে বলে কিছুই জানে না। তাই, মাঝে মাঝে কেমন একটা শূন্য লাগে। বড় একা মনে হয়। নিজের একটা সত্তা যে এখনও আছে, এই একাকীত্বের মধ্যে সেটা গভীরভাবে অনুভব করে একটা স্বস্তি পায়। এর অর্থ হৃদয়। হৃদয় আছে পাষাণ হয়ে যায়নি। নিজের মত হতে পারার এবং থাকতে পারার জন্যে দাম দিতে হয় অনেক। কন্তু তার সুখ একটা আলাদা।

দ্বৈপায়ন প্রায় নিজের সম্পর্কে অনেক কথাই ভাবে। কৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই একদিন তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সেদিনের অনেক কথাই তার মনে পড়ল। কৃষ্ণের কথাগুলো কানে বাজছিল: মহর্ষি, সবাইকে নিয়ে ভারতবর্ষ। মিলিত আর্য-অনার্যের দেশ এই ভারত। আমরা সে কথাটা ভুলে যাই। তবু কী অদ্ভুত ব্যাপার, এদেশের আদিবাসীদের কৃপার চোখে বল-গর্বিত আর্যরা। ফলে আদিবাসীদের সংস্কার, ধর্ম, সামাজিক নিয়মকানুন, উৎসব অনেক কিছুই ছেড়ে মিশে যেতে হচ্ছে আর্যদের সঙ্গে। ফলে বৈষম্য, বিভেদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়ছে। ভারতবর্ষের মূল স্রোত হল বৈচিত্র্যের

মধ্যে ঐক্য। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব এবং মৌল ব্যাপারটি কিন্তু আর্যরা বিচ্ছিন্ন করে একা চলতে চেষ্টা করছে। এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে? সকলে মিলে এক সঙ্গে না থাকলে, একে অন্যের হাতে হাত না রেখে সকলের ছোটখাট অমিল, সুবিধে-অসুবিধের কথা ভুলে না গেলে এক হওয়া কোনদিন যাবে না। এক না হয়েও যে কোন উপায় নেই, একথাটা কেউ গভীর করে ভাবে না। ভাবলে এত সমস্যা থাকত না। আজ কেউ দ্বীপের বাসিন্দা হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সে দ্বীপ বাস্তবের হোক আর মনের হোক। সেদিন নেই। পাণ্ডবেরা একথাটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। তাই তাদের সামনে রেখে মহামানবের মিলনের এক যজ্ঞ করব। রাজসূয় যজ্ঞ। এরকম যজ্ঞ আজ অবধি কেউ দেখেনি। সত্যি বলতে কি কেউ চায়নি। এক নতুন ভারতবর্ষের জন্য চাই নতুন নেতৃত্ব। একমাত্র মাটি-মাখা মানুষের সে অধিকার আছে। কারণ সে অনুকম্প চায় না, কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে না, মুখভরা হাসি নিয়ে মানুষের জন্যে কিছু করতে পারলে যারা খুশি হয় তাদের নেতৃত্ব দেবার অধিকার। একে তারা কর্তব্য মনে করে।

মুগ্ধতার দুটি চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছিল দ্বৈপায়নের। বলল: তুমি অনেক মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও শ্রদ্ধার পাত্র। বহু মানুষ বিশ্বাস করে তোমাকে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছে সে'ত তাদের মঙ্গল, কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে। তোমার মত আদর্শবাদী সজ্জন যদি সবাই হত তা-হলে পৃথিবীটা হত স্বর্গের চেয়েও মহৎ, কারণ মানুষের এমন অনেকগুণ আছে যা ভগবানেরও নেই।

কৃষ্ণ বলল: ভগবানের দোষ দিয়ে লাভ নেই। জোর যার মুলুক তার—এ'ত সনাতন নীতি। কি প্রকৃতিরাজ্যে, কি মানুষের সংসারে সর্বত্রই দুর্বলকে সবলের বশে থাকতে হয়। কিন্তু মানুষ নিজে নিজেই তার মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করে সমাজ সৃষ্টি করল। শান্তিতে, সুখে, মিলেমিশে একত্রে থাকার প্রতিশ্রুতিতে জীবজগতে তারা সর্বাধিক শক্তিমান হয়ে উঠল। কিন্তু শয়তান তাদের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি সইতে পারল না। তার কুদৃষ্টিতে মানুষের জীবন বিষিয়ে উঠল।

কতকগুলো চতুর, লোভী, স্বার্থপর কুচক্রী মানুষের কুটিল বুদ্ধির ফলে এ পৃথিবীটা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ল। হিংস্র জঙ্গলের জীবনের চেয়ে ভয়ংকর একরাজ্যে তাকে বাস করতে হয়। এ অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না।

দ্বৈপায়ন প্রশ্ন করল: এর পরিবর্তন ঘটাতে যতটা নিষ্ঠুর হওয়া দরকার, বাস্তবে কি তা সম্ভব?

কৃষ্ণ মধুর হেসে বলল: গায়ের জোরে নয়, প্রেমের জোরে, মানুষের হৃদয় পরিবর্তন কোন অসম্ভব ঘটনা নয়। মানুষ প্রেমের কাঙাল। প্রেমিক, ধার্মিক, বিবেকবান, স্বার্থহীন বিশ্বস্ত মানুষের সৎ-উদ্যোগের দ্বারাই এই দুরূহ কাজ করা অসম্ভব কিছু নয়। এ হল আদর্শবাদী নীতি। ইতিহাসে কখন সখন এমন মানুষ জন্ম নেয় যাদের কাছে নীতি ও আদর্শ সব কিছুর উপরে। পাণ্ডবেরা আমার বিচারে সেই শ্রেণীর মানুষ। তারা নেতৃত্বে এলে ভারতের কোন নৃপতির যে আপত্তি থাকবে না, আপনার চেয়ে বেশি কে তা জানে?

বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে গেল কৃষ্ণ। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল: ঋষিবর মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি, কেন এসব করছি? কাদের জন্যে করছি? এসব করে কি হবে আমার? যাদের জন্যে করা তারা কতভাবে আমার নিন্দে করে, কতরকম অপবাদ দেয়। তবু করি। এসব শুনে মনে হয়, তবে কি ভুল করছি? পশুপতি ভক্ত মহাবল জরাসন্ধকে হত্যা করা আমার ঠিক হয়েছে কি-না, কে জানে? তার মৃত্যুর জন্যে হৃদয় কাঁদে। ওর মধ্যে একরকমের চাপা নিষ্ঠুরতা আছে, এক অন্ধ পাশবিক নীরব ক্রোধও।

কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দ্বৈপায়ন বলল: কৃষ্ণ তুমি নিজে মহৎ বলেই একথা বলতে পারলে। জরাসন্ধকে হত্যা করা তোমার কোন অধর্ম হয়নি। ধর্মের নির্দেশে মানবিকতার প্রয়োজনে একজনকে হত্যা করে তুমি অনেকগুলো প্রাণ বাঁচালে। জরাসন্ধ ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ হয়ে পরাজিত নৃপগণকে পশুর মত হত্যা করবে বলে গিরিগুহায় বন্দী

করেছিল। তুমি দুঃসাহসী হয়ে জরাসন্ধের অমানবিক কাযের প্রথম বিরোধিতা করলে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ সাহস দেখাতে পারত না। প্রবল ধর্মবল তোমার পাথেয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পরম শত্রু জরাসন্ধের উপর কোন প্রতিশোধ তুমি নিজে নাও নি। নিয়তিই তার অদৃষ্টের বিচারক। ভীমের মত মল্লযোদ্ধাকে আত্মশ্লাঘা করে জরাসন্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে ভুল করল। তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল নিজের জীবন দিয়ে। এজন্য তোমার আত্মগ্লানি ভোগের যেমন কারণ নেই, তেমনি এ কোন অধর্ম-অনুষ্ঠান নয়। তা-ছাড়া বৃহত্তর একটি কল্যাণমূলক কাজের জন্য দু'একটা অন্যায় হওয়া দোষের নয়। একটা বড় কাজের জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়। বিনামূল্যে কখনও কিছু পাওয়া যায় না। তোমরা মত আমারও ইচ্ছে করে মুখোশপরা অত্যাচারী বদ মানুষগুলোকে এক এক করে শেষ করে দিতে। এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু সুন্দর মানুষরাই বেঁচে থাকুক। এইটেই সুন্দর হবে। অসুন্দর জঞ্জালদের সরিয়ে দেয়াটা একটা মহৎ কর্তব্যের মধ্যে পড়া উচিত বলে আমি মনে করি। একদিন এই কাজের জন্যে লোকে তোমাকে স্মরণ করবে পূজা করবে।

কৃষ্ণ হাসল। বলল: অমরত্বে আমার কোন লোভ নেই। আমি চাই মানুষ সুখী হোক, ধর্মে সুন্দর হোক।

কৃষ্ণ এই সব ভাবনার ক্ষমতা তাকে দিয়েছিল। দিয়েছিল এই অনাবিল চোখ, খোলা হাওয়ায়, প্রকৃতির মধ্যে, জীবনের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জীবনকে ভালবাসার এক তীব্র তাগিদ। কৃষ্ণ কৃষ্ণই। তার অনেক দোষ ত্রুটি থাকলেও সেগুলো দ্বৈপায়নের চোখে বড় হল না। কারণ বৃহৎ কাজের মূল্য অনেক মূল্য দিয়ে মেটাতে হয়। এই মূল্য অতীতে অনেককে দিতে হয়েছে। রামচন্দ্র তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। প্রহ্লাদ আদর্শের জন্যে, সত্যও ধর্মের জন্য সত্য ও ধর্মের জন্যে পিতৃ হওয়ার কারণ হয়ে আছে। একসঙ্গে এত পুরনো কথা একসঙ্গে কেন যে দ্বৈপায়নের মনে ভীড় করল, কে জানে? জীবনের শেষে এসে যখন হিসাব নিকাশ হয় তখন সাফল্যের পরিমাণ যার যত বেশি

লোকে বলে সকল পুরুষ সেই-ই।

ঝরঝর শব্দে ঝরনার জল বয়ে যাচ্ছিল। তার একটানা জল ভাঙার শব্দে দ্বৈপায়ন আনমনা হয়ে পড়েছিল। নিজের অস্তিত্ব, ঝরণার অস্তিত্ব পড়ন্ত সূর্যের নিষ্প্রভ আলোয় বনের বিষণ্ন অস্তিত্ব সবই তার চোখের সামনে থেকে চেতনার মধ্যে থেকে হারিয়ে গেছিল। আর সে তার অবচেতনে, অতীতের বহু দৃশ্য ও ঘটনার মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল বহু বছর মাড়িয়ে গিয়ে।

শিষ্যের আচমকা ডাকে দ্বৈপায়ন চমকে উঠেছিল। কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নানা ঘটনা অলস গন্তব্যহীন অবসরে দ্বৈপায়নের মনে আসে একে একে। ছবির মত। রাজসূয় যজ্ঞের দায়িত্ব যুধিষ্ঠির একে একে বণ্টন করল ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বান্ধবদের। যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতার প্রশংসা করল পিতামহ ভীষ্ম। বিপুল হর্ষধ্বনি করে সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ ভীষ্মকে স্বাগত জানাল। কোলাহল প্রশমিত হলে যুধিষ্ঠির সবিনয়ে বলল: শ্রদ্ধেয় অতিথিগণকে এখনো আরো একটি দায়িত্ব বণ্টনের কথা বলা হয়নি। কোন ক্ষত্রিয় বীর অথবা নৃপতি যদি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদের পাদ-প্রক্ষালনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি থাকেন, তা হলে তাঁর ওপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করে আমি নিশ্চিত হতে পারি।

যুধিষ্ঠিরের আবেদন সকলে মুখ টিপে হাসল। কেউ কোন কথা বলল না। সভা নিস্তব্ধ। সূঁচ পতনের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। প্রত্যেক ক্ষাত্র রাজা এক বীর এ ওর মুখ নিরীক্ষণ করে নীরব থাকল। কেউ টিপ্পনী কাটল। কেউ বা নীচু স্বরে ফিসফিস করে যুধিষ্ঠিকে পাগল বলল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটার পর কৃষ্ণ আসন থেকে উঠে দাঁড়াল। এবং সবিনয়ে বলল: মহারাজ যদি এই পবিত্র কাজটির দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে কৃতার্থ করেন তা-হলে আমি ধন্য হয়ে যাই।

অমনি পিতামহ ভীষ্ম চমৎকৃত হয়ে বলল : ধন্য ধন্য কৃষ্ণ। এই সভায় তোমার মত সেবাপরায়ণ নিরহংকারী ব্যক্তির পক্ষেই এই মানায়। সত্যিই তোমার কোন তুলনা হয় না। তুমি যথার্থ মহান, যথার্থই পুরুষোত্তম। লোকে তোমাকে বলে, মহান, দেবচরিত্রের মানুষ। সত্যিই তুমি তাই। বয়সে অনুজ হলেও তোমাকে আমার শতকোটি প্রণাম।

রাজসূয় যজ্ঞে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালনের দায়িত্ব কৃষ্ণ কী গভীর আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগল। সকলে তাকে সাধু সাধু করল। কৃষ্ণের প্রশংসায় ব্রাহ্মণ, মুণি, ঋষিরা পঞ্চমুখ হল।

রাজসূয় যজ্ঞে কাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ দেয়া হবে এই জটিল বিবেচনার ভার যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে অর্পণ করল। কারণ তিনি সকলের অগ্রজ, জ্ঞানবৃদ্ধ, এবং সর্বপূজ্য। ভীষ্ম কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বলল : এখানে অর্ঘ্যলাভের যোগ্য ব্যক্তি অনেকেই আছেন। কিন্তু সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি একজনেই আছেন। যাঁর ইচ্ছেয় এই যজ্ঞস্থল সর্বজাতি ও সর্বমানবের মিলনভূমি হয়ে উঠল, যাঁর চরিত্র মাধুর্য, নিরহংকার ব্যক্তিত্ব সকলকে পরিতৃপ্ত করল, যাঁর সান্নিধ্যও বনে শ্রবণে হৃদয় ব্যাকুল হয় সেই কৃষ্ণ ছাড়া আর কারো কথা আমার মনে আসছে না। জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে ভাস্কর তেমনি সমাগত সকল জনের মধ্যে তেজ, বল, পরাক্রম এবং মানবিকতায়, পরহিতৈষণায়, নিরহংকারে মানে-মর্যাদায়, চরিত্র গৌরবে কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। তারই জন্যে এই সভা আলোকিত ও আহ্লাদিত হয়েছে। তুমি তাঁকেই ঐ অর্ঘ্যদান কর।

ব্রাহ্মণেরা উৎফুল্ল হয়ে হর্ষধ্বনি করতে লাগল। চতুর্দিকে সমস্বরে সাধু সাধু করে উঠল। স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনিতে যজ্ঞভূমি গমগম করতে লাগল।

সহসা সে জয়ধ্বনি বিদীর্ণ হল চেদীরাজ শিশুপালের কর্কশ কণ্ঠস্বরে। স্তম্ভের গাত্রে প্রতিধ্বনি যজ্ঞভূমি কাঁপিয়ে তুলল। এক নিমেষে স্তব্ধ হল উচ্ছ্বাস, উল্লাস, উত্তেজনা এবং আনন্দ।

চেদীরাজের দু'চোখ হিংস্র শার্দুলের মত জলজ্বল করছিল। ক্রোধে তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল। অবরুদ্ধ উত্তেজনায় বুক উঠানামা

করছিল। ঘৃণায় ধিক্কারে তার অধর যুগল কুঞ্চিত হল। বলল : ধিক আপনাকে পিতামহ। একদিন কঠিন সত্য পালনের জন্য আপনার নাম হয়েছিল ভীষ্ম। কিন্তু ও-নামে যোগ্য নন আপনি। কৌরবের অন্নদাস হয়ে আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তাদের সাথে। আপনি মিথ্যাবাদী। বিশ্বাসহন্তা। আপনার মুখ দর্শনও পাপ।

তারপর, রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে বলল : কৌন্তেয় তোমার ছলনা, চক্রান্তের কোন তুলনা নেই। তুমি ধর্মের মুখোসধারী এক অধার্মিক ভণ্ড। তোমাকে চিনতে ভুল হয়েছে আমাদের। কৌশলে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মান দেবার জন্যে কুট-কৌশলে সকলকে একত্র করে, তাদের সকলের সামনে নির্লজ্জ কৃষ্ণপূজা করলে। এখানে কৃষ্ণের চেয়ে অনেক গুণের অধিকারী, মর্যাদাশালী বয়ঃজ্যেষ্ঠ প্রবীণ যোদ্ধা ও রাজা ছিল। কিন্তু তুমি কৌশলে পিতামহ ভীষ্মকে দিয়ে তাদেরকে নিজস্ব গৌরব থেকে বঞ্চিত করলে। এ অধিকার তোমাকে কে দিল? যে জরাসন্ধর মত বীর সম্রাটকে অত্যন্ত হীন উপায়ে, নীচ কৌশলে বধ করল সেই অধর্মচারী ভীরু কৌশলী, দুরভিসন্ধিপরায়ণ কৃষ্ণকে অর্ঘ্য দিয়ে এই যজ্ঞের পবিত্রতা, গৌরব নষ্ট করলে। তুমি আর নিরপেক্ষ নও। ছিঃ! রাজ চক্রবর্তীর লোভে কৃষ্ণের দাস হয়ে থাকতে তোমার লজ্জা করল না। নিজের গৌরব, সুনাম, মর্যাদা, বিবেচনা, সত্য, ধর্ম, আদর্শ সব বিসর্জন দিয়ে এমন দীনভাবে যে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় সে করুণার অযোগ্য। তার ধ্বংস অনিবার্য।

যুধিষ্ঠির রাগল না। তার ধৃষ্টতা ও মূর্খতা দেখে হাসল। বলল : মহামান্য চেদীরাজ আপনিও একদিন কৃষ্ণের করুণা এবং দায় নিয়ে বেঁচে উঠেছিলেন। সেদিন কৃষ্ণ সদ্যোজাত শিশুটির মুখে মুখ দিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটি না করত, তা-হলে এই বীর পুঙ্গবের দম্ভ, স্পর্ধা কোথায় থাকত? কৃষ্ণের দ্বারা পালিত হয়েই নবজীবন লাভ করেছিলেন বলেই পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবা কৃতজ্ঞতা বশতঃ আপনার নাম রেখেছিল শিশুপাল। আপনি অকৃতজ্ঞ। পাছে কৃষ্ণের

দয়ার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই তাঁর মাহাত্ম্যকে চাপা দেবার জন্যেই এভাবে কৃষ্ণ বিরোধিতা করেন। সত্যি আপনি করুণার অযোগ্য।

শিশুপাল ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত হুংকার ছাড়ল: যুধিষ্ঠির।

চেদীরাজ কৃষ্ণের মধ্যে যে ঈশ্বররূপী ভগবান আছেন, তোমার মত পাপী-তাপীর চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। কৃষ্ণের মধ্যে যে অনন্ত, ঐশ্বর্যময় ভগবান আছেন তাঁর কাছে একজন পরম ভক্তের মত আমার সব বোধ, বুদ্ধি, ধর্ম, কর্ম সমর্পণ করে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করছি না। বরং, পরিতৃপ্তিতে আমার হৃদয় মন জুড়ে বেজে যাচ্ছে এক অফুরন্ত সুখ। ঈশ্বরের করুণা, আশীর্বাদ অন্তরে অনুভব করার যে কি সুখ, তোমার মত নরাধম কোনদিন তা জানতে পারবে না। কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করবে। পিতামহ ভীষ্ম আমার মতই তাঁকে জগতের পরিত্রাতা বলে মনে করেন।

ঘৃতাহুতি দেয়ার মত জ্বলে উঠল শিশুপাল। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলল: বন্ধুগণ ভাবতে অবাক লাগে কৃষ্ণের মত শঠ প্রবঞ্চকে যুধিষ্ঠির ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে ঈশ্বরকেই অসম্মান করল। পিতামহের মত জ্ঞান-বৃদ্ধ কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য কেমন করে দিলেন আমার মত অনেকের মাথাতে আসছে না। বৃদ্ধ বলেই তাঁর মতিভ্রম ঘটেছে। অবশেষে পিতামহও কৃষ্ণের একজন স্তাবক হয়ে গেলেন। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁকে জাদু করেছে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই কৃষ্ণ কিন্তু নির্বিকার। সমস্ত ঘটনাটা কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করছিল। আর মৃদু মৃদু হাসছিল। কৃষ্ণের নির্বিকার মনোভাব শিশুপালের দম্ভে লাগল। ক্রোধ ও অহংকারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে শিশুপাল কৃষ্ণকে বিদ্রূপ করে বলল: ছিঃ! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য লাভের এত কাঙাল তুমি? লোকে তোমাকে নির্লোভী বলে জানে। এই কি নমুনা তার? ভিখেরীর মত হাত পেতে, লোকের এত কটূক্তি সয়ে এই অর্ঘ্য নিতে তোমার লজ্জা করে না? তোমার কি আত্মসম্মান জ্ঞান বলে কিছু নেই? তুমি মানুষ, না পাথর? নির্লজ্জ লোভ কাপুরুষতা ভীরুতা তোমার

এতকালের ভাবমূর্তিকে কোথায় নামিয়ে আনল তার হিসাব করে দেখছ কখনও? কৃষ্ণ, তোমাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমার নেই।

শিশুপালের নাটকীয় ভাষণের প্রতিবাদ করে পিতামহ ভীষ্ম বলল: শোন মূঢ়, তুই নিজে দুর্মতি, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ। কৃষ্ণের গুণরাশি দেখার চোখ থাকলে তুই দানব না হয়ে মানুষ হতিস। তেজ-বলে, পরাক্রমে, বিনয়ে, নিরহংকারে কৃষ্ণের সমতুল ব্যক্তি একজনও নেই এখানে। ভূ-ভারতেও না। তাঁর মত নির্লোভ, নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ আমার এত বয়সে একজনও দেখিনি। রাজ্যে তাঁর লোভ নেই, সিংহাসনে আসক্তি নেই, নারীতে মোহ নেই, ঐশ্বর্যে স্পৃহা নেই—এক অদ্ভুত আশ্চর্য সুন্দর দেব চরিত্রের মানুষ। এখানে অনেক মহীপাল উপস্থিত যাঁরা কৃষ্ণে তেজ বলে পরাভূত। কিন্তু কারো রাজ্য তিনি অধিকার করেনি। নির্লোভ চরিত্রের মানুষ বলেই এই ত্যাগ তাঁকে মানায়। মানুষের হিতের জন্যে, কল্যাণের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। পৃথিবীটা মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার কথা কোন নৃপতি ভেবেছে? কোন নরপতি জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণের বৈষম্য দূর করার কথা ভেবেছে? মানুষের প্রভেদ কৃষ্ণ মানে না। তাঁর কাছে নিখিল অন্য ব্রহ্মময় বিশ্ব স্রষ্টার কাছে সবাই সমান। তাই এই মহাজ্ঞের অতিথি আর্য-অনার্য; উচ্চ নীচ ধণী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সবাই। মানুষের পূজা করতে স্বেচ্ছায় সকলের পাদ প্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করেছে। কোন ব্যক্তির চরিত্রে এই বিনয়, নম্রতা, মহত্ব আছে? কৃষ্ণ নিজগুণে মানুষের হৃদয়ের দেবতা হয়ে উঠেছেন। লোকে তাঁকে পূজা করে। কৃষ্ণই যথার্থ জনগণের গণ-দেবতা। কৃষ্ণই পুরুষোত্তম। যাকে দেখলে আনন্দ হয়, সান্নিধ্যে সুখ লাভ হয়, বিচ্ছেদে হৃদয় কাতর হয়, সেই প্রেমিক মানুষ ছাড়া আর কারো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য পাওয়ার অধিকার নেই। আমি সবদিক বিবেচনা করে তাঁকেই অর্চিত হওয়ার যোগ্য মনে করেছি। এই যোগ্যতা কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন ব্যক্তির নেই।

ভীষ্মের কথা শোনার ধৈর্য ছিল না শিশুপালের। সে যজ্ঞ পশু

করতে অনুগামী রাজন্যবর্গকে নিয়ে রণে মেতে উঠল। তখন চারিদিক হৈ-চৈ, গণ্ডগোল, ছড়োছড়ি পড়ে গেল। ভীমের কণ্ঠস্বর সেই চেঁচামেচি ছুটোছুটির ভেতর চাপা পড়ে গেল।

অগ্নি যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, তেমনি কৃষ্ণের নির্বিকারত্ব শিশুপালকে চারদিকে আকর্ষণ করতে লাগল। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে শিশুপাল কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল।

রাজসূয় যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করতে কৃষ্ণ ধৈর্য ধরেছিল। শিশু-পালের আস্ফালন, গালমন্দ, তিরস্কারকে নীরবে মেনে নিচ্ছিল। কিন্তু তাঁর নীরবতাই শিশুপালকে অধৈর্য ও উন্মত্ত করে তুলল।

শিশুপাল সত্যিই যজ্ঞ নষ্ট করার মহোৎসবে যখন মেতে উঠল তখন মনে হল, জাতি, বর্ণ, ধর্মের বাইরে সমগ্র ভারতবাসীকে নিয়ে এক জাতি, এক প্রাণ-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে যে ঐক্যবদ্ধ ভারতভূমি গঠনের আশৈশব স্বপ্ন ছিল; শিশুপাল সেই স্বপ্নের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হলে কৃষ্ণের ধৈর্য এবং সংযম চলে গেল। এতদিনের এত প্রচেষ্টা প্রত্যাশা, উদ্যম, উদ্যোগ কি তার সব ব্যর্থ হয়ে যাবে? স্বর্গ কি হবে না কেনা? ব্যর্থ হবে কি দেবতার আশীর্বাদ? তীরে এসে ভরা তরী ডুববে? কৃষ্ণের ভেতরটা তোলপাড় করতে লাগল।

নীরবতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণ গর্জে উঠল যজ্ঞ ভূমির মধ্যস্থলে। বলল: ক্ষত্রকুলগ্লানি শিশুপাল তোর আস্ফালন কত সইবে? সেতোর শৈলও রৌদ্র তেজে উত্তপ্ত হয়। তুইও আমাকে শান্ত থাকতে দিলি-না। ক্ষমতালোভী পামর তোর সংগ্রাম সাধ অবশ্য মেটাব। পাণ্ডবের মত তুইও আমার পরম আত্মীয়। তবু পাণ্ডবদের সঙ্গে তোর প্রভেদ কত? তোকে আত্মীয় বলতে লজ্জা করে। বৃষ্ণিবংশের সন্তান, মনে করতেও ঘেন্না হয়। এতক্ষণ আমি তোর স্পর্ধা দেখছিলাম। ধর্মরাজের ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত ঘটাতে যখন উদ্যত হয়েছিস তখন বিঘ্ন উৎপাদনকারী নরঘাতককে আর কোন ক্ষমা করব না। তুই ক্ষমার অযোগ্য। বৃষ্ণি বংশের সন্তান হয়েও আমার ও

বলরামের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে স্বজাতিকে জীবন্ত দগ্ধ করতে চেয়েছিস, তাদের আশ্রয়হীন করেছিস। শুধু বংশের ছেলে বলে তোর সেই জঘন্য, অমার্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করেছি। কুলবধূ বভ্রুর ভার্যাকে পথিমধ্যে হরণ করে, ধর্ষণ করার অপরাধে পিতৃস্বসা শ্রুতশ্রবার কাতর আবেদনে তোর পাপের কোন শাস্তি দেয়নি। আমার ছদ্মবেশ ধরে ভগিনী সুভদ্রাকে অপরের লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে হরণে উদ্যত হয়েছিলি। আমার ভার্যা রুক্মিণীকে ভোগ করার লালসায় তুই উন্মত্ত হয়েছিলি। তোর শত শত জঘন্য অপরাধের আর কত কীর্তন করব? এখন তুই একজন ধার্মিকের ধর্মকাযে ব্যাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিস। যে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, সত্যের জন্যে আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছি, সাধুর মত থেকেছি, সেই ধর্মের অবমাননা কিছুতে সইব না।

বলতে বলতে কৃষ্ণের শান্ত সুন্দর মুখশ্রী সহসা ক্রোধে ঘৃণায় রূপান্তরিত হল। মুখে রক্তিম আভা। চোখ জবাফুলের মত লাল। দৃষ্টি হল তীক্ষ্ণ। মনে হল, স্বয়ং মহাকাল যেন তার শরীরে ভর করেছে। প্রলয় অগ্নি-যেন নির্গত হতে লাগল তার চোখ থেকে। কৃষ্ণের এই করাল মূর্তি আগে কারো দর্শনের সুযোগ হয়নি। কৃষ্ণের মত শান্ত, সুন্দর মানুষ রাগলে যে কত ভয়ংকর দেখায় তা দেখে সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। ঐ ভীষণ দৃষ্টির সম্মুখে তারা কেমন জড়বৎ হয়ে গেল। ভয়ে চোখ বুজল।

শিশুপাল আস্ফালন করে বলল: ছিঃ! এতগুলো মানুষের সামনে নিজের ভগিনী ও ভার্যাকে নিয়ে এত বেহায়াপনা করতে তোমার লজ্জা করল না। তোমার আত্মসম্ভ্রমবোধ থাকলে ঘরের কথা এভাবে বলতে পারতে না। তুমি এতই নির্লজ্জ! কণ্ঠ থেকে তার সব কথা সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল না।

কৃষ্ণের মনে চকিতে ভেসে উঠল বোধ হয়, পুষ্পের মত শুচিস্নিগ্ধা নিষ্পাপ ভগিনী ভদ্রা এবং তার বধূ রুক্মিণীর মুখ। উভয়কে বধূরূপে পাওয়া শিশুপালের প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু আশাহত হওয়ায়

ব্যর্থতা ভুলতে সে হীন পথে নিজের ইচ্ছে চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। তাই তাদের নামোচ্চারণে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত কিংবা লজ্জিত হল না। বরং উল্টে কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করল। বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করল। অপমানে কৃষ্ণ ধৈর্যহীন হল। প্রজ্বলিত দুই চোখের তেজ তার সব বলবীর্যকে হরণ করে নিল। সহসা ভয়ে ম্রিয়মান হল। প্রস্তরবৎ আচ্ছন্নতা নিয়ে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। কৃষ্ণ ঐ অবস্থাতেই তাকে মহাকালরূপী ভয়ংকর সুদর্শন চক্রের দ্বারা আঘাত করল। সেই প্রচণ্ড আঘাত প্রতিহত করার কোন সুযোগ পেল না শিশুপাল। ছিন্নমুণ্ড হয়ে ধরাশায়ী হল। পাপরূপী শিশুপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল যজ্ঞভূমি। আর সেই জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করে যেন মিশে গেল শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে।

ঘটনা এত দ্রুত ও আকস্মিক ছিল যে কারো কিছু ভেবে ওঠার আগেই নিমেষে চোখের সামনে ব্যাপারটা ঘটে গেল। কোন মানুষী-শক্তিতে এত বড় একটা কাণ্ড এত সহজে সম্পন্ন হয় না। কৃষ্ণের একরূপ দেখে কেউ বিস্মিত, বিমোহিত, বিভ্রান্ত, কেউ ভক্তি-পুলকিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে লাগল। কেউ ভক্তের তদগত চিত্তে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু আশ্চর্য সেই মুখমণ্ডলে ভয়ংকর রূপের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। কী প্রসন্ন, প্রশান্ত, গম্ভীর! সেখানে নেই ভয়াল বজ্রের বিদ্যুল্লেখা। নেই ভয়ংকর আহ্বান। বৃন্দাবনের কালিন্দীর কালো জলে যেদিন কালীয় নাগের বল-বীর্য হরণ করেছিল সেদিনও মুখে ছিল এমনি প্রশান্ত স্নিগ্ধতা, চরণে ছিল মহাকালের মঞ্জীর ধ্বনি: মৃত্যুর মত ভয়ংকর নয়, জীবনের মত সুন্দর। কৃষ্ণের এ এক অপরূপ মূর্তি। এক-দিকে মূর্তিমান হিংসা, অপরদিকে মূর্তিমান আনন্দ, একদিকে মহা ভয়ংকর, অপরদিকে পরমসুন্দর। ছিন্ন মুণ্ড শিশুপালের কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ স্বরে শূন্যলোক থেকে আকাশবাণীর মত ধ্বনিত হল: ওগো সুন্দর, ওগো দর্পহারী, মার্জনা কর আমাকে। তোমাকে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান বলে স্বীকার করে নিতে আর কোন বাধা নেই আমার। তুমিই

আমাকে তোমার পরম শত্রু করেছ। সেই শত্রুতা করেই তোমাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়েছি। আর তো আমার কিছু নেই। এবার আমাকে তুমি করুণা কর। আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমার আত্মার শান্তি কামনা করো।

কৃষ্ণ শিশুপালের ছিন্ন মুণ্ডের দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে উচ্চারণ করল : সর্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তি সা মা শান্তিরেধি।

ঐ অদ্ভুত দৃশ্যটি উপস্থিত দর্শকদের মনে ও চোখে গেঁথে গেল। ঐ ঘটনাটা যতদিন মানুষের মনে থাকবে ততদিন কৃষ্ণের ঐশ্বরিক ক্ষমতার কথা কেউ ভুলবে না। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ তাতে কোন সন্দেহ রইল না। লোকের বিশ্বাস জন্মাল কৃষ্ণকে যে অনুসরণ করে, বিশ্বাস করে, সর্বস্ব সমর্পণ করে শরণাগত হয়, কৃষ্ণ, তার প্রতি সখা পাণ্ডবদের মত সর্বদা সদয় থাকে এবং তাকে সর্ব বিপদ ভয় থেকে রক্ষা করে। কৃষ্ণ জীবন ও মৃত্যুর এপিঠ-ওপিঠ। এক হাতে মৃত্যু, অপর হাতে জীবন, অনাদি অনন্ত আনন্দলীলা। শিশুপালের মৃত্যু, হল কৈ? মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়ে সে প্রবেশ করল শাশ্বত অমৃতলোকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য কৃষ্ণকে তাই যুধিষ্ঠির দিল না, নিজের জীবন দিয়ে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের চরণে শ্রেষ্ঠতম অর্ঘখানি হৃদয়ের পূর্ণতম ভক্তিরসে সিক্ত করে অঞ্জলি দিয়ে গেল। শিশুপাল না থাকলে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির অর্ঘ্যের মহিমা প্রকাশ করত কে?

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের আশ্রিত অনুগত এবং শরণাগত। কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় তাদের সব দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করল। কৃষ্ণের অনন্ত করুণায় পাণ্ডবেরা ভরপুর হয়ে উঠল। কেমন করে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরে তার চিন্তা কৃষ্ণের। কি করলে তাদের গৌরব মর্যাদা বাড়ে, কি-সে উন্নতি হয়—এসবই কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে হল। একেবারে সামান্য সাধারণ অসহায় অবস্থা থেকে তুলে এনে কৃষ্ণ তাদের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্য

ও সিংহাসনে বসল। রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠিরকে ভারত সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করল। বিপুলবিত্ত, সম্পদ, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী করল। যে কোন নরপতিরই তা ছিল ঈর্ষার। দুর্যোধনও ঈর্ষান্বিত হল।

কিন্তু কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্যে এত করতে গেল কোন কারণে তার রহস্য দুর্যোধনের মত অনেকেই ভেদ করতে পারল না। অথচ একটু ইচ্ছে করলেই কৃষ্ণ নিজেই হতে পারত ভারত সম্রাট। তবু কৃষ্ণ সেই আগ্রহটুকু একবারও দেখল না। নিজে সে নির্লোভ এবং স্বার্থহীন এটা প্রমাণ করার জন্যে এই ত্যাগটুকু দেখানোর কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হল না। এই 'হারমানা হার' যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে পরিয়ে সে কোন পরমানন্দ পেল ? এই ত্যাগের যে সুখ এবং আনন্দ কৃষ্ণের সেই প্রেমরাজ্যের খবর অন্যদের অজ্ঞাত বলেই বাস্তব লাভ লোকসানের স্থূল বিশ্লেষণে তারা মগ্ন রইল।

লেখনী ঠোঁটের প্রান্তে ছুঁয়ে দ্বৈপায়ন কি ভেবে মুখ তুলল। অজান্তে নিজের মনে হাসল। বড় বড় চোখ মেলে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইল। তার দু'চোখের দৃষ্টি স্থির। প্রশান্ত মুখমণ্ডলে জ্যোতির্ময় দীপ্তি। ভোরের নম্র রোদে শান্ত নির্জন বনভূমি কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। এই আলোছায়া, মেঘ, রোদ্দুর, পাখির ডাক, ঘাসের গন্ধ, আকাশের নীল, নদীর জলের মেটে রঙ সব কেমন অপরূপ আর সুন্দর লাগছিল। বসে বসে ঐ সব দৃশ্য দেখতে আর ঘ্রাণ নিতে নিতে সময়টা যে কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল জানতেই পারল না দ্বৈপায়ন।

সময়টা স্থির হয়ে নেই। মনটাও চুপ করে ছিল না। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্নায়ুকে সচেতনতার চরমে পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে মনের অভ্যন্তরে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার মধ্যে যাওয়া আসা করছিল। কিন্তু বাইরের থেকে তা বোঝার উপায় ছিল না। লেখার সময় এরকম একটা মানসিক অবস্থা প্রায়ই হয় দ্বৈপায়নের। তখন মনের ভেতর নিরন্তর একটা অতৃপ্তি জন্মে। দ্বৈপায়নের মনের অভ্যন্তরে অপ্রাপ্তিজনিত সেই অতৃপ্তিই তাকে কষ্ট দিচ্ছিল। এখন কৃষ্ণ

পাণ্ডবদের ভাবনাটা তাকে পেয়ে বসল।

অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে পৃথার পুত্রেরা জীবনে দাঁড়াল। কিন্তু গর্ব করে বলার সত্যি কিছু ছিল না তাদের। তাদের যা কিছু পাওয়া জীবনভোর তা ছিল মুনি-ঋষি এবং কৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া। শত শৃঙ্গ পর্বত থেকে পৃথা যেদিন পুত্রদের নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরল সেদিন মুনি-ঋষিদের দয়া অনুকম্পা এবং সহযোগিতা না পেলে ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের প্রাসাদে তাদের ফিরিয়ে নিত না। করুণা করে যা পাওয়া যায় তাতে জোর খাটে না। জলের নিচে দিনের আলো যেমন কাঁপে তেমনি একটা মহৎ কর্তব্যবোধের দড়িতে টান টান হয়ে অনুকম্পা কম্পিত হতে থাকে। জোর করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দয়া-দাক্ষিণ্যের কথায় ইজ্জত নাড়া খায়। তখন গোটা সম্পর্ক এবং কর্তব্যবোধের তেত বাঁধন থেকে মুক্তির জন্যে আকুল হয়ে উঠে প্রাণ। উভয়েই মুক্তিখোঁজে। একদিন অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছিল ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পৃথার পুত্রদের। বারণাবতে যাওয়ার কারণ ঐ একটাই। জতুগৃহ দাহ ছিল ঐ কারণের পরিণতি।

ভাগ্যচক্র ঘুরতে আবার দীর্ঘকাল লাগল। পাণ্ডবদের চেষ্টায় ঘুরল না। বিদুর এবং দ্বৈপায়ন ছিল তার নেপথ্যে। রাজা দ্রুপদ এবং কৃষ্ণই ছিল অগ্রে। বলতে কি কৃষ্ণই সব। পাণ্ডবদের সবটাই ঘিরে আছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া তাদের জীবন অচল এবং অন্ধকার। তাদের জীবনে কৃষ্ণ কে কত অপরিহার্য ছিল, পাণ্ডবেরা নিজেরাও বোধ হয় জানত না। ঈশ্বরই একদিন জানিয়ে দিল। রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরে যুধিষ্ঠির তা বড় বেশি করে টের পেল।

যুধিষ্ঠির তখন ভারত সম্রাট। তার সামনে বিশাল কর্মক্ষেত্র, অনন্ত জীবনের আহ্বান। ঈশ্বর পাণ্ডবদের অনেক কিছু দেয়নি, আবার দিয়েছেও অনেক কিছুই। ভাবনার ক্ষমতা দিয়েছে, দিয়েছে এক অনাবিল চোখ, খোলা হাওয়ায় প্রকৃতি ও জীবনের মধ্যে নাক মুখ ডুবিয়ে জীবনকে ভালবাসার এক তীব্র তাগিদ। তাই তাদের প্রতি কৃষ্ণ একটা টান অনুভব করে। ওদের প্রত্যেকটি ভাইর চঞ্চল প্রাণবন্ত

চোখে কোনো মেকী ব্যাপার নেই, ভণ্ডামি নেই। ওরা মিথ্যে নয়, প্রাণের ও জীবনের প্রতীক। ওদের দেখে কৃষ্ণের মনে হয়েছিল এরা ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধি। এদের বল, বীর্য তেজের মধ্যে ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিহিত। তাই শ্রেষ্ঠ সম্রাটের পদে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করে এক বিপুল কর্মের দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত করল। কারণ, তাদের কাছেই কৃষ্ণের আগামীকালের যত প্রত্যাশা ও ভরসা।

কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই প্রত্যাশা কতখানি পূরণ করতে পেরেছিল তার যোগ-বিয়োগ করে সন্তুষ্ট হওয়ার মত কিছুই ছিল না দ্বৈপায়নের। বরং হতাশ হতে হল তাকে। সত্যি বলতে কি, যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কুট বুদ্ধি, কর্মে ক্ষিপ্রতা, ব্যক্তিত্ব, তেজ এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকলে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক হওয়া যায় যুধিষ্ঠিরের তা ছিল না। নিখাদ ভালমানুষকে দিয়ে বড় জোর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করা যায়। যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে কৃষ্ণ সেই রাজনীতিটুকু করতে চেয়েছিল। একটা পরিবর্তনের হাওয়া বইয়ে দেয়ার জন্যে তাকে ভারত সম্রাট করল। কারণ তার সততা ও সরলতার প্রতি সব নরপতির শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল। কৃষ্ণ তাকে মূলধন করে অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখল। লোভে কিংবা স্বার্থে নিজেকে পাদপ্রদীপে এনে একটি শুভ কর্মানুষ্ঠানকে বিতর্কের বস্তু করে তুলল না। কিন্তু এত বড় একটা দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা যুধিষ্ঠিরের কতখানি ছিল কিংবা আদৌ ছিল না। কৃষ্ণ কোনদিন তাকে টের পেতে দেয়নি। কৃষ্ণ তাকে ছায়ার মত আবৃত করে রেখেছিল। যুধিষ্ঠিরও নিজের যোগ্যতা নিয়ে কখনও কিছু ভাবেনি।

সংকট ঘনিয়ে উঠল কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে। কৃষ্ণের অনুগ্রহ ও কৃপা নিয়ে সে ভারত সম্রাট, নিজের অর্জিত কোন গৌরবে নয়—এই বোধটা যুধিষ্ঠিরকে কাঁটার মত বিঁধেনি কোনদিন। এখন চারপাশের মানুষ উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে যখন তার দিকে করুণার চোখে তাকায় তখন মনটা ধাঁৎ করে উঠে। কেমন একটা সন্দেহ ঘুলিয়ে উঠে

মনে। কারণ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিয়ে তার নিজের মনেও কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাকে নিয়ে যে একটা কিছু হচ্ছিল বুঝতে পারছিল না। তাই একটা ভয় এবং দুশ্চিন্তা তার সব সময় ছিল।

রাজনীতি বড় নয়। বড় ঝড়-ঝাপ্টার। কখন যে কোন দিক থেকে ঝড় এসে সব কিছু তছনছ করে দেয়, আগাম জানার সময় পর্যন্ত হয় না। এখানে প্রতিমুহূর্ত অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা একটা উদ্বিগ্ন, অসহায়তা নিয়ে কাটাতে হয়। রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপ্টা সময় সুযোগের গর্ভে সুপ্ত থাকে। আঘাত হানার উপযুক্ত সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে প্রতিপক্ষ। এইজন্যে যারা কৃষ্ণের মত মহৎ কিছু করার পরিকল্পনা করে, তাদের স্বপ্ন আদর্শ, মিথ্যাচারী ভণ্ড পৃথিবীতে শুধু হেনস্তা হয়। কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরকে অনুরূপ হেনস্তা হতে হল।

কৌশলটা ছিল বড় অদ্ভুত। রাজসূয় যজ্ঞের ইন্দ্রপ্রস্থে দ্বারকার গণ-মুখ্যরা সবাই এসেছিল। কার্যত, দ্বারকা ছিল অরক্ষিত। প্রতিবেশি রাষ্ট্র দ্বারা দ্বারকা আক্রান্ত হতে পারে এরকম শত্রুতা কিংবা তিক্ততা কারো সাথে ছিল না। তথাপি ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থানকালে সিন্ধু দেশের রাজা শাল্ব দ্বারকা বিধ্বস্ত করল। গ্রামকে গ্রাম এবং নগরকে নগর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঘর-বাড়ি ভেঙে তছনছ করে মানুষের রক্তে রাঙিয়ে দ্বারকাকে শ্মশান করল। সে খবর ইন্দ্রপ্রস্থে পৌছনোর পরেই কৃষ্ণ দ্বারকায় রওনা হল। এবং দীর্ঘ কাল ধরে শাল্বের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ চলল। এর-ভেতর কৃষ্ণের সময় হল না ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার।

কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে যুধিষ্ঠির খুব বিপন্ন এবং অসহায় বোধ করল। নিজেকে তার বড় একা লাগল। চারপাশে এমন একটা অস্বস্তিকর পারবেশ তৈরী হল যার জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না। কৃষ্ণ-বিদ্বেষী রাজনৈতিক চক্র যে একটা কিছু ভেতর ভেতরে করছিল এটা বুঝতে পারছিল যুধিষ্ঠির। কিন্তু প্রতিকারের জন্যে কি করলে ভাল হয় এটাই বুঝে উঠতে পারল না যুধিষ্ঠির। পারবে কোথা থেকে? এসব কাজ কৃষ্ণই করল। এই মুহূর্তে তার তীব্র অভাবটা যুধিষ্ঠিরকে

বিচলিত করল। এদিকে একটা রাজনৈতিক ঝড় যেয়ে আসছিল তার দিকে। এথেকে পরিত্রাণ কিংবা নিক্রমনের পথ দেখতে পেল না যুধিষ্ঠির। আবার কিছু করারও ছিল না তার। একে মেনে নেয়া ছিল তার নিয়তি। আসলে, তার করণীয় কি, ভেবে স্থির করাই কঠিন হল। তার চারদিকে শুধু চক্রান্ত। একটা গণ্ডগোল। একটা অদ্ভুত অর্থহীন ষড়যন্ত্র তাকে নিয়ে।

ঠিক এরকম একটা সংকটের মধ্যে যখন তার রাতদিন কাটছিল, তখন হস্তিনাপুরে থেকে বিদুর শান্তিগৃহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ নিয়ে এল যুধিষ্ঠিরের কাছে। দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থের অনুরূপ এক রমণীয় গৃহ নির্মাণ করেছে। গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠানে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবও আমোদ-প্রমোদের অংশ গ্রহণ করুক এটাই দুর্যোধন এবং ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের হঠাৎ-ই মনে হল, যে ফাঁদ ছিল অলক্ষ্যে তা এখন বাস্তব। একে এড়ানোর আর কোন পথ রইল না! যুধিষ্ঠির মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করল। তার ললাটের চিন্তার বলিরেখাগুলো স্পষ্ট ও গভীর হল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কিছুক্ষণ বিহ্বল অবস্থার মধ্যে কাটল। এই সময়ের মধ্যে কোন বাক্যস্ফূর্তি হল না তার। মনে হল নিজের জটিল ভাবনার জালে সে নিজেকে বেশী করে জড়িয়ে ফেলল।

বিদুর যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে নীরবে তার উদ্বিগ্ন অসহায়তা দেখছিল। যুধিষ্ঠির দুটো দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মত এঁটে থেকে ভিতরকার সব উদ্বেগকে, দুরন্ত অসহায়তার নিঃশব্দ আর্তনাদকে আটকে রাখল। ক্লান্ত স্বরে বলল: ক্ষত্তা, বড় সংকটে আছি। যে আমার পরম মঙ্গলাকাংখী, যার বুদ্ধি ও নির্দেশ ছাড়া কিছু করি না সেই কৃষ্ণ না থাকার জন্যে আমি কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারছি না। কৃষ্ণ ছাড়া আমি যে কত অচল, কত অসহায় আপনার চেয়ে বেশি কে তা জানে? কৃষ্ণের অনুমতি কোথায় পাই?

যুধিষ্ঠির তোমার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝি। তোমায় চারদিকে এখন শত্রু। ভাল-মন্দ বিচার করে তবে—

ক্ষত্তা, ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা সত্যি আমার লোপ পেয়েছে। মনে হচ্ছে নিয়তিই আমার কাছ থেকে কৃষ্ণকে টেনে নিয়ে গেছে। হা-হুতাশ করে করব কি? ভাগ্যই আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে। অদৃষ্টে যা আছে, হবেই। আমি ক্ষত্রিয়। বিপদ বাধা জয় করে এগিয়ে চলাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। ক্ষত্রিয় জানে শুধু জয়। একটা বিরাট জয়, গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান থেকে যে কোন মূল্যে আমাকে আদায় করে নিতে হবে। এই জয়ের জন্যে আমাকে অনেক মূল্য দিতে হবে। বিনা মূল্যে আর বিনা ঝুঁকিতে কে কবে লাভবান হয়েছে? ক্ষত্তা, হঠাৎ আমার অঙ্গ কাঁপল কেন? চোখের পল্লব ঘন ঘন কেন পড়ছে? আমার হল কী ক্ষত্তা?

বিদুর যুধিষ্ঠিরের বিচলিত অবস্থা দেখে বিভ্রান্ত এবং অস্থির হল। তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: বৎস, তুমি শান্ত হও। সম্রাটকে নিরাবেগ চিত্তে সব গ্রহণ করতে হয়। মানুষের জীবনেই কর্মের মিছিল, নতুন নতুন দায়িত্বের আহ্বান, প্রতিমুহূর্ত তাকে কত অভিনব সংগ্রামের দিকে আকর্ষণ করে।

যুধিষ্ঠির অন্যমনস্ক। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে কি যেন শুনতে চেষ্টা করছিল। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বিদুরের কথায় মধ্যে বলল: ক্ষত্তা শুনতে পাচ্ছ, কোথায় নূপুর বাজছে। মহাকালের পায়ের ঘুঙুর বাজছে আমার হিয়ার মধ্যে। আমি কালের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমার নিয়তিই সবেগে তার দিকে আমাকে আকর্ষণ করছে। আমার সাধ্য কি পিতৃব্যের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করি? কি করেই বা দুর্যোধনের আমোদ-প্রমোদে অংশগ্রহণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করি? ক্ষত্তা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাও। আমি চলেছি আমার অদৃষ্টের পথে। শেষ পথটুকু বাকি আছে। ঐ পথটুকু সাহস করে আমাকে পেরোতে হবেই। দুর্যোধনের ইচ্ছেকে পরাস্ত করে হয় আমার ভাগ্যলক্ষ্মীকে ছিনিয়ে নিতে হবে, না হলে বহুমূল্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরাজয় বরণ করে নিয়ে রাজনীতির মঞ্চ থেকে মাথা হেঁটে করে বেরিয়ে আসতে হবে।

বিদুর নিঃশব্দে শুনল। একটি কথাও বলল না। অনেকক্ষণ পর একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল : যথা ধর্ম, তত জয়। তোমার প্রবল কৃষ্ণানুরক্তি একদিন জয়ের রাজপথ তৈরী করে দেবে। কৃষ্ণ-লাভ সহজে হয় না। অনেক কঠিন পরীক্ষার মূল্যে জীবনে কৃষ্ণলাভ ঘটে। এই কথাগুলো মনে রেখ। কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস হারিয়ো না। বিশ্বাসের পরীক্ষায় যে জেতে, কৃষ্ণ তারই।

যুধিষ্ঠির বিদুরের কথা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। কারণ, আমোদ-প্রমোদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের পণ রেখে পাশা খেলা। যুধিষ্ঠিরের মত একজন দক্ষ এবং শকুনির সমকক্ষ অক্ষ ক্রীড়ক যখন প্রতিটি খেলায় একের পর এক হারাতে লাগল তার ধন, সম্পদ ঐশ্বর্য সিংহাসন, রাজ্য, সব হারাল। তখন সকলের কেমন একটা সন্দেহ হল। এরকম অদ্ভুত পরাজয় কারো জীবনে হয় কখনো? এও কি সম্ভব? এ যে জলে শিলা ভাসার মতই অসম্ভব ঘটনা! যুধিষ্ঠিরের এই হার ইচ্ছাকৃত মনে হল অনেকেরই। স্বয়ং ভীষ্ম, বিদুর ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের রহস্য ভেদ করতে পারল না। সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে যুধিষ্ঠির পাশা খেলার পণ রাখল অনুগত অনুজ ভাইদের। আশ্চর্য, সে পণেও হারল যুধিষ্ঠির। এক এক করে ভাইরা সব দুর্যোধনের দাস হয়ে গেল। সর্বশেষে নিজেও দাস হল। এত বড় পরাভবের পরেও যুধিষ্ঠির কিন্তু অবিচল। কৃতকর্মের জন্যে তার এতটুকু অনুশোচনা কিংবা আত্মগ্লানি অনুভব করল না। তার প্রমত্ত ভুলের জন্যে ভাইদের যে দাসত্ব বরণ করতে হল সে জন্যে কোন পাণ্ডব তাকে অভিযুক্ত করল না। সকলেই নির্বিকার। ভীষণ মৌন। তাদের ভীষণ অচেনা এবং অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ মনে হচ্ছিল। অবশেষে সকলকে থমকে দিয়ে যুধিষ্ঠির ঘোষণা করল এবারে পাশা খেলার পণ পাঞ্চালী।

যুধিষ্ঠিরের মতিভ্রম দেখে ছিঃ ছিঃ করল ভীষ্ম বিদুর দ্রোণ প্রমুখ

ব্যক্তিরা। ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের কাছে এত বড় অধর্ম প্রত্যাশা করেনি কেউ। ধৃতরাষ্ট্র পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের নির্লজ্জ প্রস্তাবে চমকে উঠল। কুলবধূকে শত সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে টেনে এনে এভাবে কুলের সম্মানহানি করার কোন দরকার ছিল না যুধিষ্ঠিরের। রাজনীতি এবং ঈর্ষার ঘোলা আবর্তের মধ্যে পাঞ্চালীকে যুধিষ্ঠির কেন টেনে আনল? এতে তার সম্মান, গৌরব খুব বাড়বে কি? না, অন্য কোন মতলব নিয়ে যুধিষ্ঠির একের পর এক হার স্বীকার করে অন্য কোন বড় জয় আদায় করতে কি এই কৌশল করল? এই সব প্রশ্নে ধৃতরাষ্ট্রের মন আলোড়িত হল। কিন্তু বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না। যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিরূপতা তার মনকে পাগল পাগল করে তুলল।

ধৃতরাষ্ট্র শুধু নয়, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, দ্বৈপায়ন, এক উৎকর্ণ-উৎকণ্ঠা নিয়ে খেলার ফলাফলের দিকে চেয়েছিল। প্রতিমুহূর্ত একটা অদ্ভুত কিছু ঘটার আশংকা প্রবল হল। সভাস্থল শান্ত, স্তব্ধ। উৎসুক দর্শকদের শত উদগ্রীব চোখ পাশাখেলার ছকের উপর স্থির।

পিতামহ ভীষ্ম ঊর্ধ্বমুখে সুউচ্চ সভাকক্ষের ছাদের দিকে চেয়ে থাকল। তার বুক থেকে ঊর্ধ্বে ধাবিত হল পুঞ্জীভূত অভিমান। বলল: পিতা, তোমার বংশে এ কোন পাপ প্রবেশ করল? আমিত এই বংশের ভাল চেয়েছিলাম। তা হলে কেন এই পরিণাম ঘটল? পুরু বংশের গায়ে এ কোন কলংক লাগল? তুমি আমাকে আর কত শাস্তি দেবে? আর কত কাল এইসব দেখতে আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে? কেন, আমি কী করেছি? কোন দোষে আমি দোষী তোমার কাছে? ফিস ফিস করে নিজের মনে কথাগুলো বলল ভীষ্ম। দ্বৈপায়ন তার খুব কাছে বসেই কথাগুলো শুনল। তারও মনটা ভারী হয়ে গেল।

সহসা কৌরব পক্ষের বাঁধন ছেঁড়া উল্লাসে সভাকক্ষ গম গম করে উঠল। কর্ণের পৈশাচিক অট্টহাস্যে দ্বৈপায়নের ভেতরটা চমকে উঠল। ভীষ্ম, বিদুর একসঙ্গে হায় হায় করে উঠল। বোঝা গেল, যুধিষ্ঠির পণে পরাজিত। পাঞ্চালী এখন আর পঞ্চপাণ্ডবের ভার্যা নয়। কৌরবের

দাসী। দুর্যোধন আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অহংকারী পাঞ্চালীর দর্প আর তেজ চূর্ণ করতে দুঃশাসনকে পাঠাল অন্তঃপুরে।

কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই। সময় বোধ হয় সব কিছু বদলে দেয়। ভীষ্ম, বিদুর, কৃপ দ্রোণ সব নীরব। নত মস্তকে বসে রইল। কী ঘটে তার প্রতীক্ষায় রইল সকলে।

দুঃশাসন গায়ের জোরে টানতে টানতে পাঞ্চালীকে নিয়ে সভায় ঢুকল। অমনি পাশব উল্লাসে সভাকক্ষ চমকে উঠল।

পাঞ্চালীও চমকে, থমকে দাঁড়াল। পঞ্চপাণ্ডব মাথা হেঁট করে বসে ছিল। কণ্ঠস্বর শুনেও তারা কেউ তাকাল না তার দিকে। অভিমানে ক্রোধে পাঞ্চালীর দু'চোখ ভরে জল নামল। বিতৃষ্ণায় জ্বালা করতে লাগল তার বুক। কিন্তু তারাও অসহায়। পাঞ্চালীর উপর তাদের আর কোন দাবি নেই। পাঞ্চালীরও নেই। কী করুণ অবস্থা! কৌরবদের সে একজন দাসী মাত্র। কষ্টে দুঃখে যন্ত্রণায় বুকটা খামচে ধরল। তার কেউ নেই। চারপাশে যেসব পিতৃস্থানীয়, ভ্রাতৃস্থানীয় দর্শক বসে আছে তারাও নেই। বড় শূন্য লাগল। এই মুহূর্তে প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ল। সব অপমানের জ্বালা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে তার বুকের উপর আছড়ে পড়তে পারলে তার লজ্জা রক্ষা হত। কিন্তু প্রিয়সখীর চরম লাঞ্ছনার সময় সে নেই। দীর্ঘদিন ধরেই নেই। এখন তার কী হবে? এই বর্বর মানুষগুলোর উন্মত্ততা থেকে কে বাঁচাবে তাকে?

পাঞ্চালীর সমস্ত চেতনা এখন কৃষ্ণময়। আকুল হয়ে ডাকছিল সে কৃষ্ণকে। ওগো প্রিয়সখা আরত আমার কোন উপায় নেই। দুঃশাসন আমার অঞ্চল ধরে প্রাণপণে বস্ত্র উন্মোচনের চেষ্টা করছে। তুমি আমার লজ্জা রাখ প্রভু। আমি তোমার শরণ নিলাম। ললনাপ্রিয় নরপতিদের প্রমোদগৃহে বন্দিনী শত শত বিলাসিনী, পতিতা নারীকে তুমি শুধু উদ্ধার করনি, তাদের সব কলংক নিয়ে পত্নীত্বে বরণ করেছ, সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছ। তোমাকে পেয়ে তারা কিছু হারাল না। ওগো দয়াময় তুমিই রমণীর একমাত্র আশ্রয়।

আমি তোমার শরণ নিলাম প্রভু। আমার মান বাঁচিয়ে নারীর সম্মানটুকু রক্ষা কর। তুমি বিপদের বন্ধু, বিপদতারণ আমাকে রক্ষা কর।

দুঃশাসন পাঞ্চালীর বস্ত্র ধরে টান দিল। আর পাঞ্চালী কাঁধ থেকে খসে পড়া বসনপ্রান্ত চেপে প্রবলভাবে তাকে বাঁধা দিতে লাগল। দুঃশাসন যত বসন ধরে টানতে লাগল, পাঞ্চালী তত ঘুরে ঘুরে বসনে নিজেকে আবৃত রাখতে চেষ্টা করছিল। ভিতর থেকে তাকে কে যেন শক্তি যোগাচ্ছিল। আর সেই শক্তির জোরে বসনে আবৃত রাখল দেহ। মুখে শুধু কৃষ্ণনাম। হে করুণাসিন্ধু, বিপদভঞ্জন কৃষ্ণ; তুমি আমার সম্মান রাখ। আমার লজ্জা কেড়ে নিও না দয়াময়। আমাকে বল দাও, নির্ভয় করো।

একটা দুরন্ত ঘূর্ণির মত পাক খাচ্ছিল পাঞ্চালী। আর কেমন একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গেল সে। মনে হল কৃষ্ণ তার সামনে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে হাত তুলে অভয় দিচ্ছে। অন্তরাল থেকে একের পর এক বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে তার দেহ। কানে কানে যেন বলল প্রিয়সখী এইত আমি। ভয় কি তোমার? ওদের সাধ্য কি তোমার মত সতীর পুণ্যদেহ থেকে বস্ত্র কেড়ে নেয়? চেয়ে ছাখ, দুঃশাসন ক্লান্ত। তার দেহ টলছে। দু'চোখে তার ঘোর লেগেছে। শুধু দুঃশাসন কেন সভাশুদ্ধ লোক কল্পনায় দেখছে স্তূপীকৃত বস্ত্রের পাহাড় জমেছে তোমার চারপাশে। আর তুমি তার উপর শুয়ে আছ। তোমার সংকট কেটে গেছে। প্রিয় সখি, চোখ মেল। এইত আমি।

পাঞ্চালী চোখ মেলল। সে মেঝেতে উপুড় হয়ে বসনের প্রান্তভাগ শক্ত করে চেপে ধরে শুয়ে আছে। তার শিয়রে পঞ্চপাণ্ডব, বিদুর, মহারাণী গান্ধারী। চোখ মেলতে বিদুর বলল: ওঠ মা লক্ষ্মী।

বিদুরের কণ্ঠস্বর পেয়ে গান্ধারী বুঝল পাঞ্চালীর মূর্ছা ভেঙেছে। নিবিড় মমতা-ঢালা গলায় বলল: আমার দুর্বৃত্ত পুত্রদের হাত থেকে কৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করেছে।

পাঞ্চালী অভিভূত গলায় বলল : কোথায় আমার প্রিয়সখা? প্রিয়সখি বলেত আমায় একবার ডাকল না কৃষ্ণা।

বিদুর বলল : জননী কৃষ্ণ তোমার অন্তরে আছে। কৃষ্ণই তোমার শক্তি, তোমার তেজ। সে যেখানেই থাকুক তোমার ডাক তার কানে পৌঁছিয়েছে। তার করুণায় আমরা সকলে ধন্য হলাম। কৃষ্ণ নররূপী ঈশ্বর। তার অন্তর মহিমা তোমার কল্যানে দর্শন করে আজ বড় প্রীত হলাম। শুনেছ মা জননী, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমার স্বামীদের এবং তোমাকেও দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মুক্ত করে দিয়েছেন যুধিষ্ঠিরের হারানো রাজ্য, সিংহাসন, সম্পদ সব।

পাঞ্চালীর নাভি থেকে উঠে এল এক মর্মভেদী গভীর দীর্ঘশ্বাস। ক্লান্ত কণ্ঠে বলল : কী দরকার ছিল করুণার?

গান্ধারীর বলল : জননী মহারাজ করার কে? তোমার দয়াময় কৃষ্ণ মহারাজের মধ্যে দিয়ে তার অনন্ত করুণাকে প্রকাশ করল। আজ তোমার কাছে আমার লজ্জা জানানোর ভাষা নেই। পুত্রদের নির্লজ্জ অপরাধে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। তারপর একটু থেমে ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে বলল : মহারাজ, আজ রাজপদতলে সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে বিচার প্রার্থনা করি অধর্মাচারী দুর্যোধনের। রাজা, ত্যাগ কর অপরাধী পুত্র দুর্যোধনকে।

পাঞ্চালীর বাক্য স্ফূর্তি হল না। শূন্য চোখে চেয়ে রইল। খোলা দুই চোখে কেমন একটা উদাস বিমর্ষ ভাব। সে আর কাউকে নয়। কৃষ্ণকে খুঁজছিল। নীল আকাশের দিকে চেয়ে দু'হাত কপাল ঠেকিয়ে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করল।

দ্বৈপায়নের এ এক নতুন অনুভূতি। মনে হল কাল অবিনশ্বর। তার কোন অতীত নেই! সবই চলমান। এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার মধ্যে নিত্য তার যাওয়া আসা। অন্তহীন কালচক্রের

মধ্যে সে-ও পরিক্রমা করছিল। তাই, এক সময় থেকে অন্য সময়ের মধ্যে তার চেতনা কেবলই প্রসারিত হয়ে যাচ্ছিল। আসলে, তার মন থেমে ছিল না। কখনও ইন্দ্রপ্রস্থে, কখনও হস্তিনাপুরে কখনও দ্বারকায় সে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল।

সৌরভরাজ শাম্বকে পরাজিত ও নিহত করে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরল। দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে তার শরীর ও মন ভীষণ ক্লান্ত ছিল। ভেবেছিল দ্বারকায় ফিরে গৃহের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘুমোবে লম্বা ঘুম। জীবনে এই-রকম যতির মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়। একটানা পথ চলা বড় ক্লান্তিকর। কিন্তু দ্বারকায় পা দিয়ে যুধিষ্ঠিরে দ্যূতক্রীড়ার কথা শুনল। পঞ্চপাণ্ডবসহ পাঞ্চালী ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তেরো বছরের জন্যে নির্বাসিত হয়েছে। এই মর্মান্তিক সংবাদটা শোনা থেকে তার মনটা ভাল যাচ্ছিল না। যুদ্ধের সব ক্লান্তি নিমেষে কেটে গেল। বুকের মধ্যে পাণ্ডবদের জন্য একটা কষ্টকর অনুভূতি তাকে ভীষণভাবে পীড়া দিচ্ছিল। তাদের কথা ভেবে বড় কষ্ট হচ্ছিল। তাদের মত বন্ধু ও সহকর্মীর দুর্দশার কথা চিন্তা করে তার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। বিশ্রামে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তি বেশি হল। উদ্বেল মনের নানারকম দুর্ভাবনাগুলো জলতরঙ্গের মত মস্তিষ্কের কোষে কোষে তির তির করে কাঁপতে লাগল।

পাণ্ডবেরা তার উপর অভিমান নিয়ে রাজা-সিংহাসন ছেড়ে বনে গেছে। দিগভ্রষ্ট প্রজাপতির মত বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রত্যাশা করছে একদিন সখা কৃষ্ণ তাদের খুঁজে বের করবেই। মনের বনে কৃষ্ণ খুঁজছিল প্রিয়সখী পাঞ্চালীর সেই মুখ, সেই চোখ। যে আনন্দকে কৃষ্ণ অন্তরে অনুভব করে দৃপ্ত সূর্যলোকে অথবা চন্দ্রলোকে। পাহাড়ে, নদীতে, বনে যে আনন্দকে প্রত্যক্ষ করে তার অন্তর ভরে উঠে, সেই অনাবিল সুখ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মত, ফুলের সুবাসের মত তার চিত্ত ভরে দিয়েছে। সেই সুখ প্রীতি, ভালবাসা, সখ্য, আনন্দ, হাসি, মন কেড়ে নেয়া পাঞ্চালীর সব কথা ভুলে থাকে কি করে কৃষ্ণ? সে যে তার চিত্ত মন ছেয়ে আছে। চোখ বন্ধ করলে কৃষ্ণ সব দেখতে পায়।

কৃষ্ণার কথায় কৃষ্ণের মন বড় ছটফট করতে লাগল। বিশ্রাম ভাল লাগল না, শান্তি পেল না। মনটা উছলে উছলে তার দিকে দৌড়ে যেতে লাগল। ধবধবে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কৃষ্ণ জানলা দিয়ে বাইরের আলো ঝলমল অশ্বত্থ গাছ, নীল আকাশে পাখির উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য এবং তার হারিয়ে যাওয়া জীবনের রূপ, রঙ, শব্দ ও গন্ধের দিকে লোভীর মত তাকিয়েছিল।

মুক্তি! মুক্তি তো কোথাও নেই। মুক্তি-কর্মী ও দরদী মানুষের জন্যেওনয়। তার জন্যেও না। পাঞ্চালীর জন্যেও না। শুধু ভগবৎ বিশ্বাসী যুধিষ্ঠিরের জন্য। বিশ্বাসের যে বিকল্প নেই। আর যুধিষ্ঠিরের এই সহজ সরল অকপট বিশ্বাসের জন্যে চিরকাল তাকে দৌড়ে যেতে হবে। এই বিশ্বাসের মত বড় বন্ধন আর কিছু নেই। যতক্ষণ দ্বারকা ছেড়ে না যাবে ততক্ষণ সেই বাঁধনের দড়ির চাপে সমস্ত সত্তা তার লাল হয়ে ফুলে ফুলে উঠবে।

একা একা একটা পাখি উড়ে যাচ্ছিল ভোরের আকাশ থেকে সূর্যের দিকে। অভ্রকুচির মত রোদের নরম উজ্জ্বল আলো তার রঙিন ডানার উপর পড়ে পিছলে পিছলে রামধনু রং হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল পুব আকাশে।

কৃষ্ণের ঘরে থাকতে আর ভাল লাগল না। সে উঠল বিছানা ছেড়ে। আরাম থেকে আড়ামোড়া খেয়ে সোজা ও চাঙ্গা হয়ে দাঁড়াল। সত্যভামা বলল: এর মধ্যে উঠলে?

সত্যভামার ভাসা ভাসা দুই চোখের উপর চোখ রেখে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। বলল: আমাকে এবার সখা পাণ্ডবদের খোঁজে যেতে হবে। আমার উপর তাদের অনেক অভিমান জমে আছে। আমার অনুপস্থিতির জন্যে ওদের এই হাল। আমি যদি হাল না ধরি তো হলে এসব করবে কে? আমার স্বপ্নের কি হবে? একটা অবলম্বনত চাই। তা-না হলে কী আশায় বাঁচব?

একটু বিশ্রাম নিয়ে নিজেকে একটু সুস্থ করে যাও স্বামী।

প্রিয়তমা, এমনিতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাকে বাধা

দিও না। আমার এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেলে কি নিয়ে থাকব?

সত্যভামা হাসল। আশ্চর্য এক বিষণ্ণ হাসি। বলল: জানি, আমরা কেউ নই। নিজের ভাবমূর্তি তৈরী করতেই তুমি ব্যস্ত।

না, সত্যভামা। আমি মানুষের কল্পনার ঈশ্বর। ঈশ্বরের নিজের জীবন বলে কিছু থাকতে নেই। ঈশ্বরকে শুধু দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত হয়ে যেতে হয়। না হলে ঈশ্বরের গৌরব থাকে না। আমিও দিয়ে থুয়ে মানুষকে ভরপুর করে রেখে চলে যাব এই পৃথিবী থেকে। সত্যভামার পিঠে হাত রেখে কৃষ্ণ বলল: রাগ কর না লক্ষ্মীটি। আমার ওপর তোমাদের অনেক রাগ অভিমান জমে আছে জানি। কিন্তু তুমিও চাও না আমি সামান্য সাধারণ হয়ে থাকি। যে অসাধারণ হয় তার জন্যে পরিবারের মানুষকেও অনেক ত্যাগ দুঃখ স্বীকার করতে হয়। বড ত্যাগ না করলে বড কিছু পাওয়া যায় না সত্যভামা। তোমাদের মত মহীয়সী ভার্যা যদি আমার না থাকত তা-হলে কি এসব করতে পারতাম? তোমরা আমার গর্ব! তোমাদের ত্যাগ ও সেবার আদর্শের আলো যখন আমার উপর পড়ে তখন আমিও কিছু বড় হয়ে যাই। মানে, বড হবার কিছু অপূর্ব সুযোগ পাই।

সত্যভামার মুখে কথা নেই। কত আশা নিয়ে স্বামীর মুখোমুখি বসেছিল দুটো গল্প করতে কতকাল পরে দু'জনে মুখোমুখি বসল। কত কথা বুকের মধ্যে উষ্ণ, তরল, প্রমত্ত হয়েছিল লাভাস্রোতের মত। কৃষ্ণর কথায় মুহূর্তে তা শীতল প্রস্তরীভূত হয়ে গেল। আর সে শাপগ্রস্ত প্রস্তরীভূত মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কৃষ্ণ তার গালে চকিতে ছোট্ট একটা টোকা দিয়ে মুচকি হাসল। সত্যভামার চোখ ছলছল করে উঠল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: তোমার মত একজন মানুষ কখনো আমার মত সামান্য মেয়ের মধ্যে ধরে না। তুমি অনন্ত বিশাল। আমার সাধ্য তো নেই, ইচ্ছেও নেই বিন্দুমাত্র যে তোমাকে ধরে রাখি, ছোট করি কোন দিক দিয়ে। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। বলতে বলতে সত্যভামার গলা বুজে এল।

কৃষ্ণ হাসল। অদ্ভুত সেই মধুর হাসি যে হাসিতে সব দুঃখ ভুলে যায়। মন প্রফুল্ল হয়। বলল: ক্ষমা করব আমি? ক্ষমা করার কি আছে? শ্রদ্ধা, ভালবাসা আর সম্মান দিয়েত মানুষের সব সম্পর্কের ভিত গড়ে উঠে। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। হ্যা সামান্য মেয়ে তুমি নও। একজন মেয়ের মত মেয়ে। তাইত আমার খুশিতে, আমার শান্তি, আমার স্বাধীনতা নিয়ে আমার মত করে থাকতে দাও। তোমাদের কাছে আমার এ কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়।

প্রসন্নতা মাখা প্রেম ছবি ফুটে উঠল সত্যভামার মুখে। বলল: স্বামী অমন করে বল না। যা কিছু তুমি দীর্ঘদিনের চেষ্টা, পরিশ্রম, মননশীলতা দিয়ে গড়ে তুলেছ, যা কিছু তোমার গৌরবের সম্মানের পরিচয়ের শ্রেষ্ঠত্বের, তার মূলে আছে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা, সত্যিকারের শ্রদ্ধা, বিস্ময়কর নিষ্ঠা, স্নেহ, দরদ, সততা। প্রকৃত ভালবাসা সততা, নিষ্ঠা যদি তোমার চরিত্রে মিশে না থাকত তাহলে মূল্যহীন হয়ে যেত সব। তোমার সাফল্যের সেই গৌরব তুমিটিক আমার প্রেমের মালা করে গলায় পরি, বুকে ধরি, মাথায় রাখি। ফুলের মিষ্টি সৌরভের মত ভরে থাকে আমার সমস্ত হৃদয় মন। তার ভেতর তোমার প্রেমের নিবিড় স্পর্শ পাই। ঐ পরশেই গর্বিত হয়ে উঠি। এই ভেবেই কত সুখ অনুভব করি। এমন মহৎ দান আর কী আছে? আমার মত সামান্য রমণী তোমার মত বিরাট মানুষকে ভালবেসে আমার নিজের সত্তার কাছে কত যে দামী, কত মহার্ঘ হয়ে উঠি তা আমিই জানি। এটা কি কম পাওয়া? তুমি মনে কষ্ট না রেখেই যাও। আমি আর বাধা দেব না।

কৃষ্ণ কথা বলতে পারল না। এক অব্যক্ত গভীর তীব্র দুঃখের সঙ্গে মিলে গেল এক গভীর তীব্র ভাল লাগা। যে ভাললাগা কৃষ্ণের একার। একেবারেই একার। যার ভাগ কাউকে দিতে হয় না। কৃষ্ণ স্বেচ্ছায় সত্যভামার হাতটা হাতে তুলে নিল। অনেকদিন পর তার হাতে হাত রাখল। বড় নরম তুলতুলে হাত। ভীষণ মোহ মাখানো। সারা অঙ্গে কৃষ্ণের কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল। ভাল-

লাগা, এই খেলা বেশ লাগে। কিন্তু এ ভাললাগা বড় সাংঘাতিক। মারাত্মক সংক্রামক। আবার বড় শত্রুও। কৃষ্ণ আস্তে আস্তে সত্যভামার হাতটা ছেড়ে দিল। স্নিগ্ধ হাসিতে প্রসন্নতার প্রাপ্তির অপর্যাপ্ত সুখে ভরে উঠল তার মুখমণ্ডল।

বললঃ সখা পাণ্ডবদের জন্যে মন আমার বড় চঞ্চল হয়েছে। তাদের মত সজ্জন আত্মীয়, বন্ধু, অনুরাগী, ভক্ত পাওয়া দুর্লভ। তাদের হারিয়ে আমি সুখে নেই। যতক্ষণ তাদের সঙ্গে মিলিত হতে না পারছি ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নেই। ওদের মত ক'জন সর্বান্তকরণে আমাকে ডাকে? ওদের আকুল করা ডাক আমার সমস্ত চেতনার ভেতর অনুভূতির ভেতর শুনতে পাচ্ছি। যত সময় যাচ্ছে আমার ভেতরটা তত অস্থির হচ্ছে। তোমার অনুমতি পেলে আমি যাত্রা করতে পারি। রথ প্রস্তুত।

সত্যভামা জল ভরা চোখে ঘাড় নাড়ল।

কৃষ্ণ মিলিয়ে গেল সিংহ দরজা পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে। জানলায় দাঁড়িয়ে সত্যভামা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ধূলো উড়িয়ে রথ ছুটল উত্তর পূর্বদিকে। কাম্যকবনে। সাঁ সাঁ করে বাতাস কাটার শব্দ হচ্ছিল। কৃষ্ণের কানে সেই শব্দ যাচ্ছিল না। বাইরে নিশ্চল স্থৈর্যের মধ্যে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অস্থিরতা। পথে যেতে যেতে বারংবার মনে হল সরলমতি পাণ্ডবদের রাজ্যচ্যুত হওয়ার পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে। শত্রুপক্ষ তার আগাধ কৃষ্ণপ্রীতি কৃষ্ণের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, আনুগত্যকে পছন্দ করতে পারছিল না। তাই শাম্বের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন যুদ্ধে ব্যস্ত রেখে সখা পাণ্ডবদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে এই সর্বনাশটি করার পরিকল্পনা করেছিল। দুর্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রের কপটতা শঠতাকে ক্ষমা করতে পারল না। মনে মনে এক ভয়ংকর প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করল। দুরাত্মাদের সমূলে ধ্বংস করে পাণ্ডবদের সুখী না করা অবধি তার এই চিত্ত জ্বালা যাবে না। তার চক্ষে নিদ্রাও আসবে না আর। অসুরকে ধ্বংস করার জন্যে দেবীকে চামুণ্ডা হতে হয়। নইলে, অগণিত অসহায়

ভক্ত রক্ষা পায় না। তাদের জন্যে ভগবানকে নেমে আসতে হয় মানুষের সমতল। ক্রোধ, কপটতা, হিংসা, বিদ্বেষ দিয়ে শুধতে হয় ভক্তের ঋণ। তা না হলে ভগবানের ভগবানত্ব থাকে না। কী আশ্বাসে কোন ভরসায় যায় ভক্ত ভগবানের শরণাপন্ন হবে? ভক্তের কথা ভেবেই সুখী দেবী চামুণ্ডা হয়ে ভক্তকে অভয় দেন। তাকে রক্ষা করেন। দুঃসময়ে তিনি আছেন এবং থাকবে। এই প্রত্যয় ভক্তকে প্রত্যয়বান করে। •

কাম্যকবনে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হল কৃষ্ণ। দিগ্বিজয়ী সম্রাট যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের অপরিসীম দৈন্য ক্লেশ দুর্দশা এবং শ্রীহীন রূপ দেখে কৃষ্ণের বাক্‌রোধ হল। দু'চোখ দিয়ে তার জলধারা গড়িয়ে পড়ল। সহসা কথা বলতে পারল না। মৌন হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

লজ্জায় অপমানে মাথা তুলতে পারল না যুধিষ্ঠির। দেবার মত কোন কৈফিয়ৎ তার ছিল না। স্বীয় মূঢ়তার অপরাধে অপরাধী হয়েই অধোবদন হয়ে রইল। অর্জুনের দীপ্তিহীন চোখ দুটি যেন কৃষ্ণের মার্জনা ভিক্ষা করছিল। নকুল সহদেব দীন নয়নে চেয়েছিল কেবল ভীমের দু'চোখ জ্বলছিল ক্রোধে, অপমানে প্রতিহিংসায়।

পঞ্চভ্রাতাকে আশ্বস্ত ও শান্ত করে কৃষ্ণ গেল প্রিয় সখী কৃষ্ণার কাছে। দ্বারের কাছে সে একটু থমকে দাঁড়াল। তার বুকের ভেতর একটা তোলপাড় দেখা দিল

কৃষ্ণা মুখ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ কৃষ্ণ কোন কথা বলতে পারল না। বেশ বুঝতে পারছিল গ্রীষ্মের প্রখর তপ্ত জমিতে বর্ষা নামবে। বেশ বিভ্রান্ত বিস্ময়ে ভুরু কুঁচকে কৃষ্ণ চেয়ে রইল। মনটা তারও একজায়গায় আটকে ছিল। মনে নানা প্রশ্ন কাজ করছিল। আনমনে মাথা নাড়ল। তারপর হঠাৎ করে চমকে উঠা গভীর ভালবাসা, প্রীতি ও সখ্যের এক ধরনের আবেগে তার কণ্ঠ গদ গদ হয়ে উঠল। মায়াবী গলায় ডাকল: প্রিয়সখি, কিছু বলবে না আমায়?

এই ডাকটার অপেক্ষা করছিল কৃষ্ণা। বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। গনগনে অভিমানে ফুঁসে

উঠল তার ভেতরটা। ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মত টান টান হয়ে দাঁড়াল। সখেদে বলল: প্রিয় সখি! কে বলেছে, তোমাকে ওনামে ডাকতে? তুমি আমার কে? কেউ না। কেউ না। কান্নায় ভেঙে পড়ল কৃষ্ণা। এক অসহনীয় হৃদয় যন্ত্রণার গভীরে ডুবে গিয়ে সে অসহায়ের মত দু'হাতের করতলে মুখ ঢেকে কাঁদছিল। আর গলা থেকে মাঝে মাঝে একটা আর্তনাদের মত স্বর বার হচ্ছিল। মানুষ গভীরভাবে অপমানিত হলে ভিতরকার যন্ত্রণায় যেমন কষ্ট পায়, তাপে শুকিয়ে যায় তাম্রাভ হয়ে উঠে পাঞ্চালীর চোখ মুখে সেইরকম একটা ভাব ফুটে উঠল।

কৃষ্ণের কেমন দিশাহারা লাগছিল। ভারী অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। প্রাথমিক আবেগ কেটে যাওয়ার পর কৃষ্ণা আত্মস্থ হল। বিধ্বস্ত গলায় বলল: সখা আমার মত দুঃখী বুঝি আর কেউ নেই। শূন্যতা, শুধুই শূন্যতা, ঘরে, বাইরে, চারধারে। আমার পতি, পুত্র, ভ্রাতা, পিতা সব থাকতেও কেউ নেই। কেউ না। তুমিও নেই সখা। এক ভীষণ অপমানে আমার বুক জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বড় ঘেন্না হচ্ছে নিজের উপর। চারপাশের মানুষ পরিবেশ এবং আত্মজনের উপর। জঙ্গলের পশুদের ও একটা নীতিবোধ আছে।

কৃষ্ণের মুখে সহসা কোন কথা জোগাল না। তবে তার অতি স্পর্শকাতর মনটা তাকে সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছিল। তার কান্না দেখে কেমন অসহায় লাগছিল। বিহ্বল গলায় বলল: প্রিয়সখী, এ নিয়ে মনস্তাপ করলে শুধু দুঃখ বাড়ে। মানুষের সাধ্য কি বিধিলিপি খণ্ডন করে? এ তোমার ভাগ্যফল। যারা তোমাকে অপমান করল তারা কেউ রেহাই পাবে না। তোমার ক্রোধের আগুনে তারা পুড়ে নিঃশেষ হবে। কালপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শুধু ধৈর্য ধর। বিধাতার অভিপ্রায় হয়েছে সব। তবু তোমার লাঞ্ছনা এবং দুঃখের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তোমার জন্যে আমার প্রাণে নিরন্তর বেদনা অনুভব করি।

কৃষ্ণা সহানুভূতির কথা শুনে দপ করে জ্বলে উঠল। বলল: কে

চেয়েছে তোমার করুনা, সহানুভূতি? চাই না, তোমার দরদ। তুমি চলে যাও।

কৃষ্ণ শুধু হাসল। ভক্তের অভিমানে দেবতা যেমন অলক্ষ্যে হাসেন তেমন হাসি। বড় অর্থপূর্ণ আর মধুর সে হাসি। বলল: 'প্রণমণী তোমার চোখের আগুন নিভবার নয়। আগুন শক্তির উৎস। তোমার অপমান অসম্মান তার ইন্ধন। সত্যের জন্যে ধর্মের জন্যে রাজা হরিশচন্দ্রকে কত দুঃখ লাঞ্ছনা, নির্যাতন সইতে হয়েছিল সেতো তুমি জানই। আমরা কেউ নিজের ইচ্ছেয় করি না। কালের নির্দেশে চলি। কাল সবাইকে কেবল আকর্ষণ করে। তোমাকেও করেছে, আমাকেও করেছে। নইলে, এমন ঘটনা হবে কেন? কালের আকর্ষণকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এ নিয়ে মন খারাপেরও কিছু নেই। একদিন কালের বুক থেকে উঠে আসবে দুঃখ মুক্তির নির্দেশ। সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধর। করবে কি বল? এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। জীবনের কোন বৃহত্তর প্রয়োজনে এর হয়ত প্রয়োজন আছে। এখন জানা না গেলেও একদিন টের পাবে। আজ মনে হচ্ছে অসম্মানের জন্যে অনেক দাম দিতে হচ্ছে। জীবনের অনেকগুলো বছরের অপচয় হচ্ছে। তবু এই দাম দিতে গিয়ে তুমি নিঃস্ব রিক্ত কিছুই হবে না। ঐ যে বললুম, ইন্ধন পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয় না। কেবল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নিদাঘ তপ্ত মাটির জল বিন্দুর যেমন চিহ্ন থাকে না, তেমনি তোমার এই কষ্ট বেদনা, দুঃখ বিলাপেরও কোন চিহ্ন থাকবে না। সেবা ও ত্যাগের মহিমায় পূর্ণ হয়ে যাবে।

কৃষ্ণার মুখে থমথমে বিষণ্ণ ভাবটা আর নেই। কৃষ্ণের কথায় তার মুখের ভাব এত পাল্টে গেল যে সহজেই তা চোখে ধরা পড়ে। কৃষ্ণার বুকে অপমানের বিষ জ্বালা আর নেই। মনে হল, সে যেন একটা ভুবন জোড়া আলোর রাজ্যে এসে পড়েছে। তাই এমন একটা প্রশান্ত স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে তার সারা অন্তর। কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে তার সারা শরীর অবশ হয়ে এল। কী মিষ্টি আর কী মধুর ছিল কৃষ্ণের সেই কণ্ঠস্বর, যা তার সমস্ত চেতনার

ভেতর শাঁখের মত বেজে যেতে লাগল। আর তার একটা আবেগে তার অন্তরটা যেন কৃষ্ণের অনন্ত মহিমার কাছে লুটিয়ে পড়তে চাইল। চোখে মুখে তার আত্ম-নিবেদনের এক সকরুণ ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। কৃষ্ণা কথা বলতে পারল না।

কৃষ্ণের অধর প্রান্তে মৃদু হাসি। কৌতুকে বক্র হচ্ছিল। ক্রমে তা একটু একটু করে অনন্ত রহস্যময় হাসিতে মধুর হয়ে উঠল।

কৃষ্ণা সম্মোহিতের মত কৃষ্ণের দিকে এগিয়ে এল। তারপর, হাঁটু মুড়ে বসল তার পায়ের কাছে। ভক্ত রমণী যেমন গলবস্ত্র হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ঈশ্বরের প্রণতি জানায় তেমনি করে কৃষ্ণের নীলপদ্মের পাঁপড়ির মত পা দুটো তার কোমল হাত দিয়ে স্পর্শ করে মাথায় ছোঁয়াল। অমনি কোন যাদুমন্ত্রে তার সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতা মুছে গিয়ে এক অনির্বচনীয় সুখ আর পরিতৃপ্তিতে ভরে উঠল তার মন। তন্দ্রাভিভূতের মত নিজের মনেই বলল: আমার সব অপমান অসম্মান, চিত্ত বিক্ষোভ তোমার পায়ে সমর্পণ করলাম। আমি তোমার শরণাগত হলাম। বলতে বলতে তীব্র একটা আবেগে তার দু'চোখ বুজে এল।

অনেকক্ষণ ধরে নদীতে স্নান করল দ্বৈপায়ন। তবু মনটা খুশি এবং পবিত্র হল না। জল গায়ে নদী থেকে উঠে এল। সারা গা দিয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল। ভিজে বসন গায়ের সঙ্গে লেপ্টে ছিল। হাঁটবার সময় ছলাৎ ছলাৎ করে শব্দ হচ্ছিল। বেশ খানিকটা আসার পর দ্বৈপায়ন অশ্বত্থ গাছের নিচে বাঁধানো বেদীতে শিবলিঙ্গের মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়াল। দুই চোখ তার বোজা। ধ্যানস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষন।

ধ্যানের পর কিন্তু মন প্রসন্ন হল না। কোথায় যেন একটা ব্যথা কিন কিন করে বাজছিল। পাছে অন্যজনে টের পায় তাই তাকে লুকনো এক বেদনার যন্ত্রণা সব সময় আড়াল করে বেড়াতে

হয়। কারণ প্রত্যেকের জীবনে এমন অনেক কথা থাকে যা অন্য জনকে বলা যায় না। বলতে নেই। বলতে পারলে হয়ত হাল্কা হত ভেতরটা, তবু সব কথা সকলকে বলা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা কৃষ্ণকে কিছু বলতে হয় না। মানুষের মনের গোপনে লুকনো গভীর কথাটা কেমন করে যেন টের পায় সে। ঈশ্বরের মত কৃষ্ণ অন্তর্যামী। কি পরমাশ্চর্য শক্তি তাঁর। কৃষ্ণের এই দিব্য ক্ষমতা শত্রু-মিত্র সকলের নজর কেড়ে নিয়েছে। শত্রুরা মুখে বলে না, কিন্তু মনে মনে স্বীকার করে : কৃষ্ণই শাশ্বত অব্যয়, অব্যক্ত নির্গুণাখ্য, পুরাণ পুরুষ স্বয়ম্ভু স্বরূপ বিষ্ণু। কি পরম আশ্চর্য তার শক্তি, মহৎ তাঁর কৃপা। এরকম একটা অনুভূতি, উপলব্ধিতে দ্বৈপায়নের মনটা ছেয়ে ছিল। একটা ঘোর লাগা আচ্ছন্নতার মধ্যে পথ হাঁটছিল। এক সুদূর অতীতকে মনে পড়ল। কিছু মুহূর্ত, কিছু স্মৃতির মধ্যে তার অবলুপ্তি ঘটল। সে তার অতীতকে দেখছিল। কতকাল হয়ে গেল তবু কি আশ্চর্য সেই দৃশ্য ও ঘটনাগুলো এখনও মনের ভেতর সেই রকমই আছে। কেমন করে নিজের অজান্তে গোটা জীবনটা তার বদলে গেল, সে কথা ভাবলে বুকটা ধরাস করে উঠে। মাঝে মাঝে অম্বিকার মুখখানা মনে পড়ে। প্রেমে নয়, জ্বালায়। অম্বিকা তার জীবনে প্রথম নারী। অথচ তার কাছেই সে পেল নিদারুণ আঘাত, মর্মস্পর্শী প্রত্যাখ্যান। তার সামান্য করুণায় যে দান সুন্দর হতে পারত, তা হয়ে উঠল অসুন্দর। অম্বিকার ভয়ংকর কথাগুলো দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। মাঝে মাঝে কেন যে মনে পড়ে জানে না দ্বৈপায়ন। তথাপি সে রোমন্থন করে মনে মনে। "এত বিশ্রী ভয়ংকর অনার্য দস্যু তাকে আমি বরণ করব কি করে? ঐ কদাকার শরীরটার দিকে তাকাতে ও ঘেন্না হয়। দূর হও আমার সামনে থেকে। বলে শয্যা থেকে জোর করে তাকে ঠেলে দিল মাটিতে।

পৌরুষের এত বড় অপমানটা দ্বৈপায়ন জীবনভোর ভুলতে পারল না। আবার এই অপমানের কথাটা কাউকে বলতেও পারল না। তুষানলের মত নিজের বুকে জ্বালিয়ে রাখল। নিজেই দগ্ধ হতে লাগল।

অম্বিকার অপমানটা যতদিন তার মনে থাকবে ততদিন প্রতিশোধের আগুনটা তার নিভবে না। দয়া মায়া-মমতার পুকুর শুকিয়ে গেল! সব রাগবিদ্বেষ, হিংসা গিয়ে পড়ল অম্বিকার নিষ্পাপ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের উপর। অম্বিকার কোন ক্ষমা নেই।

মানুষ একটা সূত্র ধরে জন্মায়। অম্বিকার মধ্য দিয়ে যে পুত্রটি তার ঔরসে জন্মাল, জননীর পাপে জন্মান্ধ। তার জন্যে দ্বৈপায়নের কষ্ট হয়। কিন্তু অম্বিকা তার স্রষ্টা। সে তার কেউ নয়। তার সঙ্গে সম্বন্ধ একটা সংস্কার মাত্র। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করে, তার স্বপ্নের সমাধি ঘটিয়ে সে অম্বিকার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। পাণ্ডবেরা হল তার সেই লক্ষ্য পূরণের উপায়।

কিন্তু পাণ্ডবেরা পণ রেখে দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়ে যখন বনে চলে গেল তখন দ্বৈপায়ন ভীষণ অসহায় বোধ করল। তার গোটা পরিকল্পনাটা যেন মাঝপথে ফেঁসে গেল। কেমন একটা আশাহত হওয়ার বেদনায় সে নিশ্চল হয়ে রইল। কারণ তাদের ভাগ্যোন্নতি, সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তার স্বার্থের একটা নিবিড় যোগসূত্র ছিল। দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মনের নিভৃতে একটু একটু করে অম্বিকার উপর প্রতিশোধ নেয়ার যে দুর্গ গড়েছিল। পাণ্ডবদের বনগমনে তা তাসের ঘরের মত হঠাৎ ভেঙে পড়ল। তার নিজের পায়ের তলায় যেন মাটি থাকল না। যত দিন যেতে লাগল, তার মনের অস্থিরতা এবং বিচলিত ভাবটা বাড়তে লাগল। মনে হতে লাগল, পাণ্ডবদের মত তার জীবনেও আশা ভঙ্গের কালো রাত্রি নেমে এসেছে। এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে, অনিশ্চয়তার মধ্যে পাণ্ডবদের সঙ্গে নতুন করে আবার যাত্রা সুরু করতে হবে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে মনের শক্তি, উদ্যম, আকাঙ্খা, ঈর্ষা কি অম্বিকার অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার মত সজীব থাকবে? সত্যি কি, এ জীবনে অম্বিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবে? হবে কি, পাণ্ডবদের সৌভাগ্য সূর্যের উদয়? এক, দুই, তিন নয়, বারো বছর বনবাসের পর, আরো একটি বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে।

সেই সময় কেউ যদি টের পায়, কিংবা জানাজানি হয়ে যায় তাদের অজ্ঞাতবাস তা-হলে আবার তেরো বছর বনবাসের জীবনে ফিরে যেতে হবে। এ এক ভয়ঙ্কর প্রতিশ্রুতি।

নিদারুণ আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় হতাশ হয়ে পড়ল দ্বৈপায়ন। প্রতিহিংসার আগুন এখন নিভন্ত! তার তেজ গিয়েছে, কেবল তাপটুকু আছে। অম্বিকার অপমানের স্মৃতি অস্তগামী সূর্যের মত মনকে রাঙিয়ে রেখেছে শুধু। একটা অভ্যাস আর জেদের নেশায় যেন কিছু করতে চাওয়া। মাঝে মাঝে মনে যখন অবসাদ জমে তখন মনে হয় মহৎ কিছু হওয়ার কথা ছিল তার, কিন্তু প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব, প্রতিশোধের উন্মত্ততা তাকে ঋষি থেকে শয়তানের ভূমিকায় নামিয়ে আনল।

বোধ হয় এমন অনেক অদ্ভুত কিছু ঘটে যায় জীবনে। একটা তুচ্ছ ভুলের উন্মাদনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের কিংবা একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের চিড় খেয়ে যায়। এসবই মনের ব্যাপার। তবু এই প্রতিক্রিয়ার ফল মারাত্মক। এইভাবেই একটা সংসার, একটা বংশের ভূগোল, ইতিহাস মুছে যায়। এতে মানুষের ভূমিকা বিশেষ কিছু থাকে না, তবু মানুষকে নিয়েই কালের সে সর্বনাশা খেলা। কৌরব ও পাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়া সেরকম মনে রাখার মত ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা। হয়ত, কালের নিয়মে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু একটু করে শাখায়-প্রশাখায় তা যে বড় হয়ে উঠছে না বা উঠবে না, কে বলতে পারে? দ্বৈপায়নের সব সময় মনে হয় পাণ্ডবদের এই বনবাস একটা বড় কিছু করবে। কালের নিয়মেই যদি এই বনবাস হয়ে থাকে তা হলে কাল পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হবে তাকে।

দ্বৈপায়নের বিস্ময়বোধ স্তিমিত হল না। কৃষ্ণ যাদের সহায়, তাদের আবার ভাবনা কি? সুতরাং নিরাশ হওয়ার কিছু হয়নি তার। অম্বিকার উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে একটা বড় যুদ্ধ চাই। একটা ভয়ঙ্কর বড় যুদ্ধ। যে যুদ্ধ অম্বিকার তেজ, দম্ভ, অহংকারের

সাক্ষী হয়ে থাকবে। আগামী প্রজন্মও যার স্মৃতি ভুলবে না, এমন একটা যুদ্ধ চাই। এই যুদ্ধটা তার ও অম্বিকার জীবনের নিয়তি। তাই বা কেন? কৌরব পাণ্ডবের বিবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। কারণ, স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী রাজনীতির সার্বিক ধ্বংস ছাড়া বৃহত্তর মানবিক কল্যাণ, সাম্যের প্রতিষ্ঠা কিংবা কৃষ্ণের অখণ্ড ভারত রাজ্য স্থাপন কখনও সম্ভব নয়। কৃষ্ণের আজন্ম স্বপ্ন সফল করতে চাই, এক সর্বগ্রাসী সর্বশেষ ক্ষমতার লড়াই। যুদ্ধ করেই তা মীমাংসা করতে হবে। অতএব যুদ্ধটা অবশ্যম্ভাবী। কৌরব-পাণ্ডবের বিরোধটা শুধু উপলক্ষ্য মাত্র।

অকস্মাৎ একঝাঁক উড়ন্ত টিয়ার গগন বিদারী চিৎকারে দ্বৈপায়ন হঠাৎ চমকে উঠল। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। চমকানো বিস্ময়ে দুটি চোখ শব্দকে অনুসরণ করল। ঝকঝকে রোদে ওদের মসৃণ সবুজ রঙের পালকের উপর ভোরের নরম আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। নিজের আনন্দে অথবা যন্ত্রণায় ওরা ডানা ঝাপটায় এবং ডাকে।

দ্বৈপায়নের মনের অভ্যন্তরে বিষণ্ণতা শিকড় গেড়ে বসল। তার শান্ত ও ভাবলেশহীন মন আজ কিছু চঞ্চল। আশ্রমে ফিরে ভিজে কাপড় বদলাল। প্রাতরাশ খেল। তারপর লেখনী নিয়ে বসল। কত দার্শনিক চিন্তা মনকে ছুঁয়ে গেল। জীবন প্রবাহ সময় প্রবাহের মতই অনন্ত। তার শেষ নেই, ক্ষয় নেই, যতি বিরতি নেই। কোন কারণেই তার নিরবচ্ছিন্ন গতি রোধ হওয়ার নয়। নদী স্রোতের মত গতিধারা বদলে বদলে চলে।

পাণ্ডবদের জীবনটা বড় অদ্ভুত। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। নড়েচড়ে, সরে সরে নতুন সবুজ দুর্বাঘাসের মত চারদিকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। অন্য জীবন থেকে অনন্ত জীবনে। এই মিথ্যে জীবনের শূন্য গহ্বর থেকে এক অনাগত সত্যের আলোকিত প্রান্তরের দিকে। আর, যা ঘটবার তা আপনা থেকে ঘটে যাচ্ছে তাদের জীবনে। তার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই, কারো কিছু করার নেই। এ যেন ভবিতব্য।

বিস্ময়ে দ্বৈপায়নের মন ভরে গেল। বুকের ভেতর কথায় সমুদ্র উথাল-পাথাল করতে লাগল। হঠাৎ এই অনুভূতির উৎস কোথায় তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার আনন্দে, না কৃষ্ণের প্রতি অবিচল আস্থা অথবা প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধে তা দ্বৈপায়ন জানে না। কানের কাছে ভ্রমরের মত কৃষ্ণের একটা কথা কেবলই গুনগুন করে তা হল; ঋষিবর জীবনে অনেক পেয়েছি। পাওয়ার ঘর আমার ভরে গেছে। তবু শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ভালবাসার মিলিত যে অর্ঘ্য পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের বধূ কৃষ্ণা ও জননী কুন্তী আমাকে দিয়েছে, এরকমটা আর কারো কাছে পাইনি। তাই তাদের প্রতি আমার টানটা বড় গভীর। ওদের অদেয় আমার কিছু নেই। আমার যা কিছু বল, সম্পদ, ঐশ্বর্য, সব পাণ্ডবদের। ভক্ত যেমন ভক্তি দিয়ে ভগবানকে পায়। ভগবানও তেমনি ভক্তকে পায়। ভক্তের জন্যে ভগবানের যেমন অকরণীয় কিছু থাকে না, তেমনি পাণ্ডবদের কল্যাণে আমার অকরণীয় কিছু নেই।

কৃষ্ণের কথাগুলো দ্বৈপায়নের অন্তরে এক অদ্ভুত আশ্চর্য অনুভূতির শিহরণ ছড়িয়ে দিল। সে কিছুতে তার অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দ ও মুগ্ধতাকে ভুলতে পারছিল না। সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্যে জড়িয়ে দিল তার তৃপ্তি ও আনন্দের দ্যুতি। কতবার মনে হল; ভক্তের জন্যে ভগবান। ভগবানের নিজের বলতে কিছু নেই। সুখ, আরাম, বিশ্রাম কিছুই তাঁর নেই; সব সমর্পণ করেছেন ভক্তকে। ভক্তকেও তেমন সব সমর্পণ করতে হয় ভগবানকে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মানুষ কি তাঁর মত সব দিতে পারে?

প্রশ্নটা কেমন আনমনা করে দিল দ্বৈপায়নকে। এই নিষ্ঠুর নির্মম, প্রেমহীন পৃথিবীতে যদি কারও বুকে কারো প্রতি প্রেম, করুণা, দরদ, ভালবাসা থেকে থাকে ত তা আছে ঐ কৃষ্ণের বুকে। কথাটা কাম্যকবনে একদিন কৃষ্ণসখা পাঞ্চালী তাকে বলেছিল। বলার সময় চোখেমুখে খুশির দ্যুতি ঝরেছিল। কৃষ্ণের যে প্রেমকে সর্বক্ষণ বুকের ভেতর অনুভব করে পাঞ্চালী, একদিন আশ্চর্যভাবে তার বাস্তবতাকে উপলব্ধ করল। সে এক গল্পের মত।

কাম্যকবনে তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ। চারদিক রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। ফুরফুরে হাওয়ায় গরমটা তত তীব্র বোধ হচ্ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে পাঁচ ভাই কদম গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় বিশ্রাম করছিল। পাঞ্চালী আহারাদি সেরে ঘর গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত ছিল। সবকিছু সেরে তাদের মধ্যে যখন এসে বসল তখন মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে। সূর্য কিছুটা পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে।

সহসা বনভূমি চমকিত করে সম্মিলিত মানুষের কণ্ঠ-ধ্বনিত হল 'হর হর মহাদেব।' পঞ্চপাণ্ডবসহ পাঞ্চালী চমকে উঠল সে বজ্র ঘোষণায়। কিছু বোঝার আগেই সশিষ্য দুর্বাসা মহা কোলাহল করে তাদের কুটীরের দিকে ধেয়ে এল।

অকস্মাৎ দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান হল। আচমকা দুর্বাসাকে দেখে পাঞ্চালী বিব্রত ও অসহায়বোধ করল। আর তখনি তার বুকের ভেতর প্রচণ্ড ধকধক শব্দ হতে আরম্ভ করল।

দুর্বাসা অত্যন্ত কোপন স্বভাবের ঋষি। ভীষণ অসহিষ্ণু। একটুতেই ক্রুদ্ধ হন আর শাপ দেন। শাপের ভয়েই লোকে তটস্থ থাকে। দেবতাকে পর্যন্ত খাতির করেন না। একবার বিষ্ণুর গৃহে অতিথি হয়ে তপ্ত পায়সান্ন ভক্ষণ করতে গিয়ে তার জিভ পুড়ে গেল। ক্রুদ্ধ ঋষি তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত বিষ্ণুকে পদাঘাত করল। সেই থেকে দুর্বাসার তেজ, সাহস, স্পর্ধা, দর্প বেড়ে গেল। মানুষের ভাল করতে তিনি জানেন না। শুধুই মন্দ করেন। সুতরাং একটা কিছু মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে যে কাম্যকবনে এসেছেন তাতে পাঞ্চালীর কোন সন্দেহ রইল না। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পার করে এতগুলো লোক নিয়ে হঠাৎ তাঁর অতিথি হওয়া কেন?

ভয়ে পাঞ্চালীর মুখ শুকিয়ে গেল। হতাশ চোখে সে একবার যুধিষ্ঠিরের দিকে আর একবার মধ্যম পাণ্ডবের দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। উদ্বেগে কণ্ঠস্বর আপ্লুত হল। চাপা গলায় অস্ফুট একটা শব্দ করে বলল : সর্বনাশ? ঘরে এককণা অন্ন পর্যন্ত নেই। এক-কোণে কয়েকটা ফল পড়ে আছে। এতগুলো লোককে কি দিয়ে

আপ্যায়ন করব? আমি ত কোন উপায় দেখছি না। সর্বনাশের যেটুকু বাকি ছিল ক্ষ্যাপা ঋষির কোপে সেটুকু এবার হবে বাল, এখন করবে কি? মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে ত কিছু হবে না। একটা কিছু কর।

যুধিষ্ঠির সহসা কথা বলতে পারল না। দুশ্চিন্তায় তার কপালের বলিরেখাগুলো গভীর হল। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্নভাবের মধ্যে তার দু'চোখের পাতা সুনিবিড় হল। কিন্তু তখন ভাববার সময় নেই। বুকের মধ্যে একটা ঝড়ো বাতাসের দোলা। সাশিষ্য দুর্বাসা যে একটা অঘটন ঘটাতে এসেছে তাদের উল্লাস, কোলাহলেই টের পেল। কিন্তু কেন, তা ভেবে কূল কিনারা হারিয়ে ফেলেছিল। পাঞ্চালীর কথায় তার চৈতন্য ফিরে এল। অতিথিকে কিভাবে আপ্যায়ন ও অভ্যর্থনা করলে সবকুল রক্ষা পায় তার একটা উপায় তৎক্ষণাৎ ভেবে নিয়ে ছুটে গেল তার দিকে। অন্য ভ্রাতারা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করল। আর পাঞ্চালী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ দৃষ্টিতে অপলক চেয়ে রইল। দু'চোখে বিষাদের ছায়া। কিছু যেন একটা ঘটার ভয়ে শঙ্কিত। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় সে আকুল হয়ে কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল। কৃষ্ণ নামে কি সুধা আছে জানে না পাঞ্চালী। কিন্তু ঐ নাম মুখে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন অনুভূতিতে তার বক্ষ প্লাবিত হল।

কতকাল কৃষ্ণকে দেখে না। অদর্শনের ব্যাকুলতায় তার বুক ফাটাতে লাগল। ঐ মানুষটাকে একবার চোখে দেখতে না পাওয়ার শূন্যতা কতখানি পাঞ্চালীর বুকের মধ্যে জমেছিল এই মুহূর্তে টের পেল। কিন্তু মনের সে বিরহ কাতরতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। অল্পক্ষণের মধ্যে বিমর্ষভাবনা তাকে গ্রাস করল। আকুল কণ্ঠে সে কৃষ্ণকে ডাকল। সখা, দুঃখ-কষ্ট ছাড়া তুমি কিছুই দাওনি জীবনে। সুখ কী বস্তু টের পেলাম না। এত দুঃখ, যন্ত্রণা দিয়েও তোমার সাধ পূর্ণ হল না। তাই এবার দিতে এলে অভিশাপ। কিন্তু পরক্ষণেই তার স্পর্শকাতর মনটি। কৃষ্ণকে অভিযুক্ত করার জন্যে কষ্ট অনুভব করল। আবার তার উপর অভিমানও হল। সচেতন মন নিয়ে সে

বিচার করল। এই পরম দুঃসময়ে পৃথিবীর আর কোন আত্মজন কিংবা সুহৃদকে নয় শুধু কৃষ্ণের কথাই মনে পড়ল। কেন? বিপদে পড়লে মানুষ আর্তের রক্ষক, বিপদের পরিত্রাতা শ্রীভগবানকে স্মরণ করে তাঁর শরণাগত হয়। আর সে-সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভগবানকে নয়, কৃষ্ণকে ডাকছে। তার শরণাপন্ন হচ্ছে। কৃষ্ণই তার ভগবান, তার ইষ্ট।

চারদিকে ছোট মনের ছোট স্বার্থের মানুষজনের মধ্যে অহরহ বাস করতে করতে মনের চিন্তাশক্তিটাই তার নষ্ট হয়ে গেছে। সত্যিই যখন চরম বিপদে পড়ে আকুল হয়ে তাকে ডাকে তখনই কে যেন তাকে মনে শক্তি দেয়, তার সকল বাধা থেকে উদ্ধার করে। পাণ্ডব দুশাসনের হাত থেকে একদিন তার লজ্জা রক্ষা করেছিল প্রিয়সখা। সেই অনুভূতিটা ফুলের মিষ্টি সুবাসের মত তার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ল। আর তাতেই তার আকুল করা প্রার্থনাটা অন্যরকম হয়ে গেল। মনে মনে আর্তরবে ডাকল! হে কৃষ্ণ, প্রিয়সখা আমার। আমি তোমার শরণাগত। তুমি আমাকে রক্ষা কর। কুরুসভায় নির্লজ্জ দুঃশাসনের হাত থেকে আমাকে যেমন রক্ষা করেছিলে। আজ এই মহাসংকট থেকে তেমনি করে আমাকে পরিত্রাণ কর। ক্ষুধার্ত দুর্বাসা এবং তার শিষ্যদের উদর পূর্তি করার মত কোন সংস্থান আমার ঘরে নেই। আমি কি করব সখা? আমাকে পথ দেখাও। উদ্ধার কর। ওগো দয়ার সাগর, দীনবন্ধু দুর্বাসার কোপানল থেকে তোমার প্রিয়সখা পাণ্ডবদের রক্ষা.কর। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। ওগো বাতাস আমার এ ডাক সখার কানে পৌঁছে দাও। হে আকাশ, আমার সখাকে একবারটি এনে দাও।

অকস্মাৎ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ এবং অশ্বখুর ধ্বনি মধ্যাহ্নের মৌনতা মুখর করে তুলল। পাঞ্চালী দেখল সুদৃশ্য একটি রাজকীয় রথ এসে থামল কুটীর অঙ্গনে। আর তা থেকে যে নামল তাকে দেখে আনন্দে পাঞ্চালীর দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। নিরুচ্চারে নিজের মনে

বলল : আমি জানতাম, তুমি আসবে সখা। আমার ডাকে না এসে পার না।

কাকতালীয়ভাবে কৃষ্ণ ঘটনাস্থলে হঠাৎ এসে পড়ল। তার দেখা পেয়ে পাঞ্চালী হাতে চাঁদ পেল। আর উৎকণ্ঠা নেই। এক বুক প্রত্যাশা নিয়ে কৃষ্ণের দিকে দৌড়ে গেল। কৃষ্ণ রথ থেকে নামতে নামতে তার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলল : প্রিয় সখি বড় অসময়ে এসেছি। জানি হাঁড়িতে তোমার কিছু নেই। কিন্তু পেটে ভীষণ ক্ষিদে। ঘরে যা আছে তাই দাও। কিছু না হলে, জল দাও, অন্তত। কথাগুলো কৃষ্ণ বেশ জোরে জোরে কাউকে শুনিয়ে যেন বলল।

কৃষ্ণের কথা শুনে থমকে দাঁড়াল পাঞ্চালী। আশাভঙ্গতায় ছাই হয়ে গিয়ে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। যেন অপরাধ আর রাখার জায়গা নেই। বুকটা অপমানে ভেঙে যেতে লাগল। তার অন্তরের, তার সব যন্ত্রণার গভীর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অজানতে কান্নায় দু'চোখ জলে ভরে গেল। নিঃশব্দে অসহায়ভাবে পাঞ্চালী কাঁদছিল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো পাঞ্চালী কাঁপা গলায় ভাঙা স্বরে বলল। আর কত অপমান করবে তুমি? বনবাসী ভিখরী পাণ্ডবদের সবদিন আহার জোটে না। এতো তুমি জান। তা'হলে পরিহাস করলে কেন? কী সুখ পেলে? ঘরে উদ্বৃত্ত আহারের কোন সংস্থান থাকে না জেনেও তুমি ব্যঙ্গ করলে সখা? আর কেউ হলে দুঃখ পেতাম, কিন্তু অপমানিত হতাম না। 'কিছু না হলে জল দাও' কথাটা আমার দু'কান ভরে রয়েছে। অপমানটা কাঁটার মত বিঁধছে।

সপ্রতিভ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ তাকিয়ে রইল সন্ধ্যাতারার মত নরম নীলাভ দ্যুতিতে। অপাপবিদ্ধ উৎসুক চাউনিতে তার কৌতুক, ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। পাঞ্চালীর অভিযোগে সে একটুও বিচলিত হল না। একটু সমবেদনা জানাল না। তার এই নীরবতা পাঞ্চালীর কাছে দুঃসহ ঠেকল। বড় অপমান লাগল অভিমানের সাগর উথলে

উঠল বুকে। বলল : তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না সখা? মান, সম্মান, সবকিছু হারিয়ে গেছে আমার। এমনকি তুমি! কি পাপ যে করেছিলাম আমি। কার কাছে কোন জন্মে, জানি না।

কৃষ্ণের হাসিটা বড় অদ্ভুত। অন্য দশটা সাধারণ হাসির সঙ্গে একেবারেই মিল নেই। রহস্যময় হাসি। নির্বিকারভাবে বলল : সখী তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি আমার পেট ভরবে? কিছু কর।

পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ নিজের মুখে অকপট এমন করে ক্ষুধার কথা কখনো প্রকাশ করিনি। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্যে যে কৃষ্ণের শরণাপন্ন, সে নিজেই ক্ষুধায় কাতর হয়ে তার কাছে অন্ন প্রার্থনা করছে। কিন্তু পাঞ্চালী কোথা হতে আহারের ব্যবস্থা করবে? লজ্জায়, অপমানে তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল : সখা তোমাকে এভাবে অভুক্ত দেখার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন? একটু আগে আসতে পারলে না? আমার আহারও শেষ। এখন কোথা থেকে ক্ষুধা মেটানোর খাদ্য দেব অতিথিকে? কী সুখে যে রেখেছ আমায় ঈশ্বর জানে। ক্ষুধার্ত অতিথিকে আহার্য দেবার জন্যে আমি কি করব তুমি বলে দাও! বড় অসহায় আমি।

পাঞ্চালী দ্রুত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কৃষ্ণ বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা পাঞ্চালীর দিকে। তার উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দুটি দৃষ্টি পাঞ্চালীকে ছাপিয়ে প্রসারিত হয়ে গেল দুর্বাসার দিকে। অনেক আগেই দুর্বাসাকে দেখেছিল। তবু তাকে না দেখার ভান করেছিল। তার কারণ একটাই। দুর্বাসাকে না চটিয়ে, পাণ্ডবদের প্রকৃত অবস্থা ও সংকটটা ছল করে তাকে জানান দেবার জন্যেই নিজেকে নিয়ে কৃষ্ণ এক নাটক করল।

হঠাৎ কোন পরিচিতকে দেখলে ভেতরটা যেমন খুশিতে ভরে উঠে তেমনি উথলে উঠা এবং খুশি নিয়ে কৃষ্ণ পাঞ্চালীর কাছ থেকে আচমকা দুর্বাসার দিতে দৌড়ে গেল। কণ্ঠস্বরে বিশ্বের বিস্ময়। ঋষিবর! আপনি! কতক্ষণ এসেছেন? কী পরম ভাগ্য আমার। এমনভাবে দেখা হবে ভাবতে পারিনি।

দুর্বাসার চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা বিহ্বলতার ভাব। মুখে মিষ্টি ভদ্র হাসি। বলল : অনেককাল পর তোমার স্নিগ্ধ সঙ্গ পেলাম। কিন্তু তুমি কোথা থেকে?

দুর্বাসার প্রশ্নে কৃষ্ণ তার শ্রীময় মুখখানা ভরে একটা ভারী সুন্দর হাসি হাসল। বলল : এই পথেই দ্বারকায় ফিরছিলাম। পথে শুনলাম, প্রিয় সখিসহ পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে আছে কিছুক্ষণের জন্য ওদের মধ্যে একটু কাটিয়ে যেতে এলাম। কিন্তু বড় অসময়ে এলাম। ঋষিবরের মুখখানাও বড় শুকনো দেখাচ্ছে। বোধহয় কিছু খাওয়া হয়নি।

দুর্বাসা মুখ তুলল। কৃষ্ণের এহেন প্রশ্নে দুর্বাসার বিব্রত বোধ করল প্রশ্নটা ব্যঙ্গ না বিদ্রূপ তা বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর বিমর্ষ গলায় বলল, বড় অসময়ে এলাম না? মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

বিস্ময়ে কৃষ্ণ চোখ তুলে বলল : আপনিও তা হলে অসময়ের অতিথি। কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ায় নিজেই লজ্জিত হল। তাড়াতাড়ি নিজের ভুলটা সংশোধন করে নেয়ার জন্যে বলল : সময়, অসময় বলে কোন কথা নেই। আন্তরিকতাই সব। এই যে দীর্ঘ পথশ্রম করে পাণ্ডবদের খোঁজ করতে এসেছেন, তারা কেমন আছে, কিভাবে আছে, কি করে দিন কাটাচ্ছে, একান্ত আপনজন ছাড়া কে খোঁজ নেয় তার। এত'ত ঋষি মুনি আছে, এক আপনি ছাড়া কে এদের খোঁজ-খবর নেল বলুন? আপনার মত শক্তিমান, মহান মহাপুরুষকে পাশে পাওয়া পাণ্ডবদের পরম সৌভাগ্য। আপনি যে তাদের কত বড় বন্ধু ও পরম আত্মীয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আজ যেভাবে অনুভব করবে, আগে কখনও সেভাবে পারিনি। কিছু কিছু ঘটনা শুধু ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন অবস্থার ভেতর ভিন্নভাবেই শুধু জানা যায়। সেই জানাটা যে কত বড় সত্য আপনিও তা টের পাবেন। আপনার এই উদারতা, মহানুভবতা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে পাণ্ডবদের বিজয় ইতিহাসে। এক নতুন দুর্বাসার জন্ম হবে। পেটে ক্ষিদে

নিয়েও যে মিষ্টি মমতায় গলে যায়, ভুলে যায় সব ক্ষুধা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা।

কৃষ্ণের মন ভেজানোর করার কি উত্তর দেবে দুর্বাশা? কোন কথাই তার মুখে এল না। শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ পেতে রাখল কৃষ্ণের মুখের উপর। কৃষ্ণের মুখে চোখে এক অদ্ভুত, অপার্থিব মুগ্ধতার ভাব নেমে এল। চোখ দুটিতে গভীর সম্মোহন। কৃষ্ণের চোখের ফাঁদে সেই যে সব ধরা পড়ল দুর্বাসা, তারপর থেকে শরীরের মধ্যে শিহরণের তরঙ্গ বয়ে গেল। শিহরিত আনন্দের উইীবক স্পর্শে তার চোখমুখ উজ্জ্বল করে দিল।

অরণ্যের নির্জনতায় দাঁড়িয়ে দুর্বাসা অনেক বড় একটা কিছুকে অনুভব করল। তাঁর মনে হল, মানুষের জন্যে কৃষ্ণের কিছু করার আছে। সব মানুষ সেটা টের পায়। সেজন্য ভারতবর্ষের অন্যসব মানুষের চেয়ে কৃষ্ণকে জনগণ বেশি ভালবাসে। শ্রদ্ধা করে। তাদের কাঙাল মন এই মানুষটির কাছ থেকে বেশি করে সহানুভূতি চায়। তার সান্নিধ্য পেতে ভালবাসে। এই মানুষটার ভেতর তাদের পরিত্রাতার অস্তিত্বকে অনুভব করে। কৃষ্ণের অপার করুণার মহৎ অনুভূতিতে দুর্বাসার চিত্ত আবিষ্ট হয়ে গেল। ধ্যানের সময় যেমন হয় তেমনি তার চেতনার ভেতরে সমস্ত সত্তার ভেতরে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক অস্তিত্বকে অনুভব করল। অমনি এক অদ্ভুত, অকারণ শিহরিত আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল তার সারা শরীরে ভেতরে। তাঁর মনের অন্ধকারে গহনলোকে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ যেন বসছে। দুর্বাসা, ক্ষুধা তৃপ্ত হলেই পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতে ধন্য ধন্য করে চলে যাবে। আর নিরাশ হলে অভিশাপ দেবে। একবারও বিচার করবে না অসময়ে হয়ত এতগুলো মানুষের খাবার লোকালয়-বর্জিত অরণ্যে কোথা থেকে আসবে? কেমন করে বা যোগাড় হবে? জেনেশুনে গৃহস্বামীকে অপদস্ত করতে এলে কেন? কার প্ররোচনায় এলে? এরা ত তোমার কেউ শত্রু নন। বরং এদের জননীর প্রতি তুমি এক-

কালে আসক্ত ছিলে।* তাহলে এদের কোন ক্ষতি করতে এসেছ? ঋষিবর, তুমি মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছ। তুমি ভুল করেছ ঋষি। বাইরে থেকে কোনকিছুই মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না। যে মন নিয়ে এসেছ সে-মনে সততা, ধর্ম এখনও বেঁচে আছে। সেই পবিত্র মনটাকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার।

হঠাৎ নিদারুণ একটা অপরাধবোধে আর অনুশোচনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার মন। তাল তাল কাদার মত ঘৃণা জমে উঠল মনে। আর অসহ্য অনুশোচনায় যন্ত্রণায় তার চোখ ফেটে জল এল। কৃষ্ণের দু'নয়নের উপর তার চোখ দুটি স্থির হয়ে রইল। সম্মোহিতের মত মনে মনে বলল: কৃষ্ণ তুমি কে জানিনা? কিন্তু তোমার অলৌকিক মহিমায় আমার ধর্মরক্ষা হল। তুমি আমাকে অন্ধকার গুহা থেকে আলোয় নিয়ে এলে। ওগো আলোর দূত, একদিন দূর ভবিষ্যতের অনাগত কালের মানুষকে দুঃখ দুর্যোগের অন্ধকারে তুমি আলোর সন্ধান দেবে। তুমি কখনো সাধারণ মানুষ নও। তুমি আমার চৈতন্যময় ঈশ্বর। তোমাকে আমি প্রণাম করি। মহৎ একটা আবেগে উদ্দীপ্ত দুর্বাসার মন চলে গেল কোন এক অজানা ঊর্ধ্বলোকে। আশ্চর্য একটা প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। মনে হল কৃষ্ণের দীর্ঘতনু আরও দীর্ঘতর হয়ে প্রসারিত হতে হতে দিগন্তবিসারী আকাশের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। আর তার অন্তরের ভেতর, সমস্ত সত্তার ভেতর স্নিগ্ধ গম্ভীর মন্ত্র স্বরের মত ধ্বনিত হতে লাগল: কৃষ্ণ, ভগবান স্বয়ম্ভু। আর কেমন একটা আশ্চর্য আত্মপ্রসাদে ভরে উঠল তার অন্তর।

গভীর বিষাদের প্রতিমার মত পাঞ্চালী বাঁর পায়ে মাটির রেকাব ভরে সামান্য ফলমূল নিয়ে নিঃশব্দে দীন কৃপাপ্রার্থী পূজারীর মত দুর্বাসার সামনে এসে দাঁড়াল। তার ছায়ায় দুর্বাসার ভেতরটা চমকে উঠল। কিন্তু কথা বলতে পারল না। দূরাগত বাণীর মত কানে শুনছিল: তুমি দয়ালু হও। তবে তুমি ঈশ্বরের দয়া পাবে।

---

* মৎ লিখিত "কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন" গ্রন্থে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

পাঞ্চালী গলবস্ত্র হয়ে দুর্বাসাকে প্রণাম করে ফলের পাত্র এগিয়ে ধরল। ঋষির মুখের উপর জলভরা দুটো চোখের করুণ দৃষ্টি তুলে ধরে বলল: ঋষিবর আপনাকে সেবা করতে পেরে ধন্য হল দাসী। কিন্তু পরিতৃপ্ত হওয়ার মত তেমন কিছু করতে পারলাম না বলে মনে অতৃপ্তি থেকে গেল। সামান্য ফলমূলে আপনাদের ক্ষিদে মিটবে না। কিন্তু এত অবেলায় অভুক্ত থাকাও খারাপ। গৃহীর অকল্যাণ হয়। অনুগ্রহ করে পাঞ্চালীর সামান্য সেবাটুকু গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।

সম্মোহিতের মত দুর্বাসা পাঞ্চালীর হাত থেকে মাটির রেকাব নিল। বলল: কল্যাণী, তোমার সেবা যত ক্ষুদ্র হোক, মহৎ দানে ভরপুর। তাকে অনাদর করব এত নিষ্ঠুর আমি নই। তোমার মনে কষ্ট দিয়ে আমিও সুখ পাব না। সুখ বাইরের কোন বস্তু নয়, অন্তরে তার আয়োজন সুসম্পূর্ণ হলে তবে বাইরের স্পর্শে তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে। কৃষ্ণের কল্যাণে এ এক নতুন উপলব্ধি আমার। এমন করে আমার মনকে কেউ বদলে দিতে পারিনি। আগুন যেমন জলকে বদলে বাষ্প করে দেয়, তেমনি সম্পূর্ণ পরিবর্তন অনুভব করছি। বড় পবিত্র লাগছে। আমার গোটা মনকে কৃষ্ণ শুচি করে দিল। সত্যি আমার নবজন্ম হল।

তারপর কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বলল: একজন মানুষের অন্তঃকরণকে এমন করে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ বদলে দিতে পারে না। ঈশ্বরের সেই কাজ করে তুমি, নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করলে কৃষ্ণ। আমার ধ্যানের দেবতাকে আমার ঈশ্বরকে তোমার মধ্যে চকিতে দেখলাম। তুমিই আমার ইষ্ট। আমার ঈশ্বর। ছল করে ভক্তকে দেখা দিতেই কাম্যকবনে এসেছ। ভক্তের ভক্তি শ্রদ্ধা, প্রণাম যদি সব ভগবানের পায়ে নিবেদন করতে হয়, তা হলে আমার সবকিছু তোমাকে নিবেদন করলাম।

কৃষ্ণের কোন ভাবান্তর নেই। প্রণত দুর্বাসাকে কোনরকম নিবৃত্ত করল না। চোখে কোন বিস্ময়বোধও ফুটল না। ঠোঁটের কোণে প্রসন্ন মৃদু হাসিটি ক্রমে বর্তুল হয়ে উঠল।

স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে পাঞ্চালী নিষ্পলক কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল দুর্বাসার দিকে। এক মায়াবী আলো যেন ঘিরে আছে ঋষির মুখমণ্ডলে। কিছুক্ষণ আগেও যার আগমন ছিল ভয়ের, উদ্বেগের, দুশ্চিন্তার, সহসা তার সান্নিধ্য মধুর হয়ে উঠল যেন।

দুর্বাসা বিদায় গ্রহণ করল। কৃষ্ণ পাঞ্চালীর দিকে চেয়ে ছিল। ঠোঁট টিপে ধরে মৃদু মৃদু হাসছিল। চোখে কৌতুকের ছটা মুখে খুশির দ্যুতি। তার স্নিগ্ধ, শান্ত দুই চোখের উপর চোখ রেখে পাঞ্চালী বলল সখা, বিপদে পড়ে যখনই ডেকেছি, তুমি সাড়া দিয়েছ, অপমান থেকে, লজ্জা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে তুমি আমাকে ধন্য করেছ। তুমি আমার সচল ভগবান। আমার ইষ্ট। আমার ধ্যানের দেবতা। তোমাকে আমার শতকোটি প্রণাম।

॥ চার ॥

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। কিন্তু দুর্যোধন কিছুতে মেনে নিল না। অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই দুর্যোধন তাদের প্রচ্ছন্ন অবস্থান টের পেয়ে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করল। গোধন হরণ ছিল দুর্যোধনের ছলনা। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণ হওয়ার আগেই উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে সবাকার দৃষ্টির সামনে তাদের ছদ্মবেশ খুলে দিল। ছদ্মবেশধারী পঞ্চপাণ্ডবকে চিনতে কারো ভুল হল না। ভুল হবে কেমন করে? বৃহন্নলার দুর্বার আক্রমণের সামনে অস্ত্রগুরু দ্রোণ, কৃপ কিংবা কর্ণ পর্যন্ত আক্রমণে ব্যর্থ হল। ব্যর্থতাই চিনিয়ে দিল বৃহন্নলাই অর্জুন।

যুধিষ্ঠিরের চিন্তার অন্ত নেই। হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। যুদ্ধই স্থায়ী মীমাংসার একমাত্র পথ। কিন্তু যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের মতি নেই। যুদ্ধে স্থায়ী লাভ কিছু নেই। বিরাট ক্ষয়-ক্ষতির মূল্যে যা পাওয়া যায় তা অকিঞ্চিৎকর। জয়ের পরে ক্লান্ত দিনগুলো আনবে অবসাদ, অনুশোচনা। যুদ্ধ না করে স্থায়ী শান্তি-পূর্ণ কোন মীমাংসায় পৌছনো যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্য। বিশাল ইন্দ্রপ্রস্থের

রাজ্যের বিনিময়ে পাঁচ ভাইকে দুর্যোধন যদি পাঁচটি গ্রামও দেয় তা-হলেই সন্তুষ্ট হবে।

যুধিষ্ঠিরের চিন্তা-ভাবনা কারো মনঃপূত হল না। কেবল কৃষ্ণই অনুমোদন করল। বলল: যারা সংঘাতের জন্যে তৈরী এবং সংঘাতের উত্তেজনা ছড়ানো যাদের নীতি তাদের প্ররোচনামূলক সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলা প্রকৃষ্ট রাজনীতি। হিংসা কেবলই নতুন হিংসার জন্ম দেয়। হিংসাই হিংসার শেষ কথা। তাই, শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে একটা স্থায়ী সমাধান হোক আমিও চাই।

ভীম বলল: কার সঙ্গে মীমাংসা করবে সখা? একপক্ষের চাওয়ায় কখনও আপোষ হয় না। তাতে আপশোষই হয়। যুদ্ধ না হলে সেই আপশোষ হবে। সখা, তুমিও জান, এ যুদ্ধ আমরা সকলে চাই। পৃথিবীতে এতো পাপ, অধর্ম, অন্যায় জমে উঠেছে যে, তার সার্বিক ধ্বংস ছাড়া কোন বৃহৎ মানবিক কল্যাণ, কিংবা ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কখনো সম্ভব নয়।

দু'চোখে আগুন জ্বেলে পাঞ্চালী বলল: সখা তুমিও। তুমিও অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? তোমার মনে যদি এই ছিল, কাম্যকবনে মিথ্যে সান্ত্বনা দিলে কেন? কেন বললে, যারা তোমার পাতিব্রত্যকে লাঞ্ছিত করেছে, যাদের প্রতি কষ্ট হয়েছে তারা কেউ রেহাই পাবে না। তোমার অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করবে গোটা ভারত-ভূমি। সেকথা ভুলে গেলে সখা?

কৃষ্ণের অধরে মিষ্টি হাসি, চোখে কৌতুকের ছটা। মৃদু মাথা নেড়ে বলল: ভুলিনি সখি।

তা-হলে যুদ্ধ না চেয়ে শান্তির দূত হয়ে হস্তিনাপুরে যাচ্ছ কেন?

সখি, এ রাজনীতি। তুমি বুঝবে না।

তুমি বলেছিলে, মিথ্যে হয় না কৃষ্ণের বাক্য।

মিথ্যে বলোনি।

তোমার কথা আর কাজে কত অমিল! কোন্‌টা সত্য, কোনটা মিথ্যে বুঝতে পারছি না।

বুঝতে চেও না সখী। মানুষ আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। এর পাত্র শূন্য হলে জীবন অর্থহীন হয়। কৃষ্ণের মুখ শ্রীময় হল। চোখেতে কিছু কৌতুক। জীবন রহস্যের না হোক, জীবনযাত্রার রহস্য বুঝতে পারার কৌতুক। পাঞ্চালীর চোখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল: প্রিয় সখী, নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। তোমার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। ভীমসেন যথার্থই বলেছে। বহু পাপ, অধর্ম, অপকর্ম জমে উঠেছে। বড় যুদ্ধ ছাড়া এর নিষ্পত্তি হবে না।' সে যাই করুক এ যুদ্ধ হবে।

সখা, তা-হলে প্রতিজ্ঞা কর, কৌরবের পক্ষ থেকে সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র কিংবা পিতামহ শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ চাইবে। বল, দ্যূতসভায় যারা পাঞ্চালীকে অপমান করল, তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তুমি যুদ্ধ চাইবে। সখা, তুমিও জান দুঃশাসনের বক্ষরক্তে এ কেশ-পাশ রঞ্জিত না-হওয়া পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারছি না। ধর্মরাজ তাঁর ধর্ম নিয়ে থাকুন, আমি চাই কৃষ্ণবাক্য নিষ্ফল না হয়। আমার সখার বাক্য মিথ্যে হওয়ার আগে আমার শিরে যেন বজ্রাঘাত হয়। বলতে বলতে পাঞ্চালীর দুই চোখ তেজোদ্দীপ্ত হল। প্রদীপ্ত চোখে মুখখানিও গন গন করছিল।

যুধিষ্ঠির কিছু বলার চেষ্টা করছিল অনেকক্ষণ ধরে। পাঞ্চালী চুপ করলে বলল: সখা, যে যা বলুক, তুমি কৌরবসভায় সন্ধির প্রস্তাব দাও।

পাঞ্চালী ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধে যেন ফেটে পড়ল। বলল: ছিঃ ছিঃ! স্বামী হয়ে স্ত্রীর সম্মান যে রাখতে পারল না, তার মত ভীরু-কাপুরুষের সন্ধি-ভিক্ষা করবে কোন লজ্জার কাজ নয়। ঐ অক্ষম, অপদার্থ মানুষ-টির প্রতি আমার কোন আস্থা নেই। সখা, আমি তোমার ভরসাতেই আছি। নির্লজ্জ দুঃশাসন যে কালো দু'বাহু ধরে আমাকে সবেগে আকর্ষণ করেছিল সেই বাহুদুটি কবে ভূলুণ্ঠিত দেখব? দুর্যোধন যে উরুদেশে আমাকে আহ্বান করেছিল তার ভগ্নরূপ দেখব কবে?

অধরে কৃষ্ণের মুগ্ধ হাসিটি লেগেছিল। বলল: তোমার আকাঙ্ক্ষা

অচিরেই পূরণ হবে। রণাঙ্গণে তারা শৃগাল-কুকুরের খাদ্য হবে।

এসব জেনেও হস্তিনাপুর যাবে তুমি?

হ্যাঁ। তবু যেতে হয়। রাজনীতি বড় দুর্জ্ঞেয়, বড় জটিল। ধর্মরাজের জন্যে নয়, মানবিক কর্তব্যে যেতে হবে। লোকে বলবে, কৃষ্ণ একটু ইচ্ছে করলে এ যুদ্ধ হত না। ভাইয়ে-ভাইয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করতে পারত সে। কিন্তু তা হবার নয়। এ ভুল ধারণা ভাঙার জন্যে আমার কৌরবসভায় যাওয়া খুবই দরকার। আর কিছু না হোক, অপবাদও দিতে পারবে না। কর্তব্য করা হবে।

পাঞ্চালীর আশংকা গেল না। উৎকর্ণ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল: আমার উৎকণ্ঠার কোন সুরাহা হল না। তুমি সব উল্টে দিতে পার। যা হওয়ার নয়, তা যদি হয়ে যায় তা-হলে যুদ্ধ হবে না। দুর্যোধনের অনুগ্রহ কৃপা নিয়ে ধর্মরাজের সিংহাসনে বসতে লজ্জা করবে না, কিন্তু তোমার প্রিয়সখী তার অপমান এবং দুঃখ নিয়ে আগুনে আত্মাহুতি দেবে। এ আমার আস্ফালন নয়, অঙ্গীকার।

কৃষ্ণ নীরবে শুধু হাসল। অদ্ভুত রহস্যময় সে হাসি। যার অর্থ বিবিধ।

অনন্ত বিস্ময় নিয়ে দ্বৈপায়ন থম হয়ে বসে রইল। অনেককাল আগের সেই স্মৃতি তার চেতনায় দীপ জ্বেলে দিল। কাল তাকে জীর্ণ করতে পারেনি। মনে হল, সেই কালের ভেতর সে প্রবেশ করেছে। সবকিছু তার চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দ্বৈপায়ন যেন দেখতে পাচ্ছিল। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে হস্তিনাপুর এসেছে। কিন্তু একা নয়। সঙ্গে তার সাত্যকী, আর সুশিক্ষিত সশস্ত্র এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। শান্তির দৌত্যগিরি করতে এভাবে কৃষ্ণের আগমনটা অনেকের পছন্দ হল না। আর পাঁচজনের মত দ্বৈপায়নও বিস্মিত হল। কিন্তু কৃষ্ণের কোন্ কাজটা না আশ্চর্যের! সাধারণ মানুষের সাধ্য কি তার অদ্ভুত আচরণের রহস্যোদ্ঘাটন করে।

কৃষ্ণের একটা তৃতীয় নয়ন আছে। অনাগতকে দেখার চোখ আছে।

জীবনের অনেক কিছুই আগে থেকে সে টের পায়। উদ্ভূত ঘটনা ও দেশ-কাল-পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এক অসাধারণ ক্ষমতা আছে তার মধ্যে। সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের সাধ্য কি তার অসাধারণত্ব পরিমাপ করে? দ্বৈপায়ন সেই ব্যর্থ চেষ্টা করল না। শুধু কি ঘটছে তার উপর দৃষ্টি রাখল। কিন্তু কি ঘটবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তবে, প্রজ্ঞা দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিল, কৃষ্ণের দৌত্যগিরিতে কৌরব-পাণ্ডবের বিরোধের একটা মোড় ফিরবে।

কৌরবসভায় কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আদর্শের সঙ্গে মিশেছে কর্তব্যের উন্মাদনা। চোখে মুখে তার আদর্শবাদের প্রশান্ত দীপ্তি। যথা-সম্ভব নিরাবেগ চিত্তে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের দাবি ও অধিকার নিয়ে যুদ্ধের বদলে কৌরবদের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসায় শান্তিপূর্ণভাবে ইন্দ্র-প্রস্থের পরিবর্তে পাঁচ ভাইয়ের জন্যে মাত্র পাঁচটি গ্রাম হস্তান্তরের প্রস্তাব করল। অমনি আলোচনা বাকবিতণ্ডা, কলহে পরিণত হল। কিন্তু কৃষ্ণ কোন বিতর্কে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল না। কারণ, সে বুঝেছিল ধৈর্য, সংযম এবং দূরদৃষ্টি ছাড়া এ খেলায় জয় কঠিন। উত্তপ্ত কলহের মধ্যে কৃষ্ণ কেবল নির্বিকার, নিশ্চল। ঠোঁটে হাসির বক্ররেখা খেলে গেল।

ধৃতরাষ্ট্রের তখন ভয়ংকর মানসিক সংকট। কুরু-পাণ্ডবের বিরোধের এক নয়া ইতিহাস তৈরী করতে এসে একেবারে অন্তিম অধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজেই দুর্যোধনদের চক্রান্তে বন্দী হল। কিন্তু কৃষ্ণ তাতেও বিরক্ত হল না। কিংবা ক্রুদ্ধ হল না। বরং হাসি হাসি মুখে বলল: বেশ'ত আমাকে বন্দী করে যদি তোমাদের রোষ মিটে যায়, সর্ব-নাশের পথ ছেড়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলে যাও, একটা বিরাট ধ্বংস থেকে যদি নিজেদের মুক্ত করতে পার তাহলে আমার এই বন্ধন হয়ে উঠবে সবচেয়ে বড় মুক্তি। চিরদিন মানুষের মুক্তি কামনা করে এসেছি। অবিচার, অত্যাচার, অধর্ম থেকে তাদের মুক্ত করেছি। এখন সেই মুক্তির জন্যে যদি তোমাদের বন্দী হই তাহলে কোন দুঃখ থাকবে না।

কৃষ্ণের বাক্য সকলের হৃদয় স্পর্শ করে গেল। মনে মনে পিতামহ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর তাকে প্রশংসা করল। কিন্তু তাদের কিছু করার ছিল না। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে পুত্তলিকাবৎ বসে রইল।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কানে কানে বলল: মহারাজ, তোমার চোখ থাকলে দেখতে পেতে, তোমার দুর্বিনীত, উদ্ধত পুত্ররা কৃষ্ণকে বন্দী করতে জোট বেঁধেছে। কৃষ্ণ দূত। দূতের কাজ করেছে। কোন অভিসন্ধি নিয়ে আসেনি। সুতরাং তাকে এভাবে নিগৃহীত করা কিংবা অপমান করা শোভন নয়। এত বড় একটা অপকর্ম করে বসার আগে তাদের নিরস্ত কর, কৃষ্ণের কাছে তাদের হয়ে তুমি মার্জনা চাও।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: পুত্রেরা আমার বশে নেই। আমি বৃদ্ধ, অন্ধ, অশক্ত। দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে পারি না। কৃষ্ণ, ভাই আমার, বন্ধু আমার তুমি এদের ক্ষমা কর। ওদের চেয়েও ভয়ংকর দুর্বৃত্তদের তুমি বশ করেছ, ওদের পার না?

কৃষ্ণের মুখে ঈষৎ হাসি ক্রমে বঙ্কিম ও কুটিল হল। দুর্যোধনের দিকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল: দুর্যোধন, তুমিও পাণ্ডবদের মতই আমার আত্মীয়। প্রীতিভাজন। এখনও সময় আছে, জেদের বশে অনর্থ ডেকে এনো না। সংগ্রাম হল শেষ পথ। সে পথ সব সময় খোলা আছে। একবার সংগ্রামে নামলে সম্পূর্ণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তা থামবে না। রাজ্য শ্মশান হয়ে যাবে। রাজকোষ অর্থশূন্য হবে। রাজ্য প্রজাশূন্য হবে। কী হবে যুদ্ধ করে? পাণ্ডবেরা যখন পাঁচখানা গ্রামে সন্তুষ্ট হতে চাইছে কী দরকার আছে একটা বড় যুদ্ধকে ডেকে আনা।

দুর্যোধন নিরুত্তর। কর্ণ বলল: শত্রুর সঙ্গে আপোষ করা মানে শত্রুকে প্রশ্রয় দেয়া। শত্রুকে ছোট চোখে দেখতে নেই। মনের গোপন হিংসার ছুরিতে সে শান দেবে। একদিন তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে যুদ্ধ হবেই। সুতরাং শত্রুপক্ষ দুর্বল থাকতে থাকতেই সেই বোঝাপড়াটা করা ভাল।

দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ বলল: অঙ্গরাজের কথাই যথার্থ। আমারও

অভিমত তাই।

কৃষ্ণ জলদগম্ভীর গলায় বলল : দুর্যোধন, তুমি আজ দুষ্ট চক্রদ্বারা পরিবৃত। তুমি নিজের বশে নেই। দুষ্ট চক্রের হাতের পুতুল। তোমার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের কথায় চালিত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় এই দৃশ্য আমাকে দেখতে হল। এতে আমার কাছে তোমার মর্যাদা, গৌরব কত ছোট হয়ে গেল, ভেবে দ্যাখত? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি রাজনীতি কর? পাণ্ডবেরা বিশাল সাম্রাজ্যের পরিবর্তে বিশ্বের কল্যাণের জন্যে অধিকারের প্রতীক হিসাবে পাঁচখানি গ্রাম চাইল। তাদের এ আত্মত্যাগের ভেতর ভবিষ্যৎ শত্রুতার বীজ লুকনো আছে এই হীন কথাটা ভাবলে কেমন করে? প্রকৃত বন্ধু ও আত্মীয়কে মূঢ়ের মত ত্যাগ করলে পরে দুঃখই পেতে হয়।

দুর্যোধন অমনি ক্রোধে জ্বলে উঠল। বলল : কৃষ্ণ তুমি আমাকে ভয় দেখিও না। পাণ্ডবদের সাহস, স্পর্ধা, শক্তির উৎস তুমি। তোমার পরামর্শ, বুদ্ধি নিয়ে যদি তোমার নির্বোধ প্রিয় সখারা রাজনীতি করতে পারে তা-হলে সেই একই রাজনীতি করতে আমার দায় কোথায়? বন্ধুবর কর্ণ, কিংবা মাতুল শকুনি তোমার চেয়ে কোন অংশে কিছু বুদ্ধিতে কম নয়।

কৃষ্ণ সহসা রূঢ় ভর্ৎসনা করে বলল : দুর্যোধন, তোমাকে ভাল কথা বলা বৃথা। তুমি কাল কবলিত।

দুর্যোধনের অট্টহাসিতে সহসা সভাকক্ষ গম গম করে উঠল। বলল : বড় দেরীতে বুঝলে কৃষ্ণ। দুর্যোধনকে ভাল কথা শোনানোর অনেক লোক আছে। কিন্তু পাণ্ডবদের কানে মধুবর্ষণ করার মানুষ একা তুমি। শুধু তোমাকে আটকে রাখলে এ যুদ্ধ হবে না। তুমিই এ যুদ্ধের মহানায়ক। তোমার জন্যে আমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারছি না। তুমি আমাদের সুখ কেড়ে নিয়েছ। তোমাকে নির্মূল করতে পারলেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে। আমি তোমাকেই বন্দী করব। দুঃশাসন, বন্ধু কর্ণ, মাতুল শকুনি বন্দী কর চতুর-শিরোমণি খল-নায়ক কৃষ্ণকে। বন্দী কর।

বন্দী! কংসের কারাগার যাকে ধরে রাখতে পারল না, তাকে বন্দী করা এত সহজ! বলে, কৃষ্ণ হাসল। সহসা তার উচ্চকিত হাস্যে সভা-কক্ষ চমকে উঠল। মনে হল, কোথায় যেন পাহাড়-চূড়া ভেঙে পড়ার শব্দ হল। কৃষ্ণ হাসছিল। সেই অদ্ভুত হাসিটি, ভিতরের সব স্পন্দনকে যেন কয়েক নিমেষের জন্যে স্তব্ধ করে দিল। যেন বা থেমে গেল রক্তের প্রবাহমানতা। বন্ধ হয়ে গেল হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক, ধুকপুক শব্দ।

সম্মোহিতের মত সকলে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে ছিল। কৃষ্ণের চোখ-দুটি ভয়ংকর রকমের উজ্জ্বল। মনে হল, আকাশের কোটি কোটি তারা, গ্রহ সূর্যের আলো নিয়ে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দুটি চক্ষুতারা বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। কিন্তু তার সম্মোহনে আটকে রইল চোখ। অন্যদিকে কেউ দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরব ও নিশ্চল হয়ে বসে রইল। দুর্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন, কর্ণ কাষ্ঠপুত্তলিবৎ দাঁড়িয়ে রইল। নড়বার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাদের ছিল না।

সম্মোহন যখন ভাঙল, বিহ্বলতা যখন কাটল, তখন সভাস্থ ব্যক্তিরা সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল: কৃষ্ণ কোথাও নেই। কেবল তার জায়গায় চার পাষণ্ড পরস্পরকে জড়াজড়ি করে কাষ্ঠপুতুলবৎ দাঁড়িয়ে আছে।

সব ঘটনা এত দ্রুত ঘটে গেল যে তা বিচার করার অবকাশ পর্যন্ত ছিল না। সব কিছু স্বপ্নবৎ মনে হল। কতক্ষণ যে তারা নিস্পন্দ ও স্তব্ধ ছিল, জানে না। মনে হল, একটা লম্বা ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল।

এমন একটা অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড দ্বৈপায়নকে অবাক করে রাখল। কিছুতে তার বিস্ময় কাটল না। যত ভাবে অন্তর তত শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে আপ্লুত হল। মনে মনে সেই পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে বলল: তুমি জগৎ নিয়ন্তা, সর্বব্যাপী, সমদর্শী, তোমার কাছে শত্রুমিত্র বলে কেউ নেই। তবু স্থান বিশেষে যে তুমি শত্রু ও মিত্রের ন্যায় আচরণ কর তার যথার্থ অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারে না, তাই তোমার ভেতর তারা বৈষম্য দেখতে পায়। আমি সর্বত্র তোমার দিব্যভাব ও রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি পূর্ণানন্দস্বরূপ, শান্ত মুক্তিদাতা। সকলের

পরম আশ্রয়। আমার অন্তরের সব অনুরাগ সহজ-সুন্দর ভক্তিতে অভিষিক্ত করে তোমার পদতলে অর্পণ করলাম। তুমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

কথাগুলোর পুণ্য পরশে দ্বৈপায়নের ভেতরটা কী আশ্চর্য আর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে সারা শরীর অবশ করে দিল। মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। মধুর এক প্রসন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। মনে হল, চোখের ভেতর দাঁড়িয়ে যেন অনেক, অনেক দূর থেকে কৃষ্ণ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

একখণ্ড পাথরের উপরে বসে দ্বৈপায়ন কল্পনায় দৃশ্যটা দেখল। হঠাৎ তার বুকের ভেতরে অনেক কালের চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আর সেই সঙ্গে হাটুর উপর কয়েক ফোঁটা জল পড়ল চোখ থেকে। চমকে উঠল দ্বৈপায়ন। জলভরা ঝাপসা চোখে চেয়ে রইল প্রকৃতির দিকে। এ তার দুঃখের কান্না নয়। অনেক কালের একটা চাপা যন্ত্রণা মুক্ত হওয়ায় সুখকর অনুভূতি যেন গলে গলে পড়তে লাগল। অনেক অনেক কাল সে এত সুখ আর আনন্দ মনে অনুভব করেনি।

চোখে দেখছিল অম্বিকার পদাঘাতের দৃশ্য। কদাকার আর কৃষ্ণকায় বলে তার দুই চোখে কী জ্বলন্ত ঘৃণা। সেই ঘটনাটায় হঠাৎ তাকে এনে ফেলল দুঃখের সমুদ্রের মধ্যে। একটানা দুঃখের সাগরে ভাসতে ভাসতে কূলে এসে পৌঁছিয়েছে। কৃষ্ণের দৌত্যের ব্যর্থতায় হঠাৎ তার দুঃখমুক্তি ঘটল। এ কি কম আনন্দ।

কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল বুক। দ্বৈপায়ন সত্যিই নির্ণয় করতে পারল না কৃষ্ণ কে? সে কি মহামানব? স্বর্গের দেবতা? মহাযুদ্ধের নায়ক? না, পতিত ভারতবর্ষের উদ্ধারকর্তা। মানুষের পরিত্রাতা?—কে?

অম্বিকার পুত্র ও প্রপৌত্রদের উপর অদৃষ্ট বিরূপ। চিন্তাটা দ্বৈপায়নকে উৎফুল্ল করল। হঠাৎ কি কারণে তার ভীষণ হাসি পেল। হা-হা শব্দে হেসে উঠল। পরক্ষনেই মনে হল, এ তার হাসি নয়। বুকের ভেতর হায়, হায় করছে কৌরবদের জন্যে। সেই হায় হায়

ভাবটা হাঃ হাঃ শব্দে পরিণত হল। এখন সেই হাসি গলে গিয়ে দুই চোখ জলে ভেসে গেল। হাসি কান্নাকে এক জোয়ালে জুড়ে দিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল নির্জনে। কৃষ্ণ, তুমি রক্ষা কর। রক্ষা কর তোমার সৃষ্টিকে। পরশুরামের মত নির্মানব কর না নিক্ষত্রিয় কর না। কৃষ্ণ তোমার পৃথিবীকে তুমি রক্ষা কর, সুন্দর কর, পবিত্র কর।

কৃষ্ণ সম্পর্কে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা মনে পড়ল দ্বৈপায়নের। সেগুলো উদ্ভট, অসম্ভব. অবাস্তব অথবা অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেবে এমন জোর পেল না মনে। পাবে কোথা থেকে? এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ দ্রষ্টা সে নিজে।

কৃষ্ণের ভেতর এমন একটা ক্ষমতা আছে যা অন্য কোন মানুষের নেই। তার কোন কাজই যুক্তি, বুদ্ধি কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা যায় না। তার বিবিধ কাজের ভেতর এমন অলৌকিক কিছু আছে যা শুধু কৃষ্ণের। মুনি-ঋষিরও সে অলৌকিক ক্ষমতা নেই। যতদিন গেল, আপমর জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হল: কৃষ্ণ পরমপুরুষ। পরমাত্মার অংশ। সে নররূপী বিষ্ণু। দুঃখী মানুষের পরিত্রাতা। কৃষ্ণের এই ঐশ্বরিক শক্তিতে পাণ্ডবেরা ছিল আস্থাবান। কুরুক্ষেত্রের আসন্ন যুদ্ধে তারা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। কৃষ্ণের প্রতি তাদের আনুগত্য ও বিশ্বাসের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় তারা জয়ী হল। সেও এক গল্প।

যুদ্ধের আয়োজন ও প্রস্তুত সম্পন্ন করতে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষে যথাক্রমে অর্জুন ও দুর্যোধন দ্বারকায় গেল। দু'জনেই সমভাবে কৃষ্ণের আত্মীয়। দূতের মুখে কৃষ্ণ আগেই তাদের আগমনবার্তা জেনে ছিল। কক্ষে তাদের ঢোকার আগেই কৃষ্ণ গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। অর্জুন কিংবা দুর্যোধন কেউ তার সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাল না। কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করতে লাগল। নিদ্রাভঙ্গের সাথে

সাথে কৃষ্ণের নজর কেড়ে নেয়ার জন্যে অর্জুন বসল তার চরণপ্রান্তে, আর দুর্যোধন বসল শিয়রপ্রান্তে।

বেশ কিছুক্ষণ পর কৃষ্ণ ধীরে চক্ষু উন্মীলন করল। নয়নপথে সহসা অর্জুনকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল : সখা! তুমি? কতক্ষণ! কী মনে করে দ্বারকা পর্যন্ত ছুটে এলে?

কৃষ্ণের বিস্মিত প্রশ্নে অর্জুনের ভুরুযুগল কুঞ্চিত হল। চোখে-মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠল। চোখে তারায় তার কিসের ইংগিত। সহসা গলা খাকারি শুনে কৃষ্ণ পিছনে তাকাল। দুর্যোধনকে দেখে অবাক হল। শয্যা ছেড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। বিগলিত খুশিতে কণ্ঠ কল কল করে উঠল। বলল : আরে, আমার কী সৌভাগ্য! হস্তিনাপুরাধিপতি দুর্যোধন স্বয়ং আমার গৃহে। ভাবতেই অবাক লাগছে। দীর্ঘকালের বিবাদ ভুলে আমার পরমাত্মীয় আমার ঘরে এসেছে, এর চেয়ে আনন্দ কি আছে আর?

দুর্যোধনের হৃদয় আপ্লুত হল। বলল : কৃষ্ণ, আমি তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।

কৃষ্ণ হেসে বলল : বেশ, নিঃসংকোচে বল।

দুর্যোধন বলল : তুমি মিষ্টভাষী। সম্ভাষণে যদি কপটতা কিছু না থাকে তা-হলে সসৈন্যে আমার পক্ষে যোগ দাও। এই আমার প্রার্থনা।

কৃষ্ণ মৃদু হাসে, অধর রঞ্জিত করে অর্জুনের দিকে চেয়ে বলল : সখা তোমার আগমনের অভিপ্রায় জানতে পারি?

অর্জুন দুটি হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করে বলল : সখা, আমি শুধু তোমাকে চাই। আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমাদের পক্ষে যোগ দাও।

কৃষ্ণের ভুরু কুঞ্চিত হল। বলল : তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা এক। আমি কোন পক্ষকে নিরাশ করব না। কিন্তু একটু ভাগাভাগি করে নিতে হবে। একপক্ষে থাকব আমি একা, কিন্তু নিরস্ত্র, যুদ্ধ করব না এই সর্তে। অন্যপক্ষে থাকবে আমার এক অক্ষৌহিনী নরায়ণী সেনা। এখন অর্জুন বয়োকনিষ্ঠ, তা-ছাড়া নিদ্রাভঙ্গের পর তাকেই প্রথম দর্শন করি। তাই, প্রথম নির্বাচনের সুযোগ

দেব তাকে। আমার সর্ত মেনে তুমি কি আমাকে প্রার্থনা করবে?

অর্জুন প্রফুল্লিত হয়ে বলল: হাঁ সখা। আমরা শুধু তোমাকে চাই। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, অস্ত্র ধর বা না ধর—তুমি আমাদের পাশে থাক, এই প্রার্থনা করব।

এর পর কৃষ্ণ দুর্যোধনের দিকে ফিরে বলল: দুর্যোধন, তা-হলে, তুমি পেলে আমার মতই সমযোদ্ধাসম্পন্ন এক অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা।

দুর্যোধন মাথা নেড়ে বলল: উত্তম প্রস্তাব। তুমি যখন অস্ত্র ধরবে না, তখন মিছিমিছি তোমাকে নিয়ে আমার কি লাভ? তা-ছাড়া তুমি পাণ্ডবদের প্রিয়। তাদের সঙ্গে প্রীতিপাশে বাঁধা। তোমার কাছে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতশূন্য কোন পরামর্শ কিংবা নির্দেশ পাব না, এটা ধরেই নেয়া যায়। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। এতে আমার ভালই হল। আমি তোমার এক অক্ষৌহিনী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নারায়ণী সেনা পেলেই খুশি।

সাফল্যের আনন্দে গদগদ হয়ে দুর্যোধন কালক্ষয় না করে দ্বারাবতী ত্যাগ করল। দুর্যোধনের প্রস্থানের অব্যবহিত পরে কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে বিহ্বল চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: সখা নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ সুযোগটি এমন করে অপব্যবহার করে তুমি ঠিক করনি। আমি তোমাদের কোন কাজে লাগব না। অস্ত্র ধরব না। বড় জোর তোমার রথের একজন সারথী হতে পারি।

অর্জুন হাসি হাসি মুখ করে বলল: আমরা তোমার মত একজন সারথীকে চাইছি যে আমাদের সঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা চাই নেতৃত্ব। তোমার মত একজন নেতার শরণাগত হতে পারা ভাগ্যের কথা। আমাদের যা কিছু শিক্ষা, আদর্শ সব তোমার কাছে পাওয়া। তোমাকে ছেড়ে কি নিয়ে থাকব আমরা? তোমার জন্যে সব ত্যাগ করতে পারি। আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। তুমি যার আশ্রয় এবং ভরসা, তার ভাবনা কি?

কৃষ্ণ হেসে বলল: কিন্তু আমি'ত অস্ত্র ধরব না।

সখা সৈন্যবল আর অস্ত্রবলের যে লড়াইটা সবাকার চোখে পড়ে সে হল বীর্যের লড়াই। লোকে বলে সম্মুখ সমর। কিন্তু আসল যুদ্ধ হল বুদ্ধির। সে হয় লোকচক্ষুর বাইরে, রাজনীতির গর্ভদেশে। সেই বুদ্ধির লড়াইর উপর তোমার কিন্তু কোন শর্ত নেই। এক অক্ষৌহিনী সৈন্য বুদ্ধির লড়াইর কাছে কিছু নয়। আমরা কিছু হারাই নি। তোমার সুযোগের কোন অপব্যবহার করিনি। বরং বিশ্বাসের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় তোমাকে আরো নিবিড় করে পাওয়া হল। তোমার কাছে আজ আমার অনন্ত দাবি। আমার রথের সারথি হও তুমি। তোমার বীর্য ও তেজ সংবৃত রেখে আমাকে বুদ্ধি দাও, আমার জীবন পরিচালিত কর। আমার পথ নির্দেশ কর তোমার কাছে এটাই আমার একমাত্র দাবি ও প্রার্থনা।

খুশিতে ভরে উঠল কৃষ্ণের অন্তর। কেমন একটা অনাস্বাদিত পরম সুখের অনুভূতিতে তার চেতনা আবিষ্ট হয়ে গেল। হৃদয়ের ভেতর তার সপ্তস্বরা বীণা মধুর ঝংকারে বাজতে লাগল। কৃষ্ণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা বলতে পারল না। স্বভাব সুলভ প্রসন্ন হাসিতে অধর রঞ্জিত করে নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

অর্জুন কৃষ্ণের শান্ত নির্বিকার দুই চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গেল হঠাৎ-ই। চোখে শংকার ছায়া ফুটল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল: সখা, সারথ্য তোমার কর্ম নয়, ধর্ম নয়, সম্মানের ও নয়। তবু ভ্রমবশতঃ সেই প্রার্থনাই করেছি। বিশ্বাস কর, আমি তোমার নেতৃত্বকেই সারথ্য বলে বোঝাতে চেয়েছি। আমার অপরাধ নিও না।

অর্জুন মাথা হেঁট করে দাঁড়াল। তীব্র অস্বস্তির পীড়নে জ্বলে যাচ্ছিল তার বুকের ভেতরটা।

কৃষ্ণ নিজেকে আর সংযত করতে পারল না। পরম আবেগে অর্জুনের একটা হাত নিজের হাতের মুঠোর ভেতর শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বলল: বলছ কী তুমি? তোমার দাবী যত বেশী, তার চেয়েও আমার দায় অনেক বেশী। নেতা হওয়া কী সহজ কথা! ধূর্ত হাসি

ফুটে উঠল কৃষ্ণের মুখে। কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে বলল বেশ তাই হবে। আমি হব তোমার রথের সারথী।

কৃষ্ণের সম্মতি পেয়ে অর্জুনের মনটা খুশিতে উত্তাল হয়ে উঠল।

যুদ্ধের রণভেরী বেজে উঠল কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে। পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিনী সৈন্য আর কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য। সমগ্র ভারতের অধিকাংশ নৃপতি, সামন্তরাজা, দুর্যোধনের পক্ষে সমবেত হল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে। আর যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যোগ দিল মুষ্টিমেয় আত্মীয় নৃপতি এবং সখা কৃষ্ণ। সৈন্যসংখ্যাও কৌরবপক্ষের তুলনায় চার অক্ষৌহিনী কম। পাণ্ডবদের বল-ভরসা সব কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অলৌকিক শক্তিবলে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেরকম একটা কিছু ঘটবে এই প্রত্যাশায় পাণ্ডবদের মনোবল দৃঢ় হল! তবু কোথায় যেন সংশয়ের একখণ্ড কালো মেঘের উদয় হল।

এক বিরাট শক্তিশালী সামরিক জোটের সাথে সৈন্য ও অস্ত্রে হীনবল পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কেমন করে জয়ী হবে এই চিন্তা কৃষ্ণের একার। কারণ, পাণ্ডবদের নেতা সে। তার আদেশ ও নির্দেশ শোনার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে তারা। ভক্ত যেমন ভগবানের কাছে সরল ভক্তি ও বিশ্বাসে সর্বস্ব সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত থাকে, পাণ্ডবেরা তেমনি কৃষ্ণকে তাদের সব দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অর্পণ করল। যুধিষ্ঠির বলল: সখা, আর'ত ভাবতে পারি না। যত চিন্তা করি, ততই একটা ভয় আমাকে সাপের মত পেঁচিয়ে ধরে। সম্মুখের বাধা অতিক্রম করার সাধ্য আমার নেই। তুমি যদি কৃপা করে হাত ধরে আমাকে এই বিপুল বাধা উত্তীর্ণ করে দাও তবে হয়তো সংকট মুক্ত হতে পারি। তুমি আমার ভরসা। আমি তোমার শরণ নিলাম। আমাকে তুমি গ্রহণ কর। উদ্ধার কর এই মহাবিপদ থেকে।

যুদ্ধের আর সামান্য দিন বাকি। দিন যত নিকটবর্তী হল, পাণ্ডবেরা তত নৈরাশ্যে হতাশায় জীর্ণ হল। নিজের উপর তাদের আস্থা হারাতে লাগল। আত্মশক্তির পাত্র শূন্য হয়ে এল। কৃষ্ণ কিন্তু অবিচলিত। তাদের দুরবস্থা দেখে ভীষণ কৌতুক অনুভব করল। পঞ্চপাণ্ডবকে সমবেত করে বলল: সখা, তোমাদের অন্তরের দৈন্য দেখে আমার করুণা হয়। অজ্ঞানতার মত বড় শত্রু আর নেই। তোমরা সেই রিপুর বশীভূত। কিন্তু এখন দুর্বলতার সময় নয়।' মনে রেখ, আত্মার কোন বিনাশ নেই। সমস্ত বিশ্বভুবনে যে তারই প্রকাশ। আত্মাই আত্মশক্তি। আত্মাই শক্তি, আর তুমি শক্তিমান। শক্তিমান ও শক্তিতে কি ভেদ আছে কিছু?' আত্মা ও আত্মশক্তি অভিন্ন, অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন। আত্মা ও আত্মশক্তির জাগরণে তুমি পরিপূর্ণ। শক্তরূপে, নিত্য নবতররূপে আত্মা ও আত্মশক্তি আস্থা ও অনাস্থার সংঘর্ষে, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে বিচিত্রতররূপে নিজেকে আস্বাদন করছে। তোমার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন হেতু নেই। আত্মা ও আত্মশক্তি জাগরণেই মুক্তি। তোমাদের চিত্তকে সংশয় থেকে, ভয় থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আমার। আমাতে আস্থাবান হলেই তোমরা নির্ভয় হবে।

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে বলল: আমরা তোমার শরণাগত। তুমি আমাদের রক্ষা কর, জয়ী কর, নির্ভয় কর। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি। আমরা তোমার বৈ আর কারোকে জানি না। বৃন্দাবনে ব্রজ-গোপীগণ সর্বস্ব ত্যাগ করেছিল, এমন কি তাদের লজ্জাও। আমরাও অকুণ্ঠ মনে তোমাকে বরণ করেছি, শরণ নিয়েছি। আমাদের সব ধর্ম-কর্ম তোমাকে সমর্পণ করেছি। তোমার এই আশ্বাসদানের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে যেটুকু সংশয় ছিল, তোমার উপদেশে তা দূর হল। এখন তা-হলে তুমি আমাদের হও। আমরাও তোমার আদেশ নির্দেশ মনপ্রাণ দিয়ে পালন করব।

কৃষ্ণ প্রসন্ন হাস্যোজ্জ্বল মুখে নির্নিমেষ যুধিষ্ঠিরের দিকে চেয়ে রইল। বড় পবিত্র সে চাহনি। নিবিড় এক প্রশান্তিতে আবিষ্ট হয়ে গেল যুধিষ্ঠিরের চেতনা।

॥ চার ॥

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে সজ্জিত রথে মহাভারতের অনন্য রথী ও মহারথিবৃন্দ সারে সারে শোভা পেতে লাগল। অস্ত্রের ঝনঝনায়, শঙ্খধ্বনিতে, অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহণে, রথচক্রের নির্ঘোষে রণস্থল মুহুর্মুহু কম্পিত হতে লাগল। স্তব্ধ নীল আকাশ অনন্ত বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল ধরণীর দিকে।

অর্জুনের রথে আরোহণ করল শ্রীকৃষ্ণ। রথের সারথী সে। এক পা তার রথের মধ্যে, আর এক পা তার অশ্বচালকের আসনে। এক হাতে তার অশ্বরজ্জু অন্য হাতে পাঞ্চজন্য। রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে কৃষ্ণ রথ নিয়ে দাঁড়াল। মনে হল, জ্যোতিষ্কলোকের মধ্যে সূর্যোদয় হল। কৃষ্ণের টানা টানা দুই চোখে সুদূরপ্রসারী অতলস্পর্শী প্রশান্ত দৃষ্টি। শ্যাম অঙ্গে পীত উত্তরীয়। সেই উত্তরীয় মণি-মাণিক্য এবং হীরকে খচিত। সূর্যের আলো পড়ে তা থেকে বিদ্যুৎদীপ্তি ঝলকিত হচ্ছিল। ঐ ভঙ্গীতে কী অপরূপ তাকে দেখাচ্ছিল। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বীর্য ও শান্তির ঘনীভূত বিগ্রহ যেন। প্রসন্ন সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়েছিল উভয়পক্ষের শত শত সৈন্য, রথী ও মহারথিবৃন্দ। প্রত্যেকের মানসপটে বিধৃত হয়ে রইল কৃষ্ণের অপরূপ মূর্তি। হঠাৎ রণক্ষেত্র কম্পিত করে কৃষ্ণের মহাশঙ্খ পাঞ্চজন্য ধ্বনিত হল। আকাশ, বাতাস আলোড়িত হল। যুদ্ধোন্মুখ সৈনিকদের বুকের ভেতর শিহরণ খেলে গেল। মুহূর্তে দ্বিধা, ভয়, ক্লান্তি ও গ্লানি কেটে গেল এবং তারা উদ্দীপিত হল।

কেবল অর্জুনই বিমর্ষ। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয় ভ্রাতা এবং গুরু, আচার্য-এর দিকে করুণ চোখে চেয়ে রইল অর্জুন। মনের ভেতর তার উদ্দাম ঝড়ের ঝাপ্টা। এদের সঙ্গে তাকে যুদ্ধ করতে হবে। এদের রক্তে রঞ্জিত ধরণীর উপর দিয়ে তার বিজয় রথের চাকা উড়াবে ধূলিজাল, উড়াবে বিজয় পতাকা! নিমেষে তার সব উদ্যম, উৎসাহ ম্লান হয়ে গেল। যুদ্ধের ইচ্ছেটাই মরে গেল। হস্তধৃত

গাণ্ডীব রথপার্শ্বে নামিয়ে রেখে বলল: সখা, আমি যুদ্ধ করব না, শিবিরে ফিরব। এত স্বজনের প্রাণের বিনিময়ে রাজ্য পেয়ে কী লাভ আমাদের? এত রক্তপাত ঘটিয়ে ত্রিভুবনের রাজত্বও চাই না। আমি এই গাণ্ডীব ত্যাগ করলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বিস্ময়ের বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। মেঘমন্দ্র স্বরে ডাকল: অর্জুন! তুমি কি পাগল হলে? এত আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে?

অর্জুনের দুই চোখে কেমন একটা অসহায় ভাব ফুটল। বিমর্ষ গলায় বলল: তবু হে কেশব, আমি যুদ্ধ করব না। করতে পারব না। পরিণামের কথা ভেবে আমার অন্তঃকরণ হাহাকার করে উঠছে। এত আত্মগ্লানি নিয়ে কখনো যুদ্ধ করা যায়? আমি নিজের কাছেই নিজে পরাজিত। আত্মার সঙ্গে বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি ভীষণ শ্রান্ত বোধ করছি। সখা, ফিরে চল। লোকে যা ভাবে ভাবুক। অন্তরের অন্তরঙ্গজনের রুধিরলিপ্ত রাজ্যে আমার কোন লোভ নেই, কোন প্রয়োজন নেই। চাই না এই শ্মশানের রাজত্ব। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

সকালের রোদ পুণ্যের আলোর মত ঝরে পড়ছে কৃষ্ণের মুখের উপর। কী অপরূপ শ্রীময় আর মায়াময় হয়ে উঠল তার দুই চোখের দৃষ্টি। অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ স্তম্ভিত। তবু কী আশ্চর্য নির্বিকারভাবে অর্জুনের দিকে চেয়ে রইল। তার সে চাহনি এমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ ছিল যে অর্জুন ভাল করে কৃষ্ণের দিকে তাকাতে পারছিল না। ভর্ৎসনা করে কৃষ্ণ গম্ভীর গলায় বলল: ছিঃ পার্থ! এই বিষাদ, হতাশা তোমার মত বীরের শোভা পায় না। আগে যদি জানতাম, আমার প্রিয় সখা এত দুর্বল, ভীরু, কাপুরুষ তা-হলে কখনও সারথ্য করতাম না। এখনও যা কানে শুনছি, চোখে দেখছি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। একি আমার বিভ্রান্তি! স্বপ্ন! না, প্রিয় সখার কোন কপটতা? অথবা, ভিতরটা স্বাভাবিক রাগতে বাইরেটা বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে কি?

কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরের দিকে চোখদুটো ছড়িয়ে কেমন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ছাড়া ছাড়া গলায় অর্জুন বলল : না সখা, আমি সত্য বলছি। স্বজন হারানো শ্মশানে আমরা কোন্ রাজ্য গড়ব?

বঙ্কিম হয়ে উঠল কৃষ্ণের ভুরুযুগল। অধরে স্নিগ্ধ হাসির জ্যোতি। বলল: সাম্যের রাজ্য! শ্মশানের মত এত বড় সাম্যের জয়গা আর কোথাও নেই। শ্মশানই সাম্য প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত জায়গা সখা!

কৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত থামল। তারপর খুব শান্ত গলায় গম্ভীর-ভাবে বলল : বিভেদ-বিদ্বেষের অবসান হলে তবেই পৃথিবীতে সাম্য আসে। বিধাতার সাম্যের রাজ্যে অসাম্যজনিত অশান্তি জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করছে। বহু জীবনের মূল্যে আমাদের তা অর্জন করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র যদি মহাশ্মশানে পরিণত হয় তা-হলে আমার স্বপ্ন সার্থক হবে। স্বজন হারানোর শ্মশানের উপর গড়ে উঠবে এক নতুন সাম্যের দেশ।

সখা, তুমি'ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না কোনদিন। তোমার কথা শুনে আমার হৃৎকম্প হচ্ছে। বুক ভেঙে কান্না আসছে।

অর্জুন, আমার কাছে তোমার এ দুর্বলতা প্রকাশ করতে লজ্জা হচ্ছে না। আত্মসম্মানে লাগছে না। তুমি না বীর! পাণ্ডবের আশার দীপ! কিন্তু সে দীপ জ্বলে ওঠার আগেই নিভে গেল কেন? তা-হলে এই ঘোর দুর্দিনে তোমরা কোথায় দাঁড়াবে? যারা তোমাদের পক্ষ নিল তাদের অবস্থাটা কি হবে একবারও ভেবেছ? নিজেকে নিয়ে যা খুশি করা যায়। কিন্তু এখন আর তুমি নিজের নও, তোমার স্বার্থ, সুখ বলে কিছু নেই, তুমি একটা বিরাট আদর্শের কাছে, সত্যের কাছে দায়বদ্ধ। মনে ভীরুতা, দুর্বলতা জমলে কি এভাবে দায়িত্বজ্ঞানহীন হওয়া যায়? না, শোভা পায়? একজন বীর ক্ষত্রিয়ের কাম্য ধর্ম-যুদ্ধ। তোমার সামনে তার যে সুযোগ এসেছে, তাকে উপেক্ষা কর না। মনে রেখ, শুধু কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলাফলের উপর নয়। মহৎ কর্ম ত্যাগের প্রবৃত্তি, দোষণীয়, নিন্দনীয় এবং পরম অধর্ম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল ঈশ্বরের আদেশ, কালের নির্দেশ। এ মহাদায়িত্ব

সম্পন্ন না করে তুমি পালাবে কোথায়? বিভ্রান্তি ত্যাগ করে কর্মে প্রবৃত্ত হও। কর্ম হল মানুষের ধর্ম, সত্য এবং তপস্যা।

সখা, তোমার বাক্‌জালে আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক আচ্ছন্ন করে দিও না। তুমি আমার পরমহিতৈষী। মহাযুদ্ধের ঘাতক হতে বল না আমায়। আমি পারব না মানুষের এত বড় সর্বনাশ করতে। সখা, তোমার কি একবারও মনে হচ্ছে না কত জননীর বুক শূন্য হবে, কত রমনী স্বামী হারাবে, কত শিশু তার পিতা হারাবে? পরিণামের কথা ভেবে কাজ না করলে পস্তাতে হয়। তার শুধু দুঃখ বাড়ে। মনস্তাপ জন্মে। সখা, ফলের কথা ভেবেই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। নিষ্ফল কর্ম কে কবে করেছে? ক্ষুধা পায় বলেই মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেজন্য পরিশ্রম করে খাদ্য ফলায় এবং সংগ্রহের জন্যে উপার্জন করে।

কৃষ্ণ অর্জুনের তর্কে প্রীত হল। মুখে অনিন্দ্যসুন্দর হাসি। বলল: সখা, কিছু না করে চুপ করে শুয়ে থাকাটাও কর্ম। ঘুমিয়ে নিদ্রা যাওয়াও একটা কর্ম। শরীরের স্বার্থেই এই দুটি প্রয়োজন। অর্থাৎ, কিছু না করে কিছু করা হল। একে কেউ নৈষ্কর্ম বলবে না। তেমনি কর্ম করবে ফলের আশা ত্যাগ করে। সেই হবে যথার্থ কর্ম। সত্যকারে ধর্মপালন। সখা, তোমার দু'চোখে বিস্ময়। আশ্চর্য হওয়ার কথাই বটে। আসলে, আত্ম অহংকারে মত্ত হয়ে ভাবছ, নিজেই তুমি কর্মের কর্তা। কিন্তু তা নয়, কর্তা ঈশ্বর। তুমি ভৃত্যবৎ তার কর্ম করছ। ঈশ্বর অন্তরীক্ষ্যে থেকে যেমন যেমন আদেশ, নির্দেশ করছেন তুমিও তেমন তেমন করছ। বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান সব ঈশ্বরের দেয়া। তোমার নিজের কিছু নয়। আসলে তুমি কেউ না। কেবল তোমার মধ্যে দিয়ে তাঁর কর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পাদিত হচ্ছে। তোমার সব কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ কর। তা-হলেই দেখবে আর কোন মোহ নেই, মমতা নেই, যন্ত্রণা নেই। সর্বকিছু ত্যাগ করে যুদ্ধ করাই হবে তোমার নিষ্কাম কর্ম। যুদ্ধই তোমার পরমার্থ। আমি বলছি, এ যুদ্ধ তোমার নিয়তি। তুমি চাইলেও পারবে না কুরুক্ষেত্রের মহাসমর থেকে দূরে থাকতে।

অর্জুন চমকে তাকাল কৃষ্ণের মুখের দিকে। ভুরু কুঁচকে কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় চেয়ে রইল। তার বুকের ভিতরে কাঁপছিল। কী এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার অন্তরটা তীব্র একটা আবেশে জ্যোর্তিময় হয়ে উঠল। এক গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, অনুরাগের চোখ মেলে সে কৃষ্ণকে দেখছিল। সেই দেখাটা এমন করে যে স্বর্গের ছবি হয়ে উঠবে জানা ছিল না অর্জুনের। তার চারপাশে যে বিশ্বজগৎ রয়েছে কৃষ্ণ তার মধ্যে অবস্থান করছে। কৃষ্ণকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীর কোটি কোটি নক্ষত্র, তারা, চন্দ্র, সূর্য, স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষ, সবকিছু। দেখল: বায়ুমণ্ডল, দশদিক, বিভিন্ন দৃশ্য, সমুদ্র, পর্বত, নদী, দ্বীপ, জল, বিদ্যুৎ, অগ্নি। আরো দেখতে পেল বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, নিরুপম শক্তিবর্গ, মন, শব্দ, ত্রিবিধ গুণাবলী।

অর্জুনের বিস্ময়ের অন্ত নেই। ধ্যান-নেত্রে কৃষ্ণের এ কোন্ রূপ দেখছে সে? কত প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, কৌতূহল তার মনের মধ্যে যাওয়া আসা করল। দেহ-মন জুড়ে ঐ কথাগুলির উত্তর যেন তার সমস্ত চেতনার ভেতর এক অশ্রুতপূর্ব কৃষ্ণের মায়াবী কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল। বিশ্বজগৎ আমি, আমার একাংশ মাত্র এই পৃথিবী ধারণ করে আছে। আমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। আমি মহাকাল, লোক-সংহারকারী মহামৃত্যু। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত আমার মধ্যে প্রথিত রয়েছে। যা কিছু করার আমিই করব, তোমার করার কিছু নেই। তোমার নিজের কোন ক্ষমতা নেই, কোন কর্তৃত্বও তোমার নেই। তুমি শুধু নিমিত্ত।

অর্জুনের সমস্ত চেতনার ভেতর সত্তার ভেতর, এক অব্যক্ত আনন্দ-স্রোত বয়ে গেল। মনে হল আর কোন ভয় নেই। সব আশংকা, দুর্ভাবনা ধুয়েমুছে মনকে নির্মল করে দিল। কেমন একটা ভরন্ত আস্থায় ভরপুর হল তার বুকের ভেতরটা। মনের অতলে এক মহাযোগ-নিদ্রায় যেন কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কৃষ্ণের ডাকে হঠাৎ চমকে তাকাল।

পার্থ, তুমি এত ভীত হচ্ছ কেন? আমি'ত আছি। আমার

উপর আস্থা রাখ। আমি তোমার। শত্রু তোমার বাইরে নয়, অন্তরে। তোমার সারথি হল তোমাদের ভাষায় স্বয়ং ভগবান, তোমার অগ্রজ ধর্মরাজ, মহাশক্তিরূপী ভীম, সহায় সত্যরূপী সাত্যকী, তোমার ভরসা পুত্র অভিমন্যু,—তোমার কিসের বিষাদ, কিসের শঙ্কা ?

কৃষ্ণের কথাগুলো অর্জুনকে মন্ত্রের মত অভিভূত করে দিল। মনের উপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল। আর তাতেই মনটা বড় হয়ে গেল। সব মোহ, দুর্বলতা কেটে গেল। দুহাত জোড় করে বলল : সখা, তোমার এই বিশ্বযজ্ঞশালায় আমাকে যে কর্মের ভার তুমি দেবে, আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে সানন্দে তা পালন করব। তোমার আদেশেই তোমার কর্ম করব। তোমার করুণাই আমার কাম্য। আর আমার পাপের ভয় নেই, পুণ্যের প্রয়োজন নেই। তুমিই আমার সব। আমার গতি, আমার গর্ব, আমার ধর্ম, কর্ম সব। আমার মন এখন তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানে না। আমার সবকিছু তোমাকে সমর্পণ করলাম। আমি তোমার শরণ নিলাম। এখন আমার কোন কর্মই আর আমার রইল না—তোমার। আমার ধর্মও তোমারই পূজার অর্ঘ্য, আমি নিমিত্ত মাত্র। তুমিই সব। তুমি আমাকে ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত করে বুঝিয়ে দিলে "ঈশ্বর : সর্ব ভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। / ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি, মায়য়া।" হে কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

কৃষ্ণের মধ্যে হঠাৎ কত কী যেন ঘটে গেল। কিছু কিছু সময় মুহূর্ত আসে সকলের জীবনে যখন কথা বলতে একটু ইচ্ছে করে না। মন যখন অন্য একটি মনের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে প্রাণে প্রাণে কথা বলে তখন মুখের ছুটি। বলার মত, চাওয়ার মত, পাওয়ার মত তখন আর কিছুই থাকে না বলে মন দিয়ে সব টের পাওয়া যায়। অর্জুনের বাক্য কৃষ্ণকে ভীষণ মৌন করে দিল।

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল আত্মস্থ হতে। কর্মভূমি কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রাঙ্গণের দিকে স্বপ্নালু চোখদুটো ছড়িয়ে দিয়ে গভীর গাঢ়

স্বরে বলল : অর্জুন, গাণ্ডীব ধর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয় তোমার অনিবার্য।

তারপর নিজের হাতে রথ চালিয়ে কুরুসৈন্যের অভিমুখে চলল,— আত্মসমর্পণ করতে নয়, শ্রদ্ধাস্পদ পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কৃপ'র আত্মার প্রসন্নতা ভিক্ষা করতে ; তাদের শ্রীচরণ বন্দনা করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে, তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে যুদ্ধ সূচনা করতে।

কাব্য রচনার সময় কত কি যে স্পষ্ট করে মনের চোখে প্রতিবিম্বিত হয় তা শুধু কবিরাই জানে। বাইরের কত ঘটনার আগল তুলে দিয়ে মনের আগল একেবারে খুলে ফেলে কাব্যের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে দ্বৈপায়ন লিখছিল কৃষ্ণের পাণ্ডব-প্রীতি এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকথা। সুন্দর সুখের যা কিছু তা কীর্তন করার মধ্যে বোধহয় এক ধরনের গভীরতর সুখ নিহিত থাকে। সেই সুখের এক আশ্চর্য প্রসন্নতা মুখচ্ছবি ফুটে উঠল তার মুখে।

অনেককাল আগের ঘটনা। তবু কিছুই ভোলেনি দ্বৈপায়ন। স্মৃতির মণিকোঠায় জ্বলজ্বল করছিল কুরুক্ষেত্রের সে-দৃশ্য। ভীষ্মের বিক্রম, তেজ পাণ্ডববাহিনী সহ্য করতে পারছিল না। তার দুর্জয় প্রতিরোধের সামনে পাণ্ডবেরা অসহায় বোধ করতে লাগল। ভীষ্ম যেভাবে যুদ্ধ করছিল, আর কিছুকাল এইভাবে যুদ্ধ হলে পাণ্ডববাহিনীর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। ধনুর্ধর মহাবীর অর্জুনও ভীষ্মের গতিরোধ করতে পারছিল না। একটানা আটদিন ধরে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করেও ভীম পরিশ্রান্ত কিংবা ক্লান্ত হল না।

কৃষ্ণ চিন্তিত ও বিমর্ষ। ভীষ্মের রুদ্রতেজ থেকে পাণ্ডববাহিনীকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল। স্নেহময় পিতামহের অঙ্গে অর্জুন অস্ত্রাঘাত করতে কুণ্ঠিত। অর্জুনের শৈথিল্যের কারণে পাণ্ডবের এই বিপর্যয়। ভীষ্মের রুদ্রমূর্তির সামনে অর্জুনের কুণ্ঠিত প্রকাশ কৃষ্ণকে

কুপিত করল। অর্জুনের কাছে বারংবার আবেদন করেও কোন সাড়া মিলল না।

সংকটে পড়ল কৃষ্ণ। ভীষণ অসহায় বোধ করল। যুধিষ্ঠির তার শরণাগত। পাণ্ডবদের রক্ষার সবরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আবার দুর্যোধনের কাছে শপথ করেছে কোন অবস্থাতেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। অর্জুনের কাছে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে বলেছে, আমার উপর আস্থা রাখ তাহলে তুমি জয়ী হবে। শরণাগতকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম। এই অবস্থায় তার করণীয় কি, সেই কথাই গভীর করে ভাবছিল। বেশ বুঝতে পারছিল, তাকে এবার একটা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ভক্তের ভক্তির সঙ্গে ভগবানের দর্পের প্রবল বিরোধ বেঁধেছে। এই লড়াইতে একপক্ষের হার স্বীকার না করা পর্যন্ত এই বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না।

অর্জুন এবং ভীষ্ম দু'জন মিলে দেহধারী মানুষের ভগবানের দর্প চূর্ণ করার এক ফাঁদ যেন তৈরী করল এই মহারণে। অর্জুন যদি ভাল করে যুদ্ধ করত তা-হলে পাণ্ডবপক্ষের এত সৈন্য ক্ষয় হ'ত না। অর্জুন তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত কিংবা বিচলিত নয়। সব ভার কৃষ্ণকে সমর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত আছে। এখন দায়, কর্তব্য কৃষ্ণের নিজের। ওদিকে পিতামহ ভীষ্মও প্রতিজ্ঞা করল কৃষ্ণকে যুদ্ধে কিছুতে নিরপেক্ষ থাকতে দেবে না। কারণ এ যুদ্ধের স্রষ্টা সে। সুতরাং তাকে হাতে অস্ত্র নিতে বাধ্য করাই হবে তার কাজ।

কৃষ্ণ ফাঁপড়ে পড়ল। এখন কোন্ কুল রক্ষা করবে সে? কার মান বাঁচাবে? ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে ভক্ত নিত্য যে পূজা করছে, সেই পূজা গ্রহণ করলে তার দর্প বিসর্জন দিতে হয়, কিন্তু দেবত্বের গৌরব বেড়ে যায়। অনুরাগী এবং ভক্তের ইচ্ছে পূরণ করা মহতের ধর্ম, ভগবানের কর্তব্য। চিরদিন ভগবানকে ভক্তের বোঝা বইতে হয়। সে বোঝা বহনের একটা অদ্ভুত সুখ আছে। সব ভগবান সেই সুখটুকু পাওয়ার লোভে আপন দর্প ত্যাগ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে। ভক্তগণ যে তাদের বড় প্রিয়, তাই তাদের কাছে তারা

ধরা দেন।

কৃষ্ণ কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

যুদ্ধের নবম দিন। সুরু হল ভক্তের কাছে ভগবানের লাঞ্ছনা। বিক্ষুব্ধ বাত্যাতাড়িত সমুদ্রের মত প্রবল ত্রাসে ভীষ্ম সমগ্র রণক্ষেত্রে একা নির্ভয়ে দাপিয়ে বেড়াল। কৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করতে লাগল। কিন্তু কোন ফল হল না। ভয়ে, ত্রাসে পাণ্ডবসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল। যুধিষ্ঠির দিশাহারা হয়ে দীন নয়নে কৃষ্ণের মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার মুখে বাক্য নেই। তবু, অর্জুন ভীষ্মকে প্রতিরোধ করল না। অন্তত কৃষ্ণের তাই মনে হল।

মহাবল ভীষ্ম যেন রুদ্রতেজে সমগ্র রণভূমি মথিত করতে লাগল। ভীষ্মের বাণে বাণে কৃষ্ণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। ভক্ত-সখা অর্জুনের জন্যই এতক্ষণ প্রফুল্ল মুখে সহ্য করছিল সমস্ত আঘাত। কিন্তু সহ্যের সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলল। ক্রোধে, ক্ষোভে রোষে গর্জন করে উঠল কৃষ্ণ। তার দুই চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। মুখমণ্ডল রক্তিম হল। মেঘ-গম্ভীর স্বরে বলল: সাত্যকী দরকার নেই পলায়নপর সৈন্যদের ফেরানোর। তৃতীয় পাণ্ডবকে নিয়ে তুমি শিবিরে ফিরে যাও। আমি একাই মহাবীর ভীষ্মের সাথে যুদ্ধ করে তাকে সংহার করব। তারপর সমস্ত কৌরববাহিনীকে দলিত মথিত করে ধ্বংস করে প্রত্যাবর্তন করব।

সূর্যতেজের মত ভীষণ দীপ্ত সুদর্শন অস্ত্র হাতে নিয়ে সিংহবিক্রমে কৃষ্ণ রথ থেকে অবতরণ করে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হল। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করার জন্যে, তার মান বাড়ানোর জন্যে কৃষ্ণ অস্ত্র হাতে করল। নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল। তবু ভক্তের সাধ পূরণ করার জন্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল। লোকে তাকে মিথ্যেবাদী বলবে, তবু একদিন তারা বুঝবে নিজের জন্যে কৃষ্ণ অস্ত্র ধরেনি। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে তাকে গৌরবান্বিত করল।

সকৌতুকে ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ অস্ত্র পরিত্যাগ করল। রথোপরি নত-জানু হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে শান্ত গলায় বলল: হে কৃষ্ণ, আমার মনোরথ

পূর্ণ হয়েছে, এবার তুমি অস্ত্র সংবরণ কর। আর যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। তোমার দর্প চূর্ণ করেছি। শপথ ভঙ্গ করেছি। এবার আমার মৃত্যু হলেও দুঃখ নেই। তুমি আমাকে করুণা কর। ক্ষমা কর।

কিন্তু তবু কৃষ্ণ নিরস্ত হল না। ভীমবেগে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হল। এরকম একটা অপ্রত্যাশিত, অভূতপূর্ব ঘটনার জন্যে অর্জুন প্রস্তুত ছিল না। কৃষ্ণকে শপথ ভঙ্গ করার জন্যে তার ভেতরে তখনি একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হল। ভীষণ অনুশোচনা হল। কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে সে রথ থেকে লাফিয়ে নামল। দু'হাতে কৃষ্ণের দক্ষিণ বাহু ধরে তাকে নিরস্ত করার জন্যে বলল: হে কৃষ্ণ, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর। করজোড় করে তোমার কাছে মিনতি করছি, তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর। তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। আমার ভুলেই তুমি রুষ্ট হয়েছ। তুমি অস্ত্র ধরলে আমার লজ্জার পরিসীমা থাকবে না। এখন তোমার চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি কুরুকুল ধ্বংস করব। কারো প্রতি চিত্তদৌর্বল্য কিংবা শৈথিল্য দেখাব না। আমি অকুণ্ঠ-চিত্তে তোমার আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলব। তুমি অস্ত্র সংবরণ কর। নতুবা তোমার সামনে আত্মহত্যা করে আমি কলংকমুক্ত হব।

শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ এবার প্রশমিত হল প্রশান্তি ফিরে এল তার মুখমণ্ডলে। ওষ্ঠপ্রান্তে কেমন যেন একটু কৌতুক রেখাও ফুটে উঠল। একবার ভীষ্ম একবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে উদ্যত অস্ত্র সংবরণ করে মন্থর পায়ে পুনরায় রথে ফিরে এল। রথারূঢ় হয়ে অশ্ববল্গা ধারণ করে ভীষ্মের দিকে অগ্রসর হল।

ভীষ্মের মৃত্যু-সংবাদ দ্বৈপায়নের মনকে বিষণ্ণ বেদনায় ভারাক্রান্ত করল। ভীষ্মের সঙ্গে তার বনিবনা হয়নি, আবার প্রকাশ্য চটাচটি কিংবা সংঘর্ষ হয়নি। তবু দু'জনের মধ্যে একটা সংঘাত ছিল। দু'জন দু'জনের সঙ্গে লড়াই করল লোকচক্ষুর অন্তরালে, মনের গোপনে,

নিঃশব্দে এবং সাবধানে। সেই জটিল কুটিল নীরব প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণাম কৌরব পাণ্ডবের মহাসমরের অনেক কারণের মধ্যে একটি।* তাই বোধ হয় ভীষ্ম নিজের ভুলের, বিদ্বেষের, ঘৃণার, পক্ষপাতিত্বের প্রায়শ্চিত্ত করতে স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ বেছে নিল। জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষের আত্মগ্লানিতে জর্জরিত তাঁর মত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মন এমনিতেই হাজার শরে বিদ্ধ হয়ে ছিল। মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও অধিক তা। দৈহিক মৃত্যু-যন্ত্রণা মানসিক মৃত্যুর কাছে কিছু নয়। এটা বোঝাতেই সে অস্ত্র ত্যাগ করল। আগামী প্রজন্মের কাছে তার অন্যায়, অপরাধ, ভুলকে চাপা দেবার এটাই ছিল এক কৌশল। কারণ, ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই। স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের ঘটনাটা যতদিন মানুষের মনে থাকবে ততদিন ভীষ্মের মহত্ত্ব, মহানুভবতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন থেকে মুছে যাবে না। একজন বীর ক্ষমার চেয়েও অতিরিক্ত শ্রদ্ধা পায় যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করে। ভীষ্ম মানুষের অন্তরে শ্রদ্ধার অক্ষয় অমর আসনটি তার স্বেচ্ছামৃত্যুর মূল্যে মহার্ঘ করে গেল। ভীষ্মের মৃত্যুটা কখনও স্বাভাবিক নয়। স্বেচ্ছামৃত্যুর নামে ভীষ্ম কার্যত আত্মহত্যা করল। তবু সব মৃত্যু দুঃখের এবং বেদনার। ভীষ্মের মৃত্যুটাও দ্বৈপায়নকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল। সত্যিকারে তার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। নিজেকে তার বড় একা এবং নিঃসঙ্গ লাগল।

এই মুহূর্তে দ্বৈপায়নের মনে হল, ইতিহাসের জন্যে তাকে ও ভীষ্মকে দরকার হয়েছিল। যদি ভীষ্মের অন্তরে জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষ না থাকত তা-হলে এই কালসমর হত না।* কৃষ্ণের নতুন ভারতবর্ষ গঠনের স্বপ্ন দেখা হত না। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, মানুষের দুঃখের প্রতিকার হত না। সাধারণ মানুষ তথা নিপীড়িত মানুষকে নিজের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য

---

* মৎ-লিখিত "কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন" গ্রন্থটি পাঠ করলে পাঠক ভীষ্ম ও দ্বৈপায়নের অন্তর্বিরোধের মূলে যে জটিল জাতিদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক কারণটি আছে তাকে নতুনভাবে আস্বাদ করতে পারবেন।

রক্ষার সংগ্রাম করতে হত না। প্রতিহিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষের আগুন জ্বলত না। তাকেও লিখতে হত না এই মহাকাব্য।

জীবনের অন্তিমকালে পৌঁছে বিধাতা তাকে এ কোন্ শাস্তি দিল? নিজ কর্মের প্রায়শ্চিত্ত তাকে দিয়েই যেন করল। যে বৃত্তান্তের সে নিজে একজন পার্শ্বচরিত্র, যার সঙ্গে তার স্বার্থের ও বাসনার একটা আত্মিক যোগ ছিল, সেই ঘটনা অবসানের দীর্ঘকাল পর পুনরাবৃত্তি করা কিংবা রোমন্থন করার মত যন্ত্রণা, বেদনা আর কিছুতে হয় না। সেইরকম একটা কষ্টে তার ভেতরটা ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। মনের ভেতর কেমন একটা ভয় হল। বিদ্বেষ, প্রতিহিংসার যে বিষ পাণ্ডব-কৌরবের সুমধুর ভ্রাতৃত্বকে বিষিয়ে দিল, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরকে রক্তাক্ত করল, বাতাসে যার হাহাকার দীর্ঘশ্বাসের মত ছড়িয়ে রইল প্রেমের কোন্ অমৃতলোকের বার্তা সে বহন করে আনবে? এই জিজ্ঞাসাই দ্বৈপায়নকে সচেতন করে রাখল। কিন্তু আশ্চর্য কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়ার পর এক অনাবিল সুখে ও প্রসন্নতায় ভরে যায় তার অন্তঃকরণ। তখন মনে হয়, এই ঘটনা আগামী প্রজন্মের মানুষের জীবনে দীপ জ্বেলে দেবে, তাদের চলার পথে আলো ফেলবে, পৃথিবীকে এবং জীবনকে চিনতে শেখাবে।

চারদিক নিস্তব্ধ। এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে দ্বৈপায়ন আবিষ্ট হয়ে রইল। মুখের উপর তার চাঁদের আলো এসে পড়ল। দেবতার মত অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত।

নির্বাপিত হিংসার জ্বালা। অহংকৃত, উদ্ধত ক্ষাত্রশক্তির সব আস্ফালন নীরব।

রণভূমি শান্ত। কোথাও যুদ্ধভেরী বাজছিল না। ঘরে ঘরে শুধু বুক-ফাটা কান্নার হাহাকার।

কৌরবদের কেউ জীবিত নেই। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আর কোন

অবলম্বন রইল না। পুত্রহীন, দৃষ্টিহীন, আশাহীন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না যুধিষ্ঠির। এত বড় শোকের, যন্ত্রণার কোন সান্ত্বনা হয় না। তবু তাকে যুদ্ধের শেষ সংবাদ দিতে হবে। রাজ্যের দাবি করতে হবে। যুধিষ্ঠির ভেবে পেল না কেমন করে বলবে কৌরববংশের কেউ জীবিত নেই। হস্তিনাপুর আর কৌরবদের নয়—এই নিদারুণ মর্মবিদারী বার্তাটি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে দেয়ার মত নিষ্ঠুর ঘটনা আর কিছু হয় না। তবু কঠিন বাস্তবকে মেনে নিতে হয়। মানিয়ে নিয়ে চলাটাই জীবনের নিয়ম।

যুধিষ্ঠির বিমর্ষ ভাবনায় স্তব্ধ। কৃষ্ণ তাকে নীরব দেখে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ল। তার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার জন্যে কাঁধ স্পর্শ করল। তাতেই যুধিষ্ঠির চমকাল। চমকানো বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে ডাকল: সখা। আমার কর্তব্য স্থির করতে পারছি না।

কৃষ্ণের অধরে চির পরিচিত অনির্বচনীয়, অনিন্দ্যসুন্দর সেই মধুর হাসিটি আরো রহস্যময় হয়ে উঠল। মৃদুকণ্ঠে বলল: সখা, আমি জানি, তোমার প্রবল হৃদয়াবেগ কর্তব্য সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করছে। তবু কর্তব্য বড় কঠিন। শতপুত্র হারানোর বিয়োগ ব্যথায় অন্ধ রাজা এবং তাঁর পত্নী গান্ধারী শোকস্তব্ধ। ওঁদের আর কেউ নেই। ওঁদের সান্ত্বনা দান খুবই প্রয়োজন। এখন তোমরাই ওঁদের পুত্র। তুমি পুত্রের কাজ কর।

যুধিষ্ঠির আর্তস্বরে বলল: সখা কোন্ মুখে ওঁদের সামনে দাঁড়াব? কোন ভাষায় সান্ত্বনা দেব? ওঁদের মত আমিও সন্তান-শোকে কাতর। নিদারুণ মনস্তাপে বুক আমার পুড়ে যাচ্ছে দিবানিশি।

জানি, ধর্মরাজ। তবু পুত্রের কাজ তোমাকেই করতে হবে। অন্ধ রাজা প্রতিপ্রাণা গান্ধারীকে নিয়ে কুরুক্ষেত্রে মহাশ্মশানে আসছেন। শ্মশান বড় পবিত্রভূমি। তুমি সেখানে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হও।

সখা, আমি'ত কোন অন্যায় করিনি। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তা-হলে আমাকে ক্ষমপ্রার্থী হতে বলছ কেন?

ধর্মপথে যুদ্ধ হলে তোমরা এ যুদ্ধে জয়ী হতে না। ধর্মযুদ্ধ যদি কেউ

করে থাকে, তা করেছে কৌরবেরা। প্রণয়বশে, শরণাগত পাণ্ডব সখাদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় এড়াতে অনেক অধর্ম করেছি। মনেতে আত্মগ্লানি জমেছে। এত বড় অনর্থের জন্যে নিজেকেই দায়ী মনে হয়। একথা মুক্তকণ্ঠে তোমার কাছে স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। বরং কথাগুলো বলতে পেরে বেশ একটা স্বস্তিবোধ করছি। মনে হচ্ছে, একটা বিরাট ভার আমার হাল্কা হয়ে গেল। তুমিও নিজের অপরাধ স্বীকার করলে শান্তি পাবে।

যুধিষ্ঠিরের দু'চোখে বিস্ময়। শুকনো গলায় বলল : কিন্তু কেমন করে যাব? কী বলব? কোন লজ্জায়—

মায়ের কাছে সন্তানের কোন লজ্জা থাকে না। তোমার সব লজ্জা, অভিমান, অনুশোচনা নিয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে বুকের উপর আছড়ে পড়ে একবার জননী বলে ডাকবে, অন্ধরাজাকে পিতৃব্য বলে তার পদতলে মাথা রেখে মার্জনা চাইবে, দারুণ শোকের মধ্যে তাঁদের সব রাগ, অভিমান, অভিযোগ, তিরস্কার, অভিশাপ, সব গিয়ে আশীর্বাদের মন্ত্র হয়ে উঠবে। এই হল জীবনের নিয়ম। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তুমি যাও।

কৃষ্ণের চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল যুধিষ্ঠির। নতুন কিছু পড়ল চোখে। নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

বুকের ভেতর উৎকণ্ঠিত একটা কষ্ট নিয়ে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের ও অন্য ভ্রাতাদের সাথে যাত্রা করল। সকলের মনেই চাপা উৎকণ্ঠা। কিন্তু প্রকাশ নেই কারো। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি তারা। পরিস্থিতিটা কেমন করে সবদিক সামলাবে তার ভাবনা কৃষ্ণকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলল।

বুকের মধ্যে সময় খুব লাফাচ্ছিল। এখন দ্রুত ভাবনার সময়। অনেক ভাবনা। সব কেমন এলোমেলো। অগোছালো। নানান অনুভূতির মধ্যে কেমন একটা লজ্জা পঞ্চপাণ্ডবের চোখের ও মুখের রূপ বদলে দিল।

কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তর জুড়ে হাজার হাজার চিতা জ্বলছিল।

সবটাই শ্মশান। লক্ষ লক্ষ নারীকণ্ঠের আর্ত-বিলাপ, হাহাকার দীর্ঘশ্বাসে এক নারকীয় অবস্থা সৃষ্টি হল। কিন্তু এই সব দৃশ্য কৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে গেল। চোখ ছলছলিয়ে উঠল। একটা তীব্র সমবেদনাবোধে বুকের ভেতরটা টাটাতে লাগল। কিন্তু ভাল করে তার প্রতি মন দেবার মত সময় কোথায়? আপন মনের জটলায় বিভ্রান্ত। দিশেহারা। ভাবনার গতি তখন দুরন্ত অপ্রতিহত। বুকের ভেতর অজস্র কথা, জিজ্ঞাসা, উত্তর একসঙ্গে উথাল-পাথাল করতে লাগল।

একটা ভীরু দ্বিধা আর সংকোচ নিয়ে যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সামনে এসে দাঁড়াল। আচমকা পাদস্পর্শে ধৃতরাষ্ট্র চমকাল। সমস্ত শরীর আড়ষ্ট শক্ত হয়ে গেল। কোঁচকান ভুরু টানটান হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সচেতন অনুভূতি দিয়ে নিশ্চিত অনুমান করল এবং বলল: কে? যুধিষ্ঠির এসেছ?

যুধিষ্ঠিরের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুক্ ধুক্‌পুক আওয়াজ এক ভয়ংকর তীব্রতায় বেজে যেতে লাগল। শংকিত অনুভূতির মধ্যে যুধিষ্ঠির স্থির থাকতে চেষ্টা করল। কিছু বলার আগেই ধৃতরাষ্ট্র তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। কঠিন মুষ্টি যেন সাঁড়াশির মত চেপে ধরল তাকে। যুধিষ্ঠির ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভয়ে কাঁপল। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সর্বশক্তিতে কষ্টটা কণ্ঠে সংহত করে স্খলিত ভেজা গলায় অস্পষ্ট শব্দে উচ্চারণ করল: পিতৃব্য! এ কী হল? এরকম'ত আমরা কেউ চাইনি। তবু কেন হল? কি পাপ করেছি আমি? আমার অপরাধের কোন ক্ষমা হয়ত হয় না। তবু আমি'ত আপনাদের সন্তান। ক্ষমা-প্রার্থী হয়ে আপনার করুণা ও কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি।

ধৃতরাষ্ট্র সহসা কথা বলতে পারল না। স্মৃতিচকিত হয়ে উঠল যুধিষ্ঠিরের আর্ত প্রার্থনায়। খানিকটা অসহায়ভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল: পুত্র! সব দোষ আমার। অপরাধ, অবিচার যা করেছি সে আমি। এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। তোমার কোন দোষ নেই। ভীম কোথায়?

ধৃতরাষ্ট্রের বাহুবন্ধন আলগা হল। যুধিষ্ঠির স্থির হয়ে তার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টিহীন খোলা দুই চোখের উপর অপলক চেয়ে রইল।

অদূরে চিতা জ্বলছিল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার আলো পড়েছিল গান্ধারীর মুখের উপর। সেখানে স্তব্ধতা যেন অশরীরী; শব্দ করে আসে, থামে তারপর বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের হাহাকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

চলমান পদশব্দ গান্ধারীর খুব কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পেল। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি সচেতন হয়ে উঠল। অতিপরিচিত মানুষের অস্তিত্ব, অবস্থানকে অনুভূতি দিয়ে চিনতে সে একটুও ভুল করল না। গায়ের গন্ধে টের পেল ভীমার্জুনের উপস্থিতি। কিন্তু ও কার পদশব্দ ঘুঙুরের মত বেজে যাচ্ছে তার বুকের ভেতর? ও শব্দ তার খুব চেনা। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চেতনায়। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্খলিত গলায় প্রশ্ন করল: কে? কে দাঁড়িয়ে? কথা বলছ না কেন?

গান্ধারীর উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসায় এমন একটা ব্যাকুল প্রত্যাশা ছিল যে কৃষ্ণের ভেতরটা গলিয়ে দিয়ে গেল। বুকটা হঠাৎ টনটনিয়ে উঠল। চোখ ভিজে উঠেছিল। আর আস্তে আস্তে সেই মুখের উপর ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর মুখ জেগে উঠেছিল। তাই গান্ধারীর জিজ্ঞাসায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। মুখে একটা প্রগাঢ় সমবেদনার অভিব্যক্তি ফুটল। সে একটু বিব্রতবোধ করল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলল: পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ কাঁদে গান্ধার নন্দিনী। গলার স্বরে তার আর্তি ফুটে বেরোল।

গান্ধারীর বুকের মধ্যে মুহূর্তে নানারকম বিস্ফোরণ ঘটে গেল। কৃষ্ণের আর্তস্বর গতিময় তীরের মত বুকে বিঁধল। তার শরীর অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট প্রতিশোধ স্পৃহায় শিহরিত হল। বুকের মধ্যে সব তাপ, বিদ্রোহ সংহত করে বলল: কৃষ্ণ, তুমি এত নিষ্ঠুর জানতাম না। আমাকে সন্তানহীন করেও তোমার তৃপ্ত হয়নি। গান্ধারীর নয়নাশ্রু

দেখতে এসেছ শ্মশানে। তাই না?

না, দেবী। এসেছি, সমবেদনা জানাতে, তোমার তাপিত অন্তরের সব বক্ষতাপ নিজের বুকে গ্রহণ করতে।

শত শত চিতা জ্বলছে এ বুকে। নয়নের বারি ঢেলে পার কি এই আগুন নেভাতে?

দেবী, শোকমুক্ত করার কোন মন্ত্র আমার জানা নেই।

গান্ধারী কান্না গিলে বলল: তবে এলে কেন? কৌরবজননী গান্ধারীর দুর্দশা স্বচক্ষে দেখতে এলে? কেমন দেখলে কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ চোখ বুজে ধীর-স্বরে স্বগতোক্তির মত বলল: দেবী, অপরাধী কর না আমায়।

সহসা গান্ধারী চক্ষু-আবরণী টান মেরে খুলে ফেলল। দু'চোখ তার আগুনের মত ধকধক করতে লাগল। কৃষ্ণের দিকে জ্বালাভরা চোখে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর, দাঁতে দাঁত টিপে রুদ্ধ আক্রোশে বলল: সব অপরাধ তোমার। তুমিই এ যুদ্ধের অধিনায়ক, পরিচালক। তোমার ইচ্ছেয় কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছে। পাণ্ডবেরা তোমার আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। তাদের দিয়ে তুমি অনেক অন্যায়, অধর্ম করেছ। তোমার পাপের কোন শেষ নেই কৃষ্ণ। ভেবেছ, তোমার পাপের কোন শাস্তি হবে না? তুমি যেই হও, তোমার অপকর্মের অধর্মের, অন্যায়ের, অসত্যের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মহাশ্মশানে বসে আমি যেমন কুলনাশ হওয়ার বিলাপ করছি, একদিন তোমারও কুলনাশ হওয়ার জন্যে অনুরূপ অশ্রুপাত করতে হবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেমনটি হয়েছে একদিন যদুবংশেও সেই দুর্বিপাক নেমে আসবে। তুমি যত বড় শক্তিমান হও, কুলক্ষয় এড়াতে পারবে না কৃষ্ণ। এ আমার অভিশাপ। কৌরববংশের মত যদুবংশও ধ্বংস হবে।

কৃষ্ণ নীরব। গান্ধারীর দুঃখে, বেদনায় কৃষ্ণ বুকভাঙা এক শোক অনুভব করল। আশ্চর্য, সেই শোকে তার চোখ বেয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল। অবরুদ্ধ গলায় আর্তস্বরে উচ্চারণ করল: দেবী।

গান্ধারী চমকাল। দাঁতে দাঁত দৃঢ়বদ্ধ। চোখে জল, মুখে রাগ। বলল: বেদনার ভাগ নিলে তবেই সমব্যথী হয়। আমার তাপিত হৃদয়ের সেই জ্বালা, যন্ত্রণা সব তোমাকে সমর্পণ করলাম কৃষ্ণ। আর ভার বইতে পারছি না। এ বুকে কত পরিতাপ জমেছে জান? আমার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের তাপে সবুজ শ্যামল মহীরুহও শুকিয়ে যাবে। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে ধর্মযুদ্ধের কথা বলেছ। পুত্রদের আমি শিখিয়েছি ধর্মপথে থাক তা-হলে জয়ী হবে। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করে পুত্ররা আমার ধর্মযুদ্ধ করল।* কিন্তু কি ফল তারা পেল? ধর্মের জন্যে, সত্যের জন্যে কত মূল্য তাদের দিতে হল? তবু জয়ী তারা হল না। আর তুমি অধর্ম, অসত্য, শঠতা করে যুদ্ধে জয়ী হলে। এর চেয়ে আশ্চর্য কিছু আছে? আসলে, তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ কৃষ্ণ। ধর্মপ্রাণ গান্ধারীর বুদ্ধিভ্রংশের রন্ধ্রপথ ধরে ধ্বংসের শনি প্রবেশ করল। নির্বোধ নারী আমি বুঝতে পারিনি। তোমাকে বিশ্বাস করে আমি ঠকেছি। মায়ের বুকে চিতা জ্বালিয়ে মার্জনা চাওয়ার মত নিষ্ঠুর কৌতুক তুমিই করতে পার কৃষ্ণ। তোমার মত শঠ-শিরোমণির এই কাজ সাজে। আমি তোমার কোন দুরভিসন্ধিতে আর ভুলছি না। তোমার কোন ক্ষমা হয় না কৃষ্ণ। তোমায় অপরাধের, পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন করতেই হবে।

এত বড় একটা কথা উচ্চারণ করার জন্যে গান্ধারীর যেমন আপাদমস্তক সূক্ষ্ম পাপবোধে শিউরে উঠা উচিত ছিল, তেমন কিছুই হল না। কৃষ্ণকে অভিশাপ দেয়াটা যে তার কোন অপরাধ কিংবা দোষের কিছু হয়েছে মনে হল না তার কাছে। গান্ধারীর সত্তা ভাষণের মধ্যে কোন পাপবোধ ছিল না মুখে কোন অনুশোচনার চিহ্ন ছিল না।

কৃষ্ণ তার দীপ্ত আননের দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকতে পারল না।

---

* মৎ-লিখিত 'গান্ধারী. কুরুক্ষেত্রের গান্ধারী' পাঠ করলে পাঠকেরা এক নতুন সত্যের সন্ধান পাবেন।

চোখ নামিয়ে নিল। গান্ধারীর তিরস্কারে, অভিশাপে সে একটু রাঙা হয়ে উঠল। তার মুখ গনগন করছিল। কানের লতি দিয়ে আগুনের তাপ বেরোচ্ছিল। কৃষ্ণ মাথা হেঁট করে বলল: দেবী, তোমার কথা বর্ণে-বর্ণে সত্য হবে। আমাকে অভিশাপ দিয়ে যদি তোমার তাপিত হৃদয় শান্তি পায়, তোমার শোকের আগুন নিভে যায় তা-হলে, আমার সেই অনন্ত নরক-যন্ত্রণার অভিশাপ দাও। সেই হোক আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমারই দুর্ভাগ্য, মানুষের ভাল চেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করে, মানুষের কাছেই দোষী হয়ে আছি। দেবী, তোমার কাছেও আমার দোষের শেষ নেই। তাই মার্জনা চাইতে এসেছি।

কথা শেষ করে একটু হেসে কৃষ্ণ চোখ তুলে গান্ধারীর দিকে তাকাল। গান্ধারী কেঁদেকেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল। তাকে ভীষণ শ্রান্ত এবং অবসন্ন দেখাল। চুলে এলোমেলো ভাব। মুখে শোকার্তের চিহ্ন। পোশাকে পারিপাট্য ছিল না। তবু গান্ধারীর ব্যক্তিত্বদৃপ্ত ধারাল মুখের দিকে পিপাসার্তের মত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কৃষ্ণ।

গান্ধারীর ভিতরে একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হল এই সময়। তীব্র অনুতাপের দহনে দপ করে জ্বলে উঠল তার বিবেক এবং শুভবুদ্ধি। নিষ্পলক চেয়ে থাকল কৃষ্ণের দিকে। তার দু'চোখের তারা নিবিড় হয়ে উঠল। কেমন একটা সংজ্ঞাহীনতার মধ্যে কাটল কিছুক্ষণ।

চমকানো বিস্ময়ে উচ্চারণ করল: কৃষ্ণ!

গান্ধারীর দুই চোখের উপর কৃষ্ণ তার মুগ্ধ দুটি-চোখ পেতে রাখল। অনেকক্ষণ। একটুও ডপছে পড়ল না বাইরে সে দৃষ্টি। অভিভূত গলায় ডাকল: দেবী!

ডাকটার ভেতর এমন কিছু ছিল, যা গান্ধারীর ভেতরটা গলিয়ে দিল। গান্ধারীর ভাবান্তর কৃষ্ণের নজর এড়াল না। নিজের মনেই বলল: প্রত্যেক অন্যায়ের মধ্যেই বোধ হয় অন্যায়কারীর শাস্তি লুকিয়ে থাকেই। যতদিন নিজের জীবনে নিজের কাছে সে শাস্তি না পাচ্ছে ততদিন বাইরের কেউই তাকে আসল শাস্তি দিতে পারে না। তবে,

যা কিছু অন্যায়, অধর্ম, অবিচার করেছি তার সব শাস্তি আমাকেও ভোগ করতে হবে।

গান্ধারী অবাক চোখে কৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইল। তার কথাটার মধ্যে এক দারুণ নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু চোখে তার কী প্রশান্তি, কী গভীর মায়া। চোখ ছাড়া মুখের মানে বোঝা যায় না, মানে হয়ও না হয়ত কোনো। মনে হল, তার সব জ্বালার উপর কৃষ্ণের কথাগুলো প্রলেপ মাখিয়ে দিল। আর ধীরে ধীরে তার ভেতরের সব তাপ, দাহ, জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। ভেতরটা শীতল হল। মুগ্ধকণ্ঠে বলল: কৃষ্ণ, তুমি এত মহৎ। তোমাকে যত দেখি তত বিস্ময় লাগে। প্রশ্ন জাগে, তুমি কে? সত্যিই কি তুমি ভগবান! তোমার ঢলঢলে মুখ, ঢুলুঢুলু চোখের দিকে তাকালে মনটা প্রফুল্ল হয়। প্রসন্নতায় ভরে ওঠে বুক। কী ভাল যে লাগে তখন। মনটা আপনা থেকে দীন হয়ে আসে। মাথা নুয়ে আসে শ্রদ্ধায়। নিজেকে তোমার কাছে কত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। ঈশ্বরভক্তি বোধহয় একেই বলে।

গান্ধারী আত্মবিস্মৃতের মত দু'খানা হাত জোড় করে বলল: ভগো, মানুষের ভগবান, তোমার বুকে করুণার সাগর। কিন্তু গান্ধারীর প্রতি তুমি এত অকরুণ কেন? কী দোষ করেছি আমি? আমার শতপুত্রের মধ্যে কুল বাঁচানোর জন্যে একটি পুত্রকে জীবিত রাখলে না কেন? পুত্র দুর্যোধন'ত কোন পাপ করেনি, অধর্ম করেনি, তবু তাকে অন্যায়ভাবে বধ করলে। তোমার অগাধ করুণার সাগর থেকে দুর্যোধনকে যদি ঐ করুণাটুকু ভিক্ষে দিতে তা হলে কি তোমার দয়ার সাগর রিক্ত হয়ে যেত? বল কৃষ্ণ। জীব মাত্রে দৈবের অধীন বলে, উত্তর এড়িয়ে যেও না। দুর্যোধনকে জীবিত রাখলে দৈবের আর কতটা ক্ষতি হত?

কৃষ্ণের মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কী বলে গান্ধারীকে শান্ত করবে ভেবে পেল না। বড় পাপবোধ হল মনে। গান্ধারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল: দেবী, ভগবানের লীলা বড় বিচিত্র। তা জানার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কার আছে? পৃথিবীতে অপরাধ করে

একজন, আর তার ফল ভোগ করে অন্যজন। মানুষ অসহায়। ঈশ্বরে মতি রাখ দেবী। সব সমস্যার সমাধান তিনিই করে দেবেন। আমি নিজেই কি মুক্ত হতে পারছি পাপবোধ থেকে? জ্বলে মরছি শুধু অপরাধের গ্লানিতে। তোমাদের বিশ্বাসের ভগবান আজ নিজেই নিজের মনের কারাগারে বন্দী। তোমাকে দয়া করার তার অধিকার কোথায়? মানুষ হয়ে যে জন্মাল, মানুষের স্বভাব, ধর্ম, আচরণকে সে কেমন করে বিসর্জন দেবে? মানুষের অন্ধকার, কামনা, বাসনাকে ত্যাগ করতে পারিনি। অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ার আশংকায় অনন্যাপায় হয়ে অনেক অন্যায় পাপ করেছি। আমার বুদ্ধির অহংকারে এত নারী পতিহীনা হল। তাদের হাহাকার আর অশ্রু-জলে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর ভরে উঠেছে। একেই বলে, দেবী অদৃষ্টের পরিহাস। মহাশ্মশানের বেদীতলে আমি কোন সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব? আজ অকপটে স্বীকার করব, তোমাদের ভগবানের দর্পচূর্ণ হয়েছে।

গান্ধারীর অবাক লাগল। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তার দিকে অপলক চেয়ে রইল। কৃষ্ণের মনের অভ্যন্তরে হঠাৎ কী যেন ঘটে গেল। মনের অয়ন পথ সত্যিই বড় বিচিত্র।

আনন্দের তীব্রতম বিন্দুতে পৌঁছনোর পরেই মন বড় ছটফট করতে থাকে। এই মন নিয়ে তখন বড়ই জ্বালা। দুঃখও সয় না, সুখও সয় না। কৃষ্ণেরও সেই অবস্থা। একজন ধর্মবিশ্বাসী মানবী হিসাবে গান্ধারীর মনে হল, কৃষ্ণ বিভ্রান্ত করে তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা পরীক্ষা করছে। অমনি আর্ত হয়ে উঠল ভেতরটা। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল: ও কথা বল না কৃষ্ণ। বলতে নেই। সব হারানোর মাঝে এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে এখন বেঁচে আছি। ও-গো মানুষের ভগবান ওই বিশ্বাসটুকু ভেঙে রিক্ত কর না আর। কৃষ্ণ! বড় বিষ জ্বালা এই বুকে। ধর্মের উপর আমার আর আস্থা থাকছে না। থাকবে কোথা থেকে? পুত্রেরা ধর্মপথে যুদ্ধ করল। তবু অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ঠেকাতে পারল কৈ? অভিমানে দুর্যোধন আমার সঙ্গে যুদ্ধযাত্রার আগে একবারটি

দেখা পর্যন্ত করল না। আমার আশীর্বাদ নিল না। আমার উপর অভিমান নিয়ে সে চলে গেল। ধর্মকথা শুনতে তার তিক্ত লাগল। তবু যুদ্ধে অধর্ম করল না। জননীর কোল ছেড়ে ধরণীর কোল নিল চিরন্তন সুখ আর শান্তির প্রত্যাশায়। জননীর হৃদয়ে এই দুঃখ রাখার জায়গা নেই আমার। জননীর প্রতি তাদের অকুণ্ঠ আত্মবিশ্বাসের পাত্র রিক্ত করল কে কৃষ্ণ? কার পাপে এবং দোষে আমি পুত্রহারা হলাম? বল, কৃষ্ণ বল।

কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল অসহায়তা ফুটল। অস্ফুট স্বরে ডাকল: দেবী।

কৃষ্ণের আহ্বানে গান্ধারী চমকাল। পিপাসার্তের মত মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণের চোখে চোখ রাখতে বুক কাঁপিয়ে সজোরে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যার নাম হাহাকার। চোখ বুজে গান্ধারী তার শরীরের গভীরে অবসাদ একটু সামলে নিল। তারপর বলল: কৃষ্ণ। পিতৃব্য ভীষ্ম বলতেন কৃষ্ণই তো সনাতন পুরুষ, বিশ্ববিধাতা। তিনি নররূপে এসেছেন আর্ত ধরণীকে ভারমুক্ত করতে। তাই যে এত নির্লোভী এবং ত্যাগী। এক আশ্চর্য অলৌকিক শক্তির অধিকারী। সকল সত্য তত্ত্বের আদর্শ কেননা, তিনিই সত্যস্বরূপ।

দেবী এসবই মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাস এবং ধারণা। মাঝে মাঝে আমিও পরম বিস্ময়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, সত্যিই কি তাই? ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ, সুর অসুর যদি আমারই সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে আমি তার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না কেন?

নয়নের জলে আমিও তোমাকে সেই প্রশ্ন করব। তুমি তো কত বিশ্ববিধানের স্রষ্টা। দুর্যোধন'ত সেই সৃষ্টিছাড়া নয়। দুর্যোধনের বুকে কেন দিলে এত অহংকার, তীব্র আত্মাভিমান, ক্রূর প্রতিহিংসা? কেন, সে তোমার কী করেছে? কোন অপরাধে দুর্যোধনের উপর এত বিরূপ হলে? তোমার আনুকূল্য পেয়ে যার হৃদয় অন্তরকম হতে পারত, তার উপর বিরূপ হয়ে কেন তোমার শত্রু করলে? দুর্যোধন'ত তোমার কোন ক্ষতি করেনি। তবু তোমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে

হল জননী হয়ে আমাকে। কেন? আমি কী করেছি তোমার? বলতে বলতে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল গান্ধারী।

কৃষ্ণ নীরব। গান্ধারীর দুঃখ এত গভীর, ব্যাকুলতা এত তীব্র যে কৃষ্ণের চোখও আর্দ্র হল। তার সমস্ত চেতনার উপর এমন বিহ্বলতা নেমে এল যে, কোন কথা বলতে পারল না।

গান্ধারী অনেকক্ষণ কাঁদল। কান্না থরোথরো অস্পষ্ট গলায় বলল: তুমি নিষ্ঠুর। ভীষণ নিষ্ঠুর। অথচ, তুমিই নারায়ণ। মানুষের পরম গতি, একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তুমি এ কি করলে?

দুঃখে ক্ষোভে বেদনায়, অভিমানে গান্ধারীর বুক মথিত হল। তার ভেতরটা একেবারে তছনছ করে দিল। একটা ঘোর ঘোর আচ্ছন্ন-ভাব থেকে জেগে উঠে রুদ্রকণ্ঠে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল: কৃষ্ণ! লোকে বলে তুমি ভগবান। কিন্তু তুমি তো মানুষও! অসাধারণ তোমার শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা তুমি জান, বুদ্ধি ও বাগবৈদগ্ধে তুমি অদ্বিতীয়। অসীম তোমার শক্তি, ক্ষমতা, তুমি একটু ইচ্ছে করলে এই বিনাশ ঠেকাতে পারতে। ধ্বংস থেকে কৌরব বংশকে রক্ষা করতে পারতে। হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল। ভাঙা বিকৃত গলায় বলল: ধ্বংস রক্ষার জন্যে অন্তত একজন সন্তানকে জীবিত রাখতে পারতে। তুমি তা করনি। তাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। আমি অভিশাপ দেব। মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন এবং পুত্রদের দেখে যেমন আমি কাঁদছি, তেমনি তুমিও কাঁদবে। আমার মত অসহায়ভাবে কুলনাশ এবং আত্মীয় নিধনের একজন দর্শক হয়ে বুঝবে কুল হারানোর ব্যথা কি?

একথায় চমকে উঠেছিল কৃষ্ণ। কিন্তু রাগল না। গান্ধারীর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও তেজ যে দুঃখের মধ্যে, শোকের ভেতর দপ করে জ্বলবে জানত। তার বুকে ঝড়ো বাতাসের গর্জন।

কৃষ্ণের চোখে-মুখে কোনো রাগের আভাস নেই। ঝকঝকে হাসি হেসে বলল: দেবী, সমবেদনা জানাতে এসেছি। আপনার সমতলে যদি না নেমে আসতে পারি তা-হলে সমব্যথী হব কেমন করে?

আপনার অভিশাপ আমি মাথায় তুলে নিলাম। আমিও জানি যদু-বংশ ধ্বংস হবে। জীবের যেমন জন্ম-মৃত্যু আছে, তেমনি একটি রাজ্যের এবং জাতির উত্থান-পতন আছে। যদুবংশের পতন ও ধ্বংস হওয়া তাই কোন আশ্চর্য কিছু নয়। হয়ত স্বচক্ষেই দেখব। আপনার সাধ অবশ্যই পূর্ণ হবে। এবার আপনি শোক ত্যাগ করে শান্ত ও স্থির হলে আমি শান্তি পাই।

গান্ধারী কোন কথা বলতে পারল না। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হয়ে গেল তার চেতনা। অবাক হয়ে অপলক চোখে চেয়ে রইল কৃষ্ণের দিকে। বোধ হয়, সে কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ ছিল না। পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর হঠাৎ আত্মগ্লানিতে, এবং তীব্র অপরাধবোধে কৃষ্ণের বুকের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে ভিজে গেল কৃষ্ণের বক্ষদেশ। কান্না ধরো ধরো অস্পষ্ট গলায় বলল: কৃষ্ণ তুমি কত বড়, আর আমি কত স্বার্থপর। তোমার মহত্বের কাছে নিজেকে কত দীণ মনে হচ্ছে। আমাকে দিয়ে এ পাপ কেন করালে?

দেবী, অনুতাপের কান্নার ভেতর দিয়ে তোমার মনের সব পাপ ধুয়ে মুছে গেল। তোমার মনে আর কোন গ্লানি নেই, পাপ নেই।

গান্ধারীর দু'চোখে অতৃপ্ত বিস্ময়। অনাস্বাদিত পূর্ব এক সুখের অনুভূতিতে ডুবে গিয়ে বলল: কৃষ্ণ তুমি কে? তোমাকে কোন এক জন সাধারণ মানুষের মধ্যে কখনও আটে না। তুমি সব ধ্যান ধারণা ভেঙে উপচে যাও অন্য এক বৃহৎ মহৎ উপলব্ধির দিকে। তোমাকে জানা কোন কালে মানুষের ফুরোবে না। সেই জানার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা। তুমি চির নূতন, চির অজানা। তুমি এক জানা পূর্ণ করে আর এক জানাকে অপূর্ণ রেখে উপচে যাও। তুমি একটামাত্র মানুষ নও। তুমি অনেকগুলো মানুষ ও প্রকৃতি মিশে একটা বিরাট সত্তা। তাই পুরো তোমাকে কেউ উপলব্ধি করতে পারল না। সত্যিই তুমি ভগবান।

কৃষ্ণকে মধ্যমণি করে এ কোন মহাকাব্য লিখলেন দ্বৈপায়ন—প্রশ্নটা

নিজেকেই করল সে। প্রতিদিনের ঘটনায় এমন নজীর করে কৃষ্ণকে দেখা কিংবা চেনা আগে হয়নি। কৃষ্ণের সঙ্গে এরকম সুগভীর আত্মিক সম্পর্কও গড়ে উঠেনি কখনও। তার অভাব পর্যন্ত ছিল না তার। অপরিচয়ের দূরত্বে যে কৃষ্ণ ছিল তার কাছ থেকে দূরে; যাকে দূর হতে সমীহ করত, মান্য করত, শ্রদ্ধা করত সেই কৃষ্ণ কখন তার ধ্যানের দেবতা হয়ে উঠল দ্বৈপায়ন নিজেও জানে না। একটা মুগ্ধ, অনুভূতি-শীল ধারাল মন নিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজল মানুষের অন্তরের গভীরে।

কৃষ্ণের বুকে অগাধ প্রেম। মানুষের প্রেমের ঠাকুর সে। সারা-জীবন ধরে মানুষের কথা ভাবল। তবু মানুষ কি তাকে বুঝল? কেউ তাকে অনুসরণ করল? তাদের কেউ কি হল কৃষ্ণের মনের মতন? কৃষ্ণের জীবনের এই দুঃখটাই দ্বৈপায়নকেও ব্যাকুল করল। সে কথা মনে পড়লে তার বুক হাহাকার করে উঠে। অনেক মনে পড়ে যায়।

পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে এক নতুন মানব ধর্মের সূচনা করল। যে ধর্মে বিত্ত দিয়ে ভেদ সৃষ্টি করা হয় না মানুষের মধ্যে মানুষের, শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার কিংবা গায়ের রক্ত দিয়ে কেউ কারো চেয়ে ছোট নয়, নারী ও পুরুষের পার্থক্য দিয়েও নয়। প্রত্যেক নারী-পুরুষ যে বর্ণের, গোত্রের, সমাজের, বা সম্প্রদায়ের হোক তার একমাত্র পরিচয় সে মানুষ। মানুষের মর্যাদা, গৌরব, সুখ এবং স্বাধীনতা থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। ঈশ্বরের রাজ্যে সবাই সমান। সকলের বেঁচে থাকার সমান অধিকার। এই বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণ কোন আপস করেনি। যারা তার নতুন ধর্মমতের প্রতিবন্ধক তারাই তার শত্রু। নতুন ধর্মের অধিবাসীদের সঙ্গে তার আদর্শের সংঘাত বাঁধল। তবু তাদের চৈতন্য উদ্রেক করতে বলল: মানুষ নিজেই তার ব্যক্তিগত মুক্তির পথ শক্ত করে না বাঁধে বা রাষ্ট্র যদি মনুষ্যত্বকে চাপা দিয়ে, তার সত্তাকে অস্বীকার করে, স্বাধীনতা, অধিকারকে অগ্রাহ্য করে পদদলিত করে চলে যায় তা-হলে, এতকালের সভ্যতার বুকে যে অন্ধকার জমে আছে তা কোনদিন ঘুচবে না। সভ্য

মানুষ বলে আস্ফালন করাই বৃথা হয় তার।

তারপর নিরুত্তর রইল কিছুক্ষণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: মানুষকে মানুষের মত সুস্থ স্বাভাবিক সুখী হয়ে বাঁচার অনুকূল এক পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে চাই, একটা বড় যুদ্ধ। সার্বিক ধ্বংস ছাড়া এই পচা-গলা, পুরনো সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতার ভিত্ ভাঙা যাবে না, ধ্বংস হবে না, মানুষের মনকেও বদলানো যাবে না। মহর্ষি। মহাযুদ্ধের রক্তে রক্তে রাঙানো ধরিত্রীর বুকেই বোধ হয় ভালবাসার রক্তকরবীর ফুল ফোটে। তাই, তার রঙ এত লাল।

কথাগুলো দ্বৈপায়নের কানে চড়া সুরে বাজছিল। কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। মহর্ষি!, বড় ত্যাগ ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। জীবনকে, মানুষকে, মানুষের এই পৃথিবীকে বড় বেশি ভাল বেসেছি বলেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অস্ত্র ধরব না, অঙ্গীকার করেও অস্ত্র ধরতে লজ্জা বোধ করেনি। কিংবা একটা ছোট্ট মিথ্যে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলে বড় মিথ্যের মূলোচ্ছেদন করতে হল। এজন্যে আমার কোন আপশোষ নেই। তাই নতজানু হয়ে কারো কাছে মার্জনাও ভিক্ষা করিনি। কিংবা কৈফিয়ৎ দেয়নি। নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে একটু বেশি আত্মসচেতন হতে হয়েছে। একটা জীবনের বিনিময়ে হাজার মানুষ নতুন করে বাঁচার মত বাঁচবে এটা কি কম কথা। শুধু এই প্রত্যাশা নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ করেছিলাম।

বদরিকাশ্রমে সেই কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বৈপায়নের হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কৃষ্ণের সে নয়নমোহন রূপ আর নেই। কী রোগা হয়ে গেছে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব। চেনা যায় না! মানুষের ভগবানের এমন পরিণাম কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তার চেহারা দেখে দ্বৈপায়নের বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। বুকের মধ্যে স্নেহ-মমতার কী এক গভীর যন্ত্রণা এবং সহানুভূতি তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

আশাভঙ্গের বেদনায় ছাই হয়ে গিয়ে দ্বৈপায়ন অবাক গলায় জিগেস করল: কৃষ্ণ, তোমার চেহারার একি হাল হয়েছে?

কৃষ্ণের মুখে সেই কৌতুক হাসি অম্লান এখনও। বলল : অবাক হওয়ার কিছু নেই। দেহ ধারণ করলে দেহের নিয়ম মানতে হবে। জড়ত্ব অবসাদ এসব দেহীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একে এড়াবো কেমন করে ?

দ্বৈপায়ন স্তম্ভিত ! যার আনন্দে 'বদ' মধুর হাসিতে পৃথিবী খুশি হয়, যার ব্যক্তিত্বের দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য, গ্রহতারা জ্যোতিমান সেই কৃষ্ণ নিজে ডুবে আছে অন্ধকারে। বিস্ময়ের অন্ত নেই দ্বৈপায়নের। কৃষ্ণের এ কোন মলিন ছায়া ? এ ত বার্ধক্যের কারণ নয়, এই অবসাদ দেহ ও মনের অপূর্ণতা থেকেই বোধ হয় জীবন সম্বন্ধে এরকম নৈরাশ্য জন্মায়।

কৃষ্ণ অবসন্নভাবে একটি বৃক্ষতলে বসে পড়ল। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার মত শক্তিও তার হাঁটুতে ছিল না। একটুতেই ক্লেশ বোধ করল। তৃণহীন ধূলিমলিন মাটিতে বসল। হাসি হাসি মুখ করে বলল : রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। এখানে সবই মুক্ত, অযাচিত। কোন কিন্তু কার্পণ্য নেই।

বলতে বলতে কৃষ্ণ থেমে গেল। দ্বৈপায়নের অবাক স্তম্ভিত মুখের দিকে চেয়ে বলল : অমন করে চেয়ে আছ কেন ? কী দেখছ ? অবাক হওয়ার মত কিছু নেই। এর নাম ভালবাসা। প্রকৃত ভালবাসলেই মানুষ নিজের কষ্টের চেয়েও পরের কষ্টের জন্যে বেশি দুঃখ ভোগ করে। আমার মনে সেই কষ্টের দোসর নেই। বড় একা লাগে। কেমন যেন নিজের কাছে হেরে যাওয়ার বিস্বাদে মনটা আত্মীয়, পরিজন, ঐশ্বর্যের বন্ধনের মধ্যেও বড় কষ্ট লাগে।

বন্ধন ? সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল দ্বৈপায়ন।

হাঁ দ্বারকায় আমার কোন অভাব নেই। মহিষীদের প্রেমডোরে বাঁধা থেকেও মনে হয় আমার কি যেন নেই। কি যেন হারিয়ে গেছে আমার। সত্যভামা, রুক্মিণী, জাম্ববতী, প্রেমের ভাণ্ডার সব উজার করে দিল তবু ভুলতে পারি কৈ কালিন্দীর কূলে গোপীদের সঙ্গে শ্রীরাধার মধুর প্রেমের স্মৃতি ? চন্দ্রাবতী, ললিতা, বিশখা, কুব্জা এদের প্রণয়ে ভরপুর হয়ে আছে আমার হৃদয়। সব দেওয়া সেই প্রেমের

ঋণে বন্দী মনটা আজও বৃন্দাবন পড়ে আছে। তার কথা কখনও ভুলতে পারি? কেমনে ভুলব মাতা যশোদার বাৎসল্য, তার গোপাল গোপাল ডাক? প্রিয় সখী রাধাকে কি কখনও ভোলা যায়? রাধার কথা মনে হলে আমার শরীরের ভেতরে কেমন করে। আমি নিজেও জানি না এ কিসের অনুভূতি? মহর্ষি, বৃন্দাবন ছেড়ে ভুল করেছি। বৃন্দাবনের সহজ সরল জীবনের মাধুর্য দ্বারকার রাজকীয় ঐশ্বর্যের তলায় চাপা পড়ে গেল। বৃন্দাবনের বাঁশি ছেড়ে দ্বারকায় আমি ধরলাম, কিন্তু অসি আর বাঁশি হল না। তাতে আমার বাঁশির সুরটা হারিয়ে গেল। অথচ একদিন বাঁশির সুরের ভেলায় ভেসে যেত মন। উদাসী বাঁশীর সুরে দুগ্ধফেননিভ কিংবা মসীবর্ণ গাভীরা পুচ্ছ তুলে দৌড়ে আসত আমার কাছে। গলাটা লম্বা করে দিত আদর পাওয়ার জন্যে। রাখাল বন্ধুরা তন্ময় হয়ে শুনত। হৈ-চৈ করে খেলায় মেতে উঠত। রাইও তার সখীদের সাথে মথুরার হাটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াত। বিদ্যুৎ কটাক্ষ হেনে দেহের কোষে কোষে শিহরণ জাগিয়ে নূপুরের ঝংকার তুলে দৌড়ে যেত। মহর্ষি, আমার কাজ ভোলানো সেই বাঁশির সুর কোথায় ভাসিয়ে এলাম? বৃন্দাবনের সব কথাও স্মৃতি বানের জলে ভাসিয়ে এ কোন দ্বারকায় এলাম? এই অনুশোচনা ভুলতে পারছি না। স্বস্তিও পাচ্ছি না। আবার বৃন্দাবনে যে ফিরে যাব তারও পথ খোলা নেই। বংশীধারী কানুকে শুধু বৃন্দাবনের মানুষ চেনে। শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী কৃষ্ণ তাদের অচেনা। বন্ধু ছাড়া কানুর মণিহারা ফণীর মর্ত বৃন্দাবনে। জেনে সেখানে কেমন করে ফিরে যাই? ইচ্ছে হলেও আমার পথ চলছে না। মন সাড়া দিচ্ছে না।

দ্বৈপায়ন কথা খুঁজে পেল না। বিব্রত গলায় ত্রস্তস্বরে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল: কৃষ্ণ তোমার এ এক আশ্চর্য দুঃখবোধ। এ ধরনের দুঃখবোধ নিয়ে সকলে জন্মায় না। দুঃখ সকলের কমবেশি আছে। তবে, বেশিরভাগ মানুষ বড় সহজে সুখী হয়, সুখী থাকে। কিন্তু কিছু কিছু দুঃখবোধ থাকে যা একান্ত নিজের। তোমার দুঃখটা

একেবারে অন্যরকম। সারাজীবন অন্যের কথা ভাবলে, অন্যের দুঃখ বয়ে বেড়ালে, নিজেকে উদার করে বিভিন্নদানে পরকে ভরপুর করে নিজেকে রিক্ত করে তুমি এক গভীরতর সুখে ঘুমিয়ে ছিলে। জীবনের সব প্রাপ্তি এমন এক আশ্চর্য অপ্রাপ্তিতে ভরে উঠল কেন কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ সহসা কোন জবাব দিতে পারল না। দ্বৈপায়নের চোখের উপর চোখ রেখে হতচকিত হয়ে কথা খুঁজল মনের অভ্যন্তরে। বুক থেকে একটা গভীর শ্বাস পড়ল। উদাম অন্যমনস্কতায় বলল: দীর্ঘ-দিনের চেষ্টায়, পরিশ্রম, মননশীলতা দিয়ে যে স্বপ্নের পৃথিবীটা তিল তিল করে গড়েছিলাম যার সবকিছু ছিল গর্বের, পরিচয়ের, শ্লাঘার ; তার সবকিছুই হঠাৎ মূল্যহীন হয়ে পড়ল। এই দুঃখটা ভুলতে পারছি কৈ ? একদিন বড় আশা করেই বৃন্দাবন ছেড়ে দিলাম। মাতা যশোদার স্নেহ, সুবল, সুদামের বন্ধুত্ব, গোপীদের মধুর প্রেম, রাধার প্রণয়-মাধুর্য এসবের আকর্ষণ ছেড়ে, কোন মোহে এসেছিলাম? অনন্ত মাধুর্যে ভরা বৃন্দাবনের বাইরেও যে এক বিশাল জীবন আছে, অবারিত, মুক্ত জীবনের সেই অনন্ত ঐশ্বর্যে জীবনকে ভরপুর করে পৃথিবীকে সুখন্য করে তোলার স্বপ্ন ছিল। খুশিতে ভরে উঠবে এই খুশিহীন পৃথিবী। সর্বত্র আনন্দম আনন্দম। এই ছিল মনের কথা। অন্তরের কথা বৃন্দাবন ছেড়ে আসার সময় রাধাকে বড় গর্ব করে বলেছিলাম, আমাদের প্রেম বিশ্বময় হয়ে থাকবে আমরা থাকি না-থাকি কিন্তু আমাদের প্রেম অমর হয়ে থাকবে। মনের ভালবাসা যে দেয় তার হারানোর কিছু থাকে না। মন আলো করা প্রেমে সব জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। মনের আলোয় আমাদের দেখা কোনদিন ফুরোবে না, সেই জানার সঙ্গে তোমাকে চেনাও। কেন জান? "আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, আদিকালের উৎস হতে।"

বলতে বলতে কৃষ্ণ চুপ করে গেল। চোখের পাতা কেঁপে গেল। মুখের ভাব পাল্টে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসল কৃষ্ণ।

দ্বৈপায়ন অভিভূত। কৃষ্ণ নীরব। পাছে তার মুগ্ধতা নষ্ট হয়ে যায় তাই ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল: কৃষ্ণ এমন করে মুখ লুকিয়ে বসে

রইলে কেন? তুমি চুপ করে থাকলে—

এসব দুঃখের কোন উত্তর হয় না। উত্তর পেয়েই বা কি হবে? আমি, তুমি রাধা এবং প্রত্যেকটি মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার প্রত্যেকে পৃথক। কিন্তু কেউ বোধহয় আর একজনকে না হলে পূর্ণ হয় না। নিজের মধ্যের এবং নিজের আনন্দের খোঁজে আমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে কাছে পেতে চাই। কারণ মানুষ জন্মেছে মিলিত হবার জন্যে, আলাদা হয়ে থাকার জন্যে নয়। মিলনের আর্তি বুকে নিয়ে সে শুধু প্রতীক্ষা করে। বৃন্দাবনে রাধা আমার জন্যে কতকাল প্রতীক্ষা করে আছে। তার প্রতীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। আমার ভয় হচ্ছে, রাধার সেই নরম সুন্দর মনটা বেঁচে আছে, না বিরহের তাপে শুকিয়ে গেছে? মহর্ষি, অন্তরে তার জন্যে একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা অনুভব করছি। সেই ব্যাকুলতার তীব্রতা আমি বোঝাতে পারছি না। এই ব্যাকুলতা চন্দ্রোদয়ের চঞ্চল সমুদ্রের মত। যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি বহুদূর থেকে আমাকে আহ্বান করছে আমার বন্ধন খুলে দিচ্ছে। বৃন্দাবন আজ আমার বন্ধন নয়। বৃন্দাবনই হল মুক্তির পথ। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত নিঃশব্দ নীরবতা পালন করে স্বগতোক্তি করে বলল : 'বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি, আমি চাইনি।'

অনেককাল আগের ঘটনা। এর ভেতর কত কী ঘটে গেল। অন্তর্বিরোধে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে যাদবেরা নির্বংশ হল। কৃষ্ণের চোখের সামনে ঘটল সে মরণোৎসব। তবু কৃষ্ণ তাদের নিরস্ত করল না, কিংবা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এল না। কিন্তু এভাবে স্বজাতির মৃত্যুবরণটা তার বুকে শেলের মত বিঁধল। সে-কষ্ট ও পরিতাপ সহ্য করতে পারল না কৃষ্ণ। বড় যন্ত্রণা নিয়ে মানুষের ভগবানকে বিদায় নিতে হল।

কৃষ্ণ আর নেই। কিন্তু তার কথাগুলো দ্বৈপায়নের মনে গেঁথে রইল। মৃগনাভির মত তার সৌরভ সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ে তাকে আকুল করে তুলল। দ্বৈপায়ন কল্পনায় একবার বৃন্দাবনের রাধা

কৃষ্ণকে আর একবার কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে রথে উপবিষ্ট পার্থসারথিকে দেখতে লাগল। রাধা এবং অর্জুন কুরুক্ষেত্রে এক দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। তাদের মত এমন সখা, বন্ধু, অনুরাগী কৃষ্ণপ্রাণ একজনও পাইনি কৃষ্ণ। তবে দু'জন দু'মেরুতে অবস্থান করছে। একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনদিনও মেলানো যাবে না। কৃষ্ণ নিজেও মেলাতে পারবে কোথা থেকে? একদিকে জীবনের মাধুর্য, অন্যদিকে ঐশ্বর্য। মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য কৃষ্ণ দুই-ই চেয়েছিল একসাথে। চাওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার। কিন্তু চাইলে যে পাওয়া যায় না কৃষ্ণ নিজেই তার প্রমাণ।

দ্বৈপায়নের মনে হল, কৃষ্ণের আকাঙ্খার জগতে দুই বিপরীত মেরুতে আছে রাধা ও অর্জুন; বৃন্দাবন হল সুখ-দুঃখের জীবনঘটে ভরা প্রেমের অমৃত। আর দ্বারকা হল ঐশ্বর্যের সিন্ধুকে ভরা এক আতিশয্যময় জীবন। বৃন্দাবনে ধন, মান, খ্যাতি, সম্পদ নয়, শুধু ভালবাসা। দ্বারকায় কৃষ্ণ পাহাড় কেটে রাজধানী করল জীবনের ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি সৌভাগ্য, সম্মান, গরিমা, রাজার প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্যে। যা চাইল, সব পেল। তবু কি তৃষ্ণা মিটল? দুটো জীবনকে মেলাতে পারল কৈ? ঝিনুকের দুটি খোলার মধ্যে ঢাকা মুক্তার মত কৃষ্ণের অন্তরটা ভরা রইল অপূর্ণতার বিষাদে। বৃন্দাবনের দুর্লভ ধন দ্বারকায় হারাল। ঐশ্বর্য এবং বীর্য দিয়ে জয় করতে পারল না প্রেমের অমৃত ভাণ্ডার। জয় করে যা পেল তাতে অমৃত ছিল না। তাই, হৃদয়ভরা আত্মানুশোচনা নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে কৃষ্ণ যে কথা বলেছিল, দ্বৈপায়নের আজও তা স্মরণে আছে। কৃষ্ণের কণ্ঠেই কথাগুলো তার কানে পুনরাবৃত্তি হল, প্রেম আছে বৃন্দাবনে। সেই প্রেমের নাম রাধা।

সামান্য কটা কথা দিয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রাণের ভেতর এক সুধা-সিন্ধু সৃষ্টি করল। কথাগুলোর কী অসীম মাধুর্য! হৃদয়কে ফুলের মত মেলে ধরল। কৃষ্ণের অন্তরে রাধার প্রেমের এক মহাভাবের দীপ উজ্জ্বলিত করে দিল। শয়নে স্বপনে কৃষ্ণের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে রাধার মুখ। রাধা মানে অনন্ত প্রেম।—অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেম-শিখা। যেখানে অনন্ত বাসনা সেখানে অমর প্রেম। এই প্রেম আর

কোথাও নেই, আছে হৃদি-বৃন্দাবনে। এই নতুন অনুভূতিতে কৃষ্ণের মন আর্ত। কেন? প্রশ্নটা হঠাৎ দ্বৈপায়ন নিজেকে করল। জবাবটা বুকের গভীর থেকে কে যেন নিকচ্চারে তার মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চারিত করে দিল।

ভক্ত ছাড়া ভগবান একা থাকতে পারেন না দীর্ঘকাল। ভক্তের বিরহ সইতে পারে না শ্রীহরি। কৃষ্ণ শ্রীহরির অংশ। তিনি যে সদা আনন্দময়। তিনি আনন্দ রূপম অমৃতম। আনন্দ ছাড়া একদণ্ড থাকতে পারেন না। এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে পরম ব্রহ্ম ছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একা। ভীষণ একা। একা একা তাঁর ভাল লাগল না। রস পান না করলে, জীবনকে অতল গভীরে মানুষের মধ্যে নিত্যনতুন করে অনুভব না করলে আনন্দরূপ প্রকাশ পায় না। নিজেকে তখন দুই করলেন। তখন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধের একটা মানে খুঁজে পেলেন। মনের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হল এক নতুন বিশ্ব। বিশ্ব পৃথিবী জুড়ে এই সুর। সকলে মিলতে চায়। একা থাকার বড় কষ্ট। তাই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ লক্ষ্মীরূপী রাধার বিরহ সইতে না পেরে মর্তের মাটিতে নেমে এলেন। বৃন্দাবনের মাটিতে পড়েছে তাঁর পায়ের ধুলো। তাই কৃষ্ণের মন পড়ে রইল বৃন্দাবনে। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলেই বৃন্দাবনবাসিনী রাধার জন্যে ব্যাকুল হল মন। রাধা-কৃষ্ণের যুগল মুরলীধ্বনিতে বাজল জীবনসঙ্গীতের সুর। "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।"

এরকম একটা অদ্ভুত চিন্তায় দ্বৈপায়নের মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। অনেকক্ষণ। তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল বিশ্বপ্রকৃতির দিকে। সায়াহ্নের ঝিরঝিরে বাতাসের দ্রুত উড়ে যাওয়া এক ঝাঁক পাখী আনন্দমুখর কলরব করতে করতে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে উড়ে গেল। তাদের মুখরিত কলরবে দ্বৈপায়ন চমকে উঠল।

বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও তার লেগে রইল। এক অতলান্ত ভাবনার গভীরে ডুবে অনুভব করল: কৃষ্ণের প্রেম; একজন নারীর সঙ্গে, আর রাধার প্রেম ঈশ্বরের সঙ্গে। রাধাও সাধারণ মানবী নয়।

তার অন্তরে এই বিশ্বসৃষ্টির আদি-অনন্তস্বরূপ হয়ে ঈশ্বর বিরাজ করছে। রাধা প্রেম দিয়ে তাকে চিনেছিল। তার চেনায় ভুল ছিল না। তাই সমস্ত লাভক্ষতির বাইরে, সংসারের সমস্ত পাওয়া না-পাওয়া সীমা অতিক্রম করে কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর হয়ে গেছিল। তার একমাত্র ধ্যান ছিল "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"।

মন্ত্রের মত কথাগুলো উচ্চারিত হল দ্বৈপায়নের চেতনায়। অমনি তার ভেতরটা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। দিব্য চোখে দেখতে লাগল, যমুনার নীল জল তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে। আর কৃষ্ণ কদম্বমূলে বসে এক নিবিষ্ট মনে বাঁশী বাজাচ্ছে! "তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু।" কৃষ্ণের কোঁকড়া চুলের উপর পড়েছে সূর্যের আলো। আর রাধা তন্ময় হয়ে দেখছে তাকে। কৃষ্ণের চোখ বুজে গেছে, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ছে।